ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন

গাজী ওমর ফারুক
আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

আলীগড় লাইব্রেরী
১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশক ঃ এম, এ, কাইউম
আলীগড় লাইব্রেরী
১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৬৯১৫/৭১১৭৭১৮

প্রকাশ কাল ঃ প্রথম প্রকাশ— আগষ্ট ২০০২ইং

মূল্য ২৩০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রন ঃ আলীগড় প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
৪৯/২, নর্থ সার্কুলার রোড,
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

উৎসর্গ

আমার মা'কে

ভূমিকা

ইসলাম মানবজাতির কল্যাণের জন্য চিরন্তন ও সার্বজনীন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যেমন আল্লাহপাক বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম"। অন্যত্র আল্লাহপাক রাসুল(সঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন "আপনাকে সমগ্র মানবজাতির কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠানো হয়েছে।" পবিত্র কোরআন ও সুন্নায় সব কিছুকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। Out line হিসেবে কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে করে জ্ঞানী ব্যক্তিরা গবেষণা বা ইজতিহাদ করে নতুন কিছু বের করতে পারেন এবং পরিস্থিতিকে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল করে তুলতে পারেন। বিশ্বজনীন হিসেবে বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্য ইসলামে কিছু আচরণ বিধি আছে। অর্থাৎ বিশ্বসম্প্রদায় কোন পদ্ধতিতে নিজেদের মধ্যে বহিঃসম্পর্ক কি ভাবে গড়ে তুলবে উক্ত আচরণ বিধিতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। যাকে বর্তমানে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। এই আইন ব্যতীত ইসলামের অন্যান্য আইনে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগের মনীষীরা বিক্ষিপ্তভাবে কিছু গবেষণা করেছেন। শুধুমাত্র মোহাম্মদ শায়বানী পৃথকভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা আইন সম্পর্কে গবেষণা করে "সিয়ার আল কাবির" নামে একখানা পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। এ ছাড়াও আল্লামা সারাখসী "শরহ্ সিয়ার আল কাবির" নামে আর একখানা পুস্তক রচনা করেন। এর কয়েক শতাব্দী পর আধুনিক যুগে ডঃ হামিদুল্লাহ ইংরেজী ভাষায় "Muslim Conduct of States নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন। উক্ত পুস্তকটিতে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের অনেক দিক আলোচিত হয়েছে। এরপরেও আমার দৃষ্টিতে মনে হয় যে, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দিয়েছে তা হলো বাংলা ভাষায় ইসলামী আইনের গবেষণা খুবই কম; ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে শূন্য বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুষ্টিয়া) আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন নামে একটি সমন্বিত কোর্স রয়েছে। অথচ এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন পুস্তক নেই। চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের সাথে তুলনা করে এ বিষয়ে পাঠদান করা যেতে পারে। এর প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি বাংলা ভাষায় "ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন" নামে এ পুস্তকখানা রচনা করি। এ

বাংলা ভাষায় "ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন" নামে এ পুস্তকখানা রচনা করি। এ
কষ্টসাধ্য কাজটি করতে গিয়ে আমি সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন বিধির সাথে তুলনা করে ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামের সাথে পরস্পর বিরোধী নয় এমন বিধি-বিধান সংযোজন করেছি। আমার এই ইজতিহাদে ভুল হতে পারে এবং রাসুল (সঃ) এর হাদিস মোতাবেক ভুল ইজতিহাদের জন্য অর্ধেক নেকী। সুতরাং এ পুস্তকটিতে কোন ভুল অথবা পরস্পর বিরোধী কিছু দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে অবহিত করার অনুরোধ জানাচ্ছি। অধিকন্তু এ বিষয়ে সাধারণ পরামর্শও সম্মানের সাথে গ্রহণ করা হবে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রাক্তন অধ্যাপক এম. বদর উদ্দিন, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহকর্মী জনাব শহীদ আহমেদ চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, সমস্ত পান্ডুলিপি দেখে এবং পরামর্শ দিয়ে আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার সহকর্মী জনাব আক্রাম হোসেন মজুমদার এবং মরহুম খন্দকার জিয়াউল হক এই মহৎ কাজে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। কম্পিউটার্স বিন্যাসে সহায়তা করেছে, আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ, ইবি কুষ্টিয়া এর কম্পিউটার অপারেটর এনামুল হক। এ ছাড়াও এ কাজে যারা আমাকে সহায়তা করেছেন তাদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ব্যস্ত কর্ম জীবনে বই লেখার প্রয়াসে আমার সময়ের উপর যে বাড়তি চাপ পড়েছে, তার জন্য আমার স্ত্রী রুকসানা বিলকিস, পুত্র রায়হান ফারুক ও কন্যা রাহিকা ফারুক কে বিভিন্নভাবে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। তাদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গাজী ওমর ফারুক

আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিশ্ব সম্প্রদায় ও ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন ৭-১৪
বিশ্বসম্প্রদায় ৮
অমুসলিম সম্প্রদায় ৯
মুসলিম উম্মাহ্ ১২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের স্থান ১৫-২০
গ্রীক ও রোমান যুগ ১৫
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের নৈতিক ভিত্তি ১৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ২১-২৭
সংজ্ঞা ২১
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি ২৩
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় ২৩
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ২৪
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন ও
সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য ২৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
শরীয়তের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ২৮-৪০
ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ২৮
ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ৩০
অমুসলিম রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ৩২
চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র ৩৩
আঞ্চলিক সমুদ্রে ইসলামী রাষ্ট্রের এখতিয়ার ৩৬
উন্মুক্ত সমুদ্রে ইসলামী রাষ্ট্রের এখতিয়ার ৩৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ইসলাম আন্তর্জাতিক আইনের উৎসসমূহ ৪১
আল-কোরআন ৪২

সুন্নাহ ৫২
ইজমা ৫৯
কিয়াস ৬৮
সন্ধি বা চুক্তি ৭৮
প্রথা বা উরফ ৮৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ
জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম ৯০-৯৯
জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা ৯০
জাতীয়তাবাদের মৌলিক উপাদান ৯২
জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোন ৯৩
পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ৯৬
পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী আদর্শেল মৌলিক পার্থক্য ৯৭
ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ৯৮

অষ্টম পরিচ্ছেদ
জাতীয়তা ১০০-১০৬
জাতীয়তা বা নাগরিকতার সংজ্ঞা ও ভিত্তি ১০০
অমুসলমানদের নাগরিকতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টি ১০৩
নাগরিকতার বিলুপ্তি ১০৬

নবম পরিচ্ছেদ
কূটনীতি ১০৭-১২৯
কূটনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১০৮
কূটনীতির সংজ্ঞা ১১১
কূটনীতির ক্ষেত্রে রাসুলের অবদান ও কয়েকটি দৃষ্টান্ত ১১৩
নৈতিক কূটনীতি ১১৮
কূটনীতিজ্ঞদের অভ্যর্থনা ১২২
কূটনীতিজ্ঞদের কার্যাবলী ১২৪
কূটনীতিজ্ঞদের সুযোগ সুবিধা ১২৬
কূটনীতির গুরুত্ব ১২৮

দশম পরিচ্ছেদ
ইসলামের যুদ্ধনীতি ১৩০-১৪৭
জিহাদের সংজ্ঞা ১৩১
জিহাদ পরিচালনায় নেতৃত্বের প্রয়োজন ১৩৪
জিহাদ ঘোষণার বৈধতা ১৩৫

মুসলমানদের জন্য বৈধ যুদ্ধ ১৩৬
যুদ্ধে অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ ১৩৯
সামুদ্রিক যুদ্ধ ১৪২
আকাশ যুদ্ধ ১৪৩
জিহাদে মুসলিম নারী ১৪৪
জিহাদের মর্যাদা ১৪৫

একাদশ পরিচ্ছেদ
যুদ্ধ বন্দী ১৪৮-১৫৩
ইসলামে আন্তর্জাতিক আইন ও প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনে
যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কিত সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য ১৫২

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
গৃহযুদ্ধ ও বিদ্রোহ ১৫৪-১৬১
বিভিন্ন প্রকার প্রতিরোধ বা বিরোধিতা ১৫৪

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
শত্রু সম্পত্তি ১৬২-১৭৩
রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ১৬৩
ব্যক্তিগত সম্পত্তি ১৬৯
গণিমতের বন্টন ১৬৯
তানফিল ১৭১
সালার ১৭২

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
ইসলামের রাজনৈতিক আশ্রয় ও অপরাধীর বহিঃসমর্পণ ১৭৪-১৭৮
রাজনৈতিক আশ্রয় ১৭৪
অপরাধীর বহিঃসমর্পণ ১৭৫

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
শান্তি যুক্তি ১৭৯-১৮১

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ
অমুসলিমদের অধিকারসমূহ ১৮২-২০১
ধর্মীয় স্বাধীনতা ১৮২
নিরাপত্তার অধিকার ১৯১
চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ১৯৩

সভা সমাবেশ করার অধিকার ১৯৬
শিক্ষার অধিকার ১৯৮
সম্পদ অর্জন ও রক্ষণা-বেক্ষণের অধিকার ১৯৯
ভোটাধিকার ২০০

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
অমুসলমানদের কর্তব্যসমূহ ২০২-২১৪
নিরাপত্তা কর বা জিযিয়া ২০২
ভূমিকর বা খারাজ ২০৯
মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বিষয় পরিহার ২১২

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
নিরপেক্ষতা ২১৫-২২৫
নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোরআনের নির্দেশ ২১৬
মহানবী (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় নিরপেক্ষতার চুক্তিসমূহ ২১৮
ফকিহ্‌গণের মতে নিরপেক্ষতা ২২১
যুদ্ধরতদের প্রতি নিরপেক্ষদের কর্তব্য ২২৪

উনবিংশ পরিচ্ছেদ
ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ২২৬-২৫০
ও. আই. সি. প্রতিষ্ঠা বা গঠন ২২৭
ও. আই. সি. এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২২৮
ও. আই. সি. এর সদস্যপদ ২২৯
শীর্ষ সম্মেলন ২২৯
পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ২৩০
ও. আই. সি. এর অঙ্গ সংগঠনসমূহ ২৩২
ও. আই. সি. ভুক্ত অন্যান্য সংগঠন ২৩৩
ও. আই. সি. শীর্ষ সম্মেলনসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ২৩৪
ও. আই. সি. এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত ২৩৭
বিরোধ নিষ্পত্তিতে ও. আই. সি. এর ট্রাইবুন্যাল গঠন আবশ্যক ২৪২
ও. আই. সি. এবং বাংলাদেশ ২৪৩
অষ্টম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত ইশতেহারসমূহ ২৪৪
ইসলামী জাহানের সংহতি ও নিরাপত্তা ২৪৫
ইসলামী সম্মেলন সংস্থাকে শক্তিশালী নীতিমালা গ্রহণ ২৪৭
ও. আই. সি. সম্মেলন ও যুক্তরাষ্ট্র ২৪৮
গ্রন্থপুঞ্জী ২৫১-২৫৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই পটভূমি ও ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, কারণ এর মাধ্যমেই বিষয়টি স্পষ্ট ও বোধগম্য হবে।

এক: মানব জাতির সূচনা কাল থেকেই মানুষের মধ্যে সামাজিক জীবন যাপন ও অন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। এ কারণে মনীষী ও দার্শনিকগণ মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের ভাষায়, মানুষ প্রকৃতি গতভাবেই সভ্যতামুখী বা সমাজমুখী ।

দুই: সামাজিক জীবনের জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে অন্য মানুষের সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আরো অনেক ধরণের সম্পর্ক, সম্বন্ধ ও বন্ধনের প্রতিষ্ঠা করা। আজকের দিনে মানুষ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পের দিক থেকে খুবই অগ্রসর হয়েছে, বিশেষ করে রেডিও, টেলিভিশন,ও কৃত্রিম উপগ্রহসহ সকল ধরনের গনসংযোগ মাধ্যমের এমন ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে যার মাধ্যমে ভৌগলিক সীমাবদ্ধতায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের দিনে আর বিভিন্ন মহাদেশের প্রসঙ্গ, বিভিন্ন দেশের কথা ও সীমান্তের এপার-ওপার প্রসঙ্গ অতীতের তাৎপর্য বহন করে না বরং এসব এখন এক নতুন তাৎপর্য পরিগ্রহণ করছে। এখন বিশ্বপল্লী ও আন্তর্জাতিক মহাপরিবার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এ পল্লীর সদস্যরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্যভাবে পারস্পরিকবন্ধনে আবদ্ধ। তারা এখন বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক ও চৈন্তিক উপায়-উপকরণ এবং বাণিজ্যিক,শিল্প ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একে অপরের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে বা একের উপকরন ও অভিজ্ঞতা অন্যের কাজে লাগে। ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক ও অন্যান্য ঘটনার মাধ্যমে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, একে অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে ।

তিন : ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন আদর্শ। ইসলামী বিধি-বিধান কোন বিশেষ বর্ণ বা গোষ্ঠির জন্য নয়, কোন বিশেষ কাল বা স্থানের

জন্য নয় বরং তা হচ্ছে সকল জনগোষ্ঠি ও সকল সময়ের জন্য। অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে সারা দুনিয়ার জনগোষ্ঠির সকল সদস্য এক মহাপরিবারভূক্ত। আর মুহাম্মদ (সঃ) মানব জাতির নিকট প্রেরিত আল্লাহর সর্বশেষ দূত এবং তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন মানব জাতির জন্য সার্বজনীন নেতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং গোটা সৃষ্টিলোকের জন্য রহমত। কোরআন মজিদও রাসুল(সঃ) সকল মানুষকে তাওহীদ, তাকওয়া ও অন্যান্য মূলনীতির প্রতি আহবান করেছেন। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে, "হে মানব সকল। তোমরা তোমাদের রবের দাসত্ব কর" (বাকারাহ্ -২১)। "হে মানব সকল! ধরণীর বুকে যা কিছু হালাল ও পবিত্র রয়েছে তা থেকে ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরন কর না" (বাকারাহ্-১৬৮)। "হে রাসুল। তোমাকে তো সমগ্র মানবকুলের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি "(সাবা-২৮)। হে রাসুল! বলে দিন হে মানব সকল! অবশ্যই আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসুল "(আ'রাফ-১৫৮)। "কোরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ"(ছোয়াদ-৮৭)। কোরআন মজিদের এ সব আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কোরআন মজিদের সম্বোধনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসী এবং এক্ষেত্রে স্থান কাল, ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

চার : ইসলাম হচ্ছে শান্তির জীবন বিধান। ইউরোপীয় কতিপয় পন্ডিত প্রচারনা চালাচ্ছেন যে, ইসলাম তলোয়ার ও যুদ্ধের ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সঃ) শক্তি প্রয়োগে বিভিন্ন জাতির উপর স্বীয় আদর্শ চাপিয়ে দিয়েছেন; ইসলাম প্রতিক্রিয়াশীল, নারী নির্যাতনকারী, মানবতা বিরোধী আদর্শ। তাদের এসব বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের বিস্তার ও প্রসারের প্রতিরোধ করা এবং মুসলিম জনগোষ্ঠিকে ইসলামী বিধি-বিধানের সাথে পরিচিত হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং এ লক্ষ্যে আলেম ও মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের বিভিন্নভাবে হয়রানী করা। তারা যাতে বিশ্বের মজলুম জাতিসমূহকে অবাধে শোষণ করতে পারে সে লক্ষ্যেই এ ধরনের পরিকল্পিত প্রচার চালাচ্ছে।

পাঁচ : ইসলাম কতকগুলো সুদৃঢ় মূলনীতি ও সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ উপস্থাপন করেছে। ইসলামের অনুসারীদের জন্য এসব মূলনীতি ও মূল্যবোধের হেফাযত ও অনুসরণ অপরিহার্য। এসব নীতি ও মূল্যবোধের প্রাধান্যের ভিত্তিতেই অমুসলমানদের সাথে মুসলমানদের যে কোন ধরণের সম্পর্ক ইসলাম বৈধ বলে গণ্য করেছে। ইসলাম একদিকে যেমন অন্য দেশের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক

রক্ষার জন্য মুসলমানদের অনুমতি দিয়েছে, অপর দিকে কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছে "অবশ্যই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম" (আল-ইমরান:১৯)। "আর যে কেউ ইসলাম ব্যতিরেকে অন্য কোন জীবন বিধান গ্রহণ করবে তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না" (আল-ইমরান:৮৫)। কিন্তু এ সুস্পষ্ট ঘোষণার পাশাপাশি ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় মুসলমানদেরকে অন্যদের সাথে আচরণ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে হৃদয়কে প্রশস্ত করে দিয়েছে। ইসলাম অমুসলমানদের সাথে সদাচরন এবং ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক রক্ষা করাকে পছন্দনীয় গণ্য করেছে। এ সম্পর্কে কোরআন মজিদের আয়াত থেকে ধারণা লাভ করা যেতে পারে: "আর লোকদের সাথে উত্তম ভাষায় কথা বল "(বাকারাহ্:৮৩)।" কোন সম্প্রদায়ের আচরণ যেন তোমাদেরকে ন্যায়-নীতি অবলম্বন বা ভারসাম্য রক্ষা না করার অপরাধের দিকে ঠেলে দিতে না পারে, বরং তোমরা ন্যায়-নীতি ও ভারসাম্য অবলম্বন কর, এটাই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী " (মায়েদাহ্:৮)। ইসলাম শিরক ও কুফরকে আত্মিক-মানসিক ব্যাধি ও অপবিত্রতা হিসেবে গণ্য করে এবং মিথ্যা, বাতিল ও জুলুম হিসাবে আখ্যায়িত করে। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে : "নিঃসন্দেহে শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম" (লোকমান:১৪)। "হে ঈমানদারগণ! অবশ্যই মুশরিকরা অপবিত্র" (তওবাহ্:৩৮)।

এতদসত্ত্বেও ইসলাম এ অভিমত পোষণ করে না যে, মুসলমানরা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবে না, বরং ইসলামের অভিমত হচ্ছে তাদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করতে হবে। তাদেরকে যুক্তি-প্রমাণ ও বিচার বুদ্ধির সহায়তায় ধ্বংসাভিমুখি অবস্থা থেকে বাঁচাতে হবে। এ কারণে ইসলাম বলেছে, "তোমাদের দ্বীন (কর্ম ও পরিনাম) তোমাদের জন্য এবং আমাদের দ্বীন আমাদের জন্য" (কাফিরুন)। এ আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, এত নছিহত, এত উপদেশ ও কল্যাণ কামনা সত্ত্বেও যখন তোমরা আমাদের কথায় কান দিচ্ছ না, তখন তোমরা যেমন খুশি চলতে থাক, কিন্তু সেই সাথে পার্থিব ও পরকালীন জীবনের মহাবিপদ ও বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত থাক। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল তোমাদের কাজ-কর্মের উপর দৃষ্টি রাখবেন"। (তওবাহ্:৯৪)

অমুসলমানদের সাথে আচরণের মূলনীতি আলোচনা করার পর ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতির উপর আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়বস্তুকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: ১. সম্পর্কের প্রশ্ন এবং ২. সম্পর্ক

সংক্রান্ত মূলনীতি। ইসলাম নীতিগতভাবে অমুসলিম জাতি ও সরকার সমূহের সাথে সম্পর্কের বিষয়টিকে গ্রহণ করেছে এবং এর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। কারণ :

ক. মানুষ সামাজিক প্রাণী। স্বভাবগত চাহিদার কারণেই সে সমাজবদ্ধভাবে এবং অন্য মানুষের পাশে জীবন যাপনের মুখাপেক্ষী। অন্যদিকে ইসলাম হচ্ছে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির উপর ভিত্তিশীল একটি জীবন বিধান যা-মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করেছে এবং সমস্যাবলীর সমাধান করছে। এ কারণে ইসলাম বংশ, বর্ণ, গোত্র, চিন্তা, মতাদর্শ নির্বিশেষে সকলের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করাকে বৈধতা দিয়েছে।

খ. ইসলামের দাওয়াত হচ্ছে বিশ্বজনীন। ইসলামের বাণীকে সমগ্র বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং প্রত্যেক মানুষকেই এ দাওয়াত দিতে হবে। কোরআন মজিদ হচ্ছে ইসলামের অকাট্যতম সূত্র। কোরআন মজিদ সকলকে তাওহীদের দিকে আহবান করেছে। কিন্তু অন্যান্য জাতি এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে যোগাযোগ, সম্পর্ক ও মেলামেশা না থাকলে তাদেরকে দাওয়াত দানের এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন, "তুমি তোমার রবের পথে আহ্বান কর জ্ঞানের সাহায্যে ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তমভাবে" (আন-নাহল: ১২৫)।

গ. কোরআন মজিদের বিভিন্ন আয়াত ও রাসূলের বিভিন্ন হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নীতিগত ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের বিষয়টি বৈধ। কোরআন মজিদে এরশাদ হচ্ছে : "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের কারণে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদেরকে বাড়ী-ঘর ও দেশ থেকে বের করে দেয় নাই তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন"(মুমতাহিনাহ্:৮)। এ প্রসঙ্গে একই সূরার প্রথম আয়াতের নির্দেশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য; কেননা এ আয়াতে কাফের, মুশরিক ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে মুসলমানদের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে তার সাধারণ নীতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এরশাদ হয়েছে: "হে ঈমানদারগণ। তোমার আমার দুশমনকে ও তোমাদের দুশমনকে বন্ধু ও অভিভাবক বা শাসক রূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের পরিকল্পনা করছ, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্যের আগমন ঘটেছে তারা তাতে ঈমান আনে নাই এবং তোমাদের রব আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার কারণে তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকেও বহিস্কার করেছে"

(মুমতাহিনাহ্: ১)। এরপর আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম-(আঃ) এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা আল্লাহ্ তায়ালার দুশমন হওয়ার কারণে তিনি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দূরে চলে আসেন।

সম্ভবত এ আয়াতে কাফেরদের সাথে সম্পর্ক না রাখার জন্য প্রদত্ত নির্দেশের কারণে কেহ ধারণা করতে পারে যে, কাফের হওয়ার কারণে হয়ত তাদের সাথে যেকোন ধরণের সম্পর্ক রাখা নাযায়েজ। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কাফেররা কাফের বিধায় তাদের সাথে সদাচরণ করতে বা তাদের সাথে ন্যায়-নীতির সাথে আচরণ করতে আল্লাহ্ পাক নিষেধ করেন নি, বরং জালেম, অত্যাচারী ও আগ্রাসী কাফেরদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ এরশাদ করেন, "দ্বীনের কারণে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে বাড়ী ঘর থেকে বহিস্কার করেছে এবং যারা বহিস্কার করার ব্যাপারে সহায়তা করেছে, অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও শাসক রূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, অতঃপর যারা তাদেরকে গ্রহণ করবে তারা অবশ্যই জালেম হবে "(মুমতাহিনাহ্:৯)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও এলাকায় প্রচারক দল ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানকে তাঁর উপরে নাযিলকৃত আসমানী কিতাব ও তার লক্ষ, উদ্দেশ্য এবং তাঁর কর্মসূচী অবগত করেন। এদের মধ্যে হাবশার (ইথিওপিয়া) বাদশাহ্ নাজ্জাসী, রোমের সম্রাট কায়সার (সিজার), পারস্য সম্রাট কিসরা (খসরু পারভেজ), মিশরের বাদশাহ্ মুকাউকাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ও তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে রাজ-দূত প্রেরণ করেন। হযরত রাসূলে আকরাম (সঃ) এর জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, তাঁর নের্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল বিশ্বকে শিরক, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত করা এবং ন্যায়-নীতি ও ন্যায় বিচারের ছায়াতলে এক নতুন ইসলামী সমাজ গড়ার লক্ষে বিভিন্ন সরকারের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা।

একইভাবে বিশ্বের যে সব জাতি ও সরকার বিশৃংখলা সৃষ্টি, সীমা লঙ্ঘন, আগ্রাসন ও জুলুম-নিপীড়নে অভ্যস্ত ছিল না তাদের সাথে খুলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তীকালের ন্যায় পরায়ন শাসকগণ সেইসব জাতি ও সরকারের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ন্যায়-নীতি, সদাচরণ ও কল্যাণের নীতির ভিত্তিতে সুসম্পর্কের প্রতিষ্ঠাকে স্বীয় রাষ্ট্রের কর্মসূচী রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

অতএব, বলা বাহুল্য, অন্যদের অধিকার সংরক্ষণ, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান, মানুষের জন্মগত সম্মান ও মর্যাদার সংরক্ষণ, মুক্তি, স্বাধীনতা, ন্যায়-নীতি, ন্যায় বিচার ইত্যাদি ইসলামের আন্তর্জাতিক আদর্শ ও আইন কানুনের প্রধান বৈশিষ্ট, এগুলো কোন গোষ্ঠি বা জাতি বিশেষের নয়।

ইসলামের প্রথম যুগে বাস্তবদর্শিতা ও আইনভিত্তিক সম্পর্কের বদৌলতে এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে অদূরদর্শী নীতি-অবস্থান পরিহার করে চলার কারণেই ইসলাম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল এবং সত্যান্বেষী মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়ে স্থায়িত্ব লাভ করেছিল; শুধু তাই নয়, দিনের পর দিন ইসলাম অধিকতর বিস্তার লাভ করেছিল। তাই যারাই ইসলাম ও মুসলমানদের সাফল্য এবং বিশ্বের বুকে ইসলামের ব্যাপক বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী কার্যকারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরাই মূলত বিশ্ববাসীর সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে অমুসলমানদের নিকট ইসলামের সংস্কৃতি, আদব-কায়দা, রীতি-নীতি ও চরিত্র বিজ্ঞান তুলে ধরার বিষয়কে বিশ্বব্যাপি ইসলামের ব্যাপক বিস্তার লাভের প্রধানতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তীকালে, অমুসলিমদের উপর মুসলিমদের প্রভাব বিস্তারের ধারাটি দুর্বল হয়ে যায় এবং এর পিছনে দুটি কারণ রয়েছে : তার একটি হলো শিল্পের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগতের বিস্ময়কর অগ্রগতি যার কারণে মুসলিম সমাজ ও তাদের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি হয়। অন্যটি হচ্ছে, মুসলমানরা নিজের ইসলামের মূলনীতি ও মূল্যবোধসমূহের অনুসরণ পরিহার করেছে।

কিন্তু এখন যখন মুসলমানরা সচেতন হয়েছে, যতটা সম্ভব নিজেদের পশ্চাৎপদতার রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে এবং পাশ্চাত্যবাসীরাও বুঝতে পেরেছে যে, আধ্যাত্মিকতার পথ বাদ দিয়ে তারা কোন লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হবে না, তখন মুসলমানদের উচিত তাদের সাথে ইসলামের আইনগত ভিত্তির আলোকে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ পথেই মুসলমানরা নতুন ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করতে এবং হৃত গৌরব, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ্ব সম্প্রদায় ও ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত মানব জাতির জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বিশ্বজনীন, সার্বজনীন, চিরন্তন ও গতিশীল জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন শরীয়তের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহপাক বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর শরীয়ত এজন্য নাযিল করেছেন যে, তিনি আরব-অনারব, প্রাচ্য-প্রতীচ্য, উত্তর-দক্ষিণ, তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য ঐশী আশীর্বাদরূপে পৌছে দিবেন যা বাস্তবে রূপায়িত হলে ভূ-পৃষ্ঠের বুকে শান্তিপূর্ণ, সুশৃংখল, সুখী, সমৃদ্ধশালী বহুজাতিক বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। পবিত্র কোরআনে এ কথারই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, "হে মুহাম্মদ আপনি মানুষের মধ্যে এ কথা ঘোষণা করে দিন যে, হে মানুষেরা। নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসুল মনোনীত হয়ে প্রেরিত হয়েছি" (আল-আরা'ফ:১৫৮)।

উপরোক্ত আয়াতাংশের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো মুহাম্মদ গোটা মানব জাতির জন্য রাসুল এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ বিধানাবলীও গোটা মানব জাতির জন্য। এপ্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুলকে হিদায়েত ও সত্যদ্বীনসহ এ জন্য প্রেরণ করেছেন যে, তিনি পৃথিবীর অপরাপর সকল মনগড়া মানব রচিত মতবাদের উপর বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেখাবেন" (আস-সফ:৯)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন, হিদায়েত ও সত্যদ্বীন বলতে শরীয়তের মৌলিক নীতিমালাকে বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মদ (সঃ) সেই শাশ্বত বিধিমালা প্রচার ও প্রসার করে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন যা মানব রচিত আইনের দ্বারা গঠিত সমাজের চেয়ে অনেক অনেক বেশী শান্তিপূর্ণ, শোষণমুক্ত ও মানবতাবাদী হবে; ফলশ্রুতিতে ইসলামী আইন মানব রচিত আইনের উপর বিজয়ী হবে। অতএব, বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিভঙ্গি যে সুদূর প্রসারী তা সহজে অনুমেয়। তবে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য বিশ্বসম্প্রদায় করা এবং চলমান বিশ্বে মানব সমাজের শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় ও মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা কতটুকু কার্যকর ও ফলপ্রসূ তা আলোচনা করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের নিরীখে

প্রত্যেকটি বিষয় নিম্নরূপ আলোচনা করা হলো।

বিশ্ব সম্প্রদায়:

সৃষ্টিগত দিক থেকে পৃথিবীর সকল মানুষ একই মূল হতে উৎসারিত। এ
ও অভিন্ন আদম ও হাওয়া থেকে বংশ বৃদ্ধি হতে হতে পৃথিবী আজ এক বিশাল
জনগোষ্ঠীতে পরিপূর্ণ। মানব জাতির সৃষ্টির ইতিহাস আল্লাহ্ পাক পবিত্র
কোরআনে তুলে ধরেছেন, "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালন কর্তাকে
ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার
সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর যিনি তাদের দুইজন হতে অগনিত পুরুষ ও নারী
পৃথিবীতে বিস্তার ঘটিয়েছেন" (আন-নেসা:১)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায়
যে, পৃথিবীর সকল মানুষ একই মূল হতে উদ্ভূত। সুতরাং পৃথিবীর সকল মানুষ
এক সম্প্রদায় ভুক্ত অর্থাৎ বিশ্ব সম্প্রদায়। পৃথিবীর সকল মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি
একই বাবা-মার সন্তান একই সম্প্রদায় ভুক্ত একথা পবিত্র কোরআনের অনেক
স্থানে বলা হয়েছে। "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও
এক নারী হতে। পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে
তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার "(হুজরাত-১৩)।" তিনি (আল্লাহ্)
তোমাদের একই প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকের জন্য থাকিবার স্থান
এবং সমাধি নির্দিষ্ট রয়েছে "(আনআম- ১)।

পৃথিবীর সকল মানুষ শুধু সৃষ্টিগত দিক থেকে এক নয় মতাদর্শগত দিক
থেকে ও তারা এক ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাক বলেন, "সকল মানুষ একই জাতি
সত্তার অর্ন্তভূক্ত ছিল অতঃপর আল্লাহ্পাক পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও
ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে" (বাকারাহ-২১৩)। আলোচ্য আয়াতটি থেকে বুঝা
যায় যে, সমস্ত মানুষ একটি মাত্র জাতি,মতাদর্শ তথা সত্যদ্বীন ও ধর্মের উপর
প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু মানুষ নিজেরাই পৃথক পৃথক হয়ে যায় নিজেদের কর্মের
ফলে। মানুষ যে একটি সত্য দ্বীনের উপর ছিল সে সম্পর্কে তাফসীর কারকগণ
বলেন, (ক) হযরত উবাই ইবনে কা'ব এবং ইবনে যায়েদ বলেন, সমস্ত মানুষের
আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল (আ'লাসতু বি-রব্বিকুম) আমি
কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন এক বাক্যে সকল মানুষ বলেছিল অবশ্যই
আপনি প্রতিপালক। একথা স্বীকার করে নেয়ার পর স্বভাবতই মানুষের উপর
একটিই ধর্ম অর্পিত হয়, তাহলো ইসলাম। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস
বলেন, এই একত্ববাদের বিশ্বাস তখনকার যখন হযরত আদম (আঃ) সস্ত্রীক

নিয়াতে আগমন করলেন এবং তাদের থেকে এক মানব গোষ্ঠির সৃষ্টি হলো আর
রা সবাই আদম(আঃ) এর ধর্ম, শিক্ষা ও শরীয়তের অনুগত ছিল। একারণে
থিবীর সকল মানুষ এক জাতি ও ধর্মে বিশ্বাসী ছিল এবং এ ধারা হযরত ইদ্রিস
আঃ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন হযরত নুহ (আঃ) এর তুফান
র্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোটকথা বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর সকল মানুষ একই
আদর্শ তথা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিল এবং এটাই ছিল প্রকৃতির ধর্ম। এই
প্রকৃতির ধর্ম থেকে মানুষ দূরে সরে পড়ার কারণে মানব সমাজের পরবর্তী
ইতিহাস ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাতময় হয়ে ওঠে । এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে
বলা হয়েছে , "সমস্ত মানুষ একই উম্মতভূক্ত ছিল। পরে তাদের মধ্যে মতানৈক্য
সৃষ্টি হয়ে গেল; যদি আল্লাহ্তায়ালার এটাই স্থায়ী সিদ্ধান্ত হতো যে, (এ জগতে
সত্য মিথ্যা একত্রিত হয়ে চলবে) তবে এসব বিবাদের এমন মীমাংসা তিনি করে
দিতেন যাতে মতানৈক্য কারীদের নাম নিশানাই বিলুপ্ত হয়ে যেত"(ইউনুস-১৯)।
তোমাদের এই জাতি একই জাতিসত্তার অন্তর্ভূক্ত এবং আমি তোমাদের
প্রতিপালক; এজন্য তোমরা সবাই আমার ইবাদত কর" (আম্বিয়া:৯২)। এ ছাড়াও
আল্লাহ্ আরো বলেন, "তোমাদের এই জাতি একই জাতিসত্তার অন্তর্ভূক্ত একই
ধর্মের অনুসারী এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা; অতএব, তোমরা আমাকেই ভয়
কর"(মুমিনুন-৫২)।

পূর্বে আলোচিত আয়াতের ব্যাখ্যা ও আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র
বিশ্ববাসীর প্রতি ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের সার্বজনীন আবেদন যে,
বিশ্বসম্প্রদায় যদি প্রকৃতির ধর্ম হিসেবে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের বিধি-
বিধানকে মেনে চলে তাহলে এ অশান্ত পৃথিবীতে অবশ্যই শান্তির সুবাতাস
প্রবাহিত হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে মানবাধিকার।
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে গোটা মানব জাতি তথা বিশ্বসম্প্রদায়কে
মোট দুভাগে ভাগ করা হয়েছে:

ক. অমুসলিম সম্প্রদায়:

আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীর সকল শ্রেণীর এবং সকল সময়ের মানুষের
জন্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কাছে পথ নির্দেশ স্বরূপ শরীয়াহ্ অবতীর্ণ
করেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :"বলুন, হে লোক
সকল! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র প্রেরিত রাসুল "(আরাফ-
১৫৮)। যে লোক এই শরীয়াহ্ বা ইসলামের উম্মুক্ত দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে
এবং মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর উপর অবতীর্ণ রেসালতের প্রতি ঈমান এনেছে সে

হচ্ছে মুসলমান। আর যে এই দাওয়াতের প্রতি সাড়া দেয় নাই অর্থাৎ রাসূলে
রেসালতের উপর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে নাই সে হচ্ছে অমুসলমা
অমুসলমানদের মধ্যে রয়েছে অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক, ইহুদী, খৃষ্টান, নো
কাদিয়ানী প্রভৃতি। শরীয়াহ্ ইসলাম গ্রহণ ও প্রত্যাখানের উপর ভিত্তি ক
মানবজাতিকে বিভক্ত করা হয়েছে । ইসলামে বিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন দি
যেমন জাতি, গোত্র, ভাষাও অঞ্চল ইত্যাদিকে বিন্দুমাত্র দেখা হয় নাই।
ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক বলেন, " তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃ
তোমাদের মধ্য থেকে কেহ্ কাফের, কেহ্ মুমিন হয়েছ, আর আল্লাহ্ তোমাদে
কাজ কর্মের উপর দৃষ্টি রাখছেন"(আত-তাগাবুন:২)।

অমুসলমানদের শ্রেণীবিভাগ: এদের শ্রেনী বিভাগ প্রচুর এবং প্রতি
শ্রেণীর পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। যেমন:

১. আহলে কিতাব : মুসলমান ব্যতীত যাদের উপর আসমানী কিতাব অবতী
হয়েছে তাদেরকে আহলে কিতাব বলে, যেমন ইহুদী ও খৃষ্টান এবং কোন ফে
ফকিহ্ এর মতে অগ্নিপূজকও আহলে কিতাবের অর্ন্তভূক্ত। অগ্নিপূজকরা সূর্য
আগুনের পূজা করে এবং যারাদাস্তকে নবী বলে দাবী করে

২. দাহেরীরা : এই সম্প্রদায় সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করছে । তারা বলে এ
বিশ্ব ব্রামন্ডের কোন সৃষ্টিকর্তা নাই। দুনিয়ার যা কিছু আছে সব সৃষ্টিকর্তা ছাড়
নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলে এই দুনিয়াই আমাদের সব। মৃত্যুর প
আর কিছু নাই । এরা আধুনিক যুগে নাস্তিক নামে পরিচিত।

৩. মুশরিক : এই সম্প্রদায় সৃষ্টিকর্তা বা রবকে স্বীকার করে কিন্তু একজন
নয়। তারা সৃষ্টিকর্তার সাথে বহু অংশীদার দাবী করে এবং তাদের পূজা-অর্চ
করে। এদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ ইত্যাদি।

৪. কাদিয়ানী : ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্ম থেকে দূ
রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের নীলনকশার ফলশ্বরূপ ১৯০০ সালে ভারতে
কাদিয়ান শহরে এই মতবাদের উৎপত্তি ঘটে। মির্জা গোলাম আহম্মদ কাদিয়া
এর প্রবক্তা। তিনি নিজেকে নবী বলে প্রচার করেছেন। গোলাম আহম
কাদিয়ানীর অনুসারীদেরেকে কাদিয়ানীয়হ্ বা কাদিয়ানী বলা হয়। কাদিয়ানী
বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহম্মদ প্রতিশ্রুত মসিহ্ এবং মুহাম্মদ(সঃ) শেষ ন
নন:অর্থাৎ নবীদের আগমন শেষ হয় নাই। এই সেলসেলা বা ধারাবাহিক
জারি আছে। আল্লাহ্ প্রয়োজনে দুনিয়ায় আরো নবী পাঠাবেন এবং এরই অং
হিসেবে গোলাম আহম্মদকে নবী করে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি

সকল নবীদের শ্রেষ্ঠ নবী। এদের মতে প্রতিশ্রুত মসিহ্র কাছে আসা
ঐশিবানীই কোরআন-অন্য কিছু নয় । কাদিয়ানী সম্প্রদায় আপন রক্ত সম্পর্কের
মধ্যে বিবাহ বন্ধনকে বৈধ করেছে। এ ছাড়া তারা আরো বিশ্বাস করে যে,
আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের মত সকল কাজ করেন। তাদের এসব কথাবার্তা
থেকে আমরা আল্লাহ্র কাছে তওবা চাচ্ছি । বর্তমানে অধিকাংশ কাদিয়ানী
পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত ,বাংলাদেশ এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশে
বসবাস করছে। মুসলিম উম্মাহ্ এদেরকে সর্বসম্মতিক্রমে অমুসলমান ঘোষণা
দিয়েছে।

৫. মুরতাদ : এ শব্দের অর্থ হচ্ছে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা।
কথা, কাজ ও শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়কে অস্বীকার করার মাধ্যমে
একজন মুসলমান ইসলামের রজ্জু থেকে বের হয়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তি এরূপ
করে তাকে মুরতাদ বলে। পরিপূর্ণ ভাবে মুরতাদ হওয়ার জন্য সুস্থ্য, জ্ঞান
সম্পন্ন, ও প্রাপ্ত বয়স্ক(নারী-পুরুষ) হতে হবে। পাগল, শিশু, মাতাল, এবং জ্ঞান
লোপ পেয়েছে এরূপ কোন্ ব্যক্তির উপর মুরতাদের হুকুম জারি করা বৈধ নয়।
ওলামাগণ সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মুরতাদ নারী হোক,
পুরুষ হোক উভয়ের জন্য হত্যার হুকুম। তার এই হুকুমকে যথাযতভাবে
কার্যকর করার আগে তাকে তওবা করার বা ইসলামে পুনরায় ফিরে আসার
সুযোগ দিতে হবে এবং প্রয়োজনে তাকে বুঝানোর জন্য লোক নিয়োগ করা
যেতে পারে। ইসলামে পুনরায় ফিরে আসলে হত্যার হুকুম প্রত্যাহার করা হবে
এবং ফিরে না আসলে হুকুম বহাল থাকবে। তাঁরা এর স্বপক্ষে কোরআনের
আয়াত ও নবীর হাদিসকে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেন। আল্লাহ্ পাক বলেন,
"তাদেরকে হত্যা কর অথবা মুসলমান বানাও"(ফাতহ:১৭)। রাসূল (সঃ)
বলেন, "যে দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে তাকে হত্যা কর"(ইবনে মা'যা, কিতাবুল
হুদুদ ২য় খন্ড)। হানাফী মাযহাব নারী মুরতাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষন করে
বলে যে, নারী মুরতাদকে বন্দী করে রাখতে হবে এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণের
ব্যাপারে প্রয়োজনে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। তাঁরা এর স্বপক্ষে রাসুলের হাদিস
উপস্থাপন করেন । যেমন রাসুল(সঃ) বলেন, "মেয়েদের হত্যা কর না"(আবু
দাউদ ,কিতাবুল জিহাদ,২য় খন্ড)।

উপরোক্ত শ্রেণী বিভাগের ফলাফল: বিভিন্ন শ্রেণীর অমুসলমান সম্পর্কে শরীয়তে
কয়েকটি হুকুম আছে। যেমন:

১. মুরতাদ ব্যতীত সকল অমুসলমান জিম্মাচুক্তিবদ্ধ হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস

করতে পারবে।

২. হারাম ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকরএমন ব্যবসা-বানিজ্য,লেন-দেন ও আমদানী-রপ্তানী বাদে মুসলমানরা অমুসলমানদের সাথে সকল ধরনের কাজ-কর্ম করতে পারবে ।

৩. মুশরিক ব্যতীত আহলে কিতাবের মেয়েদের সাথে মুসলমান ছেলেদের বিবাহ বৈধ কিন্তু আহলে কিতাবের ছেলেদের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ বৈধ নয় কারণ তারা বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সঃ)কে স্বীকার করে না ,অপর দিকে মুসলমানরা আদম(আঃ) থেকে সকল নবীদের স্বীকার করি এবং এটা আমাদের ঈমানের একটি অংশ। মুসলমানরা মুশরিক মেয়েদের বিবাহ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমান না হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের হুকুম হচ্ছে "তোমরা মুশরিক মেয়েদের বিবাহ কর না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে "(আল-বাকারাহ্:২২১)। হযরত ওমর (রাঃ) আহলে কিতাবের মেয়েদের বিবাহ করাকে ঘৃনিত বলে বর্ননা

করেছেন, কারণ তিনি তাদেরকেও মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত করেছেন কেননা ইহুদীরা উজায়ের (আঃ) ও খৃষ্টানরা ইসা(আঃ)কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে সবচেয়ে বড় শেরেকী করেছে যার কোন ক্ষমা নাই। বর্তমান যুগে হযরত ওমরের এই যুক্তিটি অত্যধিক গ্রহনীয় কারন, বর্তমানে আহলে কিতাবীদের মধ্যে মুহ্‌সেনাত (সতী) মেয়ে নাই যার কথা কোরআন পাকে উল্লেখ রয়েছে ।

ঘ. মুসলিম উম্মাহ:

ইসলামের ইসমে ফায়েল থেকে ইসতেসলাম বা মুসলিম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে দ্বীন ইসলামের অনুসারী হওয়া। পারিভাষিক অর্থে বলা যেতে পারে যে, যিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে আল্লাহ্‌তায়ালার কোন শরীক বা অংশীদার নাই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুহাম্মদ(সঃ) সঠিক পথ দেখানোর জন্য উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। এছাড়াও একজন মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করে, রোযা রাখে, যাকাৎ আদায় করে, হজ্ব পালন সহ এবং শরীয়তের অন্যান্য হুকুম-আহকাম পালন করে। উল্লেখ্য যে, হযরত জিবরীল (আঃ) রাসূলের কাছে প্রশ্ন করে ইসলাম সম্পর্কে এ ভাবে উত্তর নিয়েছিলেন, যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই, মুহাম্মদ তার বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ, নামাজ কায়েম করা, যাকাৎ আদায় করা, রোযা রাখা ও হজ্ব পালন করা। (আল-বুখারী, হাশিয়াতে আল সনদী, ১ম খন্ড)।

এছাড়াও পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারার ২৮৫ নং আয়াতে অনুরূপ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণণা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত ও হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, একজন প্রকৃত মুসলমান হতে হলে জীবনের সর্ব অবস্থায় (ব্যক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক,ও অর্থনৈতিক) হযরত মুহাম্মদ(সঃ) এর আদর্শ ও নির্দেশ মোতাবেক ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে হয় এবং সাথে সাথে দুনিয়ার তাগুতি ও মানবরচিত মতবাদকে পরিহার করতে হয় কেননা ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র ধর্ম। যেমন এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌পাক বলেন, " আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম"(আল-ইমরান:১৯)। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের ধর্মকে ....আল-মায়েদা: ৩)।

গ. জিম্মি:

জিম্মা শব্দ থেকে জিম্মির উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে নিরাপত্তা ও চুক্তি। যাকে এই চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদান করা হয় তাকে জিম্মি বলে। আরো স্পষ্ট করে বলা যেতেপারে যে সকল অমুসলিম নাগরিক স্বীয় ধর্ম বিশ্বাসে অবিচল থেকে ইসলাম গ্রহণ না করে শুধুমাত্র ইসলামী সমাজনীতি, অর্থনীতি,ও রাষ্ট্রনীতিতে মুগ্ধ হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হয় তাদেরকে ইসলামী আর্ন্তজাতিক আইনের পরিভাষায় জিম্মি বলা হয় । অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, জিজিয়া প্রদানের (ইসলামী রাষ্ট্রে) বদলে যার জান,মাল, সম্মান ও প্রতিপত্তি ইত্যাদির নিরাপত্তা বিধান করা হয় তাকে জিম্মি বলে। ইসলামী রাষ্ট্র এসব জিম্মিদেরকে সম্পূর্ণ শান্তি, ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করার সার্বিক ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে । এই জিম্মা চুক্তি জিম্মিরা ছিন্ন না করা পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র ছিন্ন করে না বরং বংশ পরম্পরায় অব্যাহত থাকে। অমুসলিমদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, ধর্মে কোন জোর যবরদস্তি নাই"(আল-বাকারাহ্:..)। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র বলেন, "তোমরা ওদের(অমুসলিমদের) গালি-গালাজ করবে না যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য দেবদেবীদের ডেকে থাকে"(আল-আ'নাম:১০৮)। এ প্রসঙ্গে রাসুল(সঃ) এর উক্তি প্রনিধানযোগ্য। রাসুল (সঃ) বলেন,"যে লোক কোন জিম্মিকে জ্বালা যন্ত্রনা দিবে আমি তার প্রতিবাদকারী। আর আমি যার প্রতিবাদকারী হব তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব।" রাসুল (সঃ) আরো বলেন, "যে লোক কোন

চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিম) নাগরিকের উপর জুলুম করবে ও তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজের চাপ দিয়ে তা করতে বাধ্য করবে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী হয়ে দাঁড়াব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

াধারণ আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের স্থান

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম ইউরোপ থেকে উদ্ভূত য়ে। তাই ইউরোপীয়া লেখকগণ গ্রীক নগর রাষ্ট্রের কথা দিয়ে এর ইতিহাস শুরু রেন এবং পরবর্তী রোমান যুগের বর্ণনা দেন। এরপরে হঠাৎ অন্তর্বর্তী প্রায় াজার বছরের ইতিহাসকে উপেক্ষা করে চলে আসেন আধুনিককালের আলোচনায় এবং জোর দিয়ে বলেন - মধ্যযুগে আন্তর্জাতিক আইনের ...কোন অবকাশ এবং প্রয়োজন ছিল না। তাদের এ উক্তির সত্যতা যাচাই করার জন্য এ আলোচনা। োর সুবিধার্থে এ বিষয়টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত: গ্রীক যুগ- ীসীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বলতে বুঝা যায় যে, গ্রীক উপদ্বীপে অবস্থিত নির্দিষ্ট ংখ্যক নগর রাষ্ট্রের মধ্যেকার সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা ও সভ্যতা। এ সব নগর রাষ্ট্রের ধিবাসীরা এক ও অভিন্ন জাতির লোক ছিল, একই ভাষায় কথা বলত, একই র্মে বিশ্বাস করত এবং একই প্রথা মেনে চলত যদিও একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল ছিল না এবং যে কোন মূল্যে তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখত। বস্তুত ীক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে দুটি স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট বিধিমালা ছিল। একটি গ্রীকদের জন্য ও অন্যটি তৎকালীন সভ্য পৃথিবীর বাকী সব লোকদের জন্য প্রযোজ্য ছিল তবে শেষোক্তটি অনুন্নত ও অবিন্যস্ত ছিল।

দ্বিতীয়ত: রোমান যুগ - এ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হয়ে থাকে য তাদের আইন কোন এক বিশেষ জাতির জন্য ছিল না বরং রোম সাম্রাজ্যের কল প্রজার উপরে প্রযোজ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে রোম সাম্রাজ্য বহু রাষ্ট্রের সমন্বয়ে ঠিত ছিল এবং এদের সবাই কম বেশী সিজারের আনুগত্য স্বীকার করলেও যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। এ ধরনের স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে কোন বিবাদ দেখা দিলে রোমের নির্দেশ চাওয়া হত এবং রোমীয় আইন অনুযায়ী সম্রাটের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গন্য হত। আধুনিক লেখকগণ একেই গ্রীসীয় আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থার উত্তরাধিকারী এবং অগ্রদূত বলে অভিহিত করে থাকেন তবে তাদের এ ধারনাও ঠিক নয় কারণ তাঁরা শুধুমাত্র রোম সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত অংশগুলির মধ্যে প্রযোজ্য প্রশাসনিক বিধিমালাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে অভিহিত করেছেন। যুদ্ধ এবং শান্তিকালে রোমানরা অরমীয়দের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিধিমালা মেনে চলত তাকে তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। এ সকল

বিধিমালা খুব বিস্তারিত বা সুবিন্যস্ত ও উন্নত না হলেও কেবল এইগুলি ন্যায়সঙ্গতভাবে রোমীয় আন্তর্জাতিক আইন হওয়ার দাবী রাখে। যাহোক শান্তি সম্পর্কিত রোমীয় আন্তর্জাতিক আইন গ্রীসীয় ব্যবস্থা হতে উন্নততর ছিল বলে দাবী করা হয়। কিন্তু যুদ্ধ সংক্রান্ত রোমীয় আইনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি; কেননা বিবাদমান প্রতিপক্ষের কোন অধিকার আছে বলে তারা স্বীকার করত না এবং অরোমীয় শত্রুদের বেলায় খেয়াল খুশী মাফিক আচরণ করত। যদিও ইউরোপবাসী গোড়া থেকেই খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়া শুরু করেছিল, তবুও যীশু খৃষ্ট প্রচারিত-প্রেমবানী আন্তর্জাতিক আইন বিকাশে সহায়ক ছিল না। খৃষ্টের বাণী বলে ম্যাথিউতে (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) উল্লেখ আছে, 'পাপকে বাধা দিও না, যদি কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে তাকে তোমার বাম গাল এগিয়ে দিও।' অথবা (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ) 'সিজারের নিকট সিজারের প্রাপ্য ও আল্লাহ্‌র নিকট আল্লাহ্‌র প্রাপ্য বুঝিয়ে দাও'। পুনরায় (২৬ পরিচ্ছেদ) তোমার তরবারী যথাস্থানে রেখে দাও; কেননা যারা তরবারীর আশ্রয় নেয় তরবারীতেই তাদের ধ্বংস'। সেন্ট জন সুসমাচারে উল্লেখ আছে, 'এই পৃথিবীর রাজত্ব আমার নয়'।

প্রাথমিক খৃষ্টীয় শিক্ষা এমন ছিল যে, একজন খৃষ্টানের পক্ষে বল প্রয়োগ দ্বারা আত্মরক্ষা দূরের কথা এমনকি নির্যাতনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য আইনের আশ্রয় চাওয়া সম্ভব ছিল না।

অধ্যাপক নরম্যান বেন্টউইখ এ প্রসঙ্গে বলেন, এ হচ্ছে ক্যানানদের বিরুদ্ধে হিব্রুদের মনোভাব এবং রোমে ফিরে যাওয়ার আন্দোলনের স্লোগান বটে এবং যে খৃষ্টীয় বাণী জনসাধারনকে পরিনামে রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল সে মনোভাব ও নয়। উপরন্তু আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন সূত্র প্রণয়নের সময় খৃষ্ট ধর্মের নৈতিক বলের আরও অবনতি ঘটেছিল। পোপ ও যাযকতন্ত্র দূর্নাম অর্জন করেছিল। ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক আইনের জনক গ্রোটিয়াস তার De jure belli ac paciscis (১৬২৫ সালে প্রকাশিত) নামক গ্রন্থের মুখবন্ধে উল্লেখ করেন যে তাঁর সময়কার ইউরোপীয় খৃষ্টান জাতিরা যুদ্ধের এমন ধরনের আচরণ করত যা দেখে বর্বরও লজ্জাবোধ করত। ১৮৫৬ সাল অবধি ইউরোপীয় সভ্য জাতিরা বিশ্বাস করত যে আন্তর্জাতিক আইনের সুবিধা ভোগ করার অধিকারী একমাত্র খৃষ্টান জাতি সমূহ। উক্ত সালে খৃষ্টীয় ধর্মবোধ নয় বরং নিছক বাস্তব রাজনীতির তাগিদে প্যারিস চুক্তির আওতায় তারা মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্ককে সভ্য জাতির আওতাভূক্ত করে নেয়। জাপান ও অন্যান্য অ-খৃষ্টীয় জাতিকে এই সম্মানের জন্য আরো অপেক্ষা করতে হয়। এর পরেও অনেকে এই

একই ধারণা পোষন করেন এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ওলসী (টমাস,ডি.ওলসী; ইন্টারন্যাশনাল ল্য ৪র্থ সংস্করন নিউইয়র্ক ১৮৮৯)।

দাবী করেন যে, খৃষ্টীয় জাতিসমূহ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা অবশ্য পালনীয় বলে স্বীকার করে তাই আন্তর্জাতিক আইন। পোপের এক হুকুমনামা অনুযায়ী খৃষ্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে সম্পাদিত তাদের চুক্তির বিধি-বিধান পালন করতে বাধ্য নয়। আর্নেষ্ট নীসের বর্ণনা অনুযায়ী , মুসলমানগণ কর্তৃক খৃষ্টধর্মের লালন ভূমি জেরুসালেম ও পেট্রিয়ার্কদের দুটি পীঠস্থান আলেকজান্দ্রিয়া ও এন্টিয়ক বিজয় এবং উমাইয়া, আব্বাসী ও তুর্কীদের হাতে খৃস্টানদের বার বার পরাজয়ে ধর্ম-জাযকদের মন এত বিষিয়ে তুলেছিল যার ফলে খৃষ্টীয় জাযক সম্প্রদায় স্বয়ং যুদ্ধের বিভীষিকার স্বপক্ষে প্রেরণা যুগিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ওয়াকার মন্তব্য করেন যে, 'মুসলিম ভীতির চাপে পড়েই ইউরোপ ক্রুসেডের সময় প্রথমবারের মতো একতাবদ্ধ হয় এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি একই পতাকা তলে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করে যা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি।(T. A. Walker . A History of the Law of Nations vol.1). এ ছাড়াও পিয়েরে বেলো, আয়আলা, ভিটোরিয়া, জেন্টিলস প্রমুখ লেখকগণ সবাই স্পেন ও ইটালীর লোক এবং এদের সবাই খৃষ্টান সমাজের উপর ইসলামের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। অপর একজন লেখক গ্রোটিয়াস উল্লেখ করেন যে, তিনি একটি বিষয় দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন যখন তিনি আবিস্কার করলেন মুসলিম আইনে (postliminium) নির্বাসিত বা শত্রুর হাতে বন্দী ব্যক্তি দেশে ফিরলে তার পুরানো নাগরিক অধিকার ফিরে পাওয়ার বিধান) প্রচলিত ছিল। এ সব থেকে বুঝা যায় যে, তিনি এবং তার সমসাময়িক ব্যক্তিরা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন পর্যালোচনা করছিলেন। তখন প্রাচ্যে বাগদাদ ও পাশ্চাত্যে কর্ডোবা আরব ও ইসলামী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে বিরাজমান ছিল। এ ছাড়াও তখন আরব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী আরব সংস্কৃতি ও ইসলামী আইন শেখার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন অংশ থেকে বহু শিক্ষার্থী সমবেত হতো। শত শত বছর ধরে ইউরোপের শিক্ষার খোরাক জুগিয়েছে লেটিন ভাষায় অনূদিত আরবী ও ইসলামী বই।

পাশ্চাত্যদের কাছে আধুনিক আর্ন্তজাতিক আইনের উপর ইসলামের বিশেষ করে এর প্রথম যুগে কদাচিত স্বীকৃতি পায়। এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন নিস, ওয়াকার ও বেরন দ্যা তবে ১৯২৬ সালে হেগের আন্তর্জাতিক আইন গবেষণা কেন্দ্রে এক বক্তৃতায় বলেন, ' মধ্যযুগে ইউরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যদেশীয় উৎসের পুরোপুরি ছাপ বহন না করলেও ন্যূনতম প
প্রাচ্যের অনুরূপ মুসলিম সামরিক প্রতিষ্ঠানের উপর একাধিক নির্ভরশীলতা
অকাট্য সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বহু দৃষ্টান্ত দেন উপরন্তু একথাও স্বীকার করে
যে আরব ব্যাবসায়ীরা যখন প্রাচ্যে চীন ও পাশ্চাত্যে সুইডেন ও ডেনমার্ক অব
গমন করেন তখন আন্তর্জাতিক বানিজ্যের ক্ষেত্রে বাইজানটাইন ও গ্রীকরা নিস্ক্র
ছিল। প্রমাণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত 'সুইডেনে প্রাপ্ত ৩
হাজার আরবীয় মুদ্রার মধ্যে বাইজানটাইন মুদ্রার সংখ্যা ছিল মাত্র দু'শ'। এ ছাড়া
বাণিজ্য, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন ও এমনকি সামরিক কৌশলের ক্ষেত্রে মধ্য যুগী
ইউরোপের উপর ইসলামের প্রভাব স্বীকৃত অধিকন্তু মুসলমানরা ফিকহ্ র
আইনের অংশ হিসেবে সিয়ার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়ন করত।

এর থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, মুসলমানরা আন্তর্জাতি
আইনকে অনেক আগে থেকেই রাজনীতি ও সাধারণ আইন থেকে বিচ্ছিন্ন কর
একটি পৃথক বিষয় বস্তু হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল। আন্তর্জাতিক আইন
তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাচীন আরবী ভাষার রচনা অধ্যায়ন করলে শান্তি
যুদ্ধের সময়ের মুসলমান, রোম ও অন্যান্যদের মধ্যে সম্পর্কের স্পষ্ট ধারণা লা
করা যায় এবং যুদ্ধ বিদ্যা সম্পর্কে বিদ্যমান পারস্পরিক ক্রিয়া ও আন্তর্জাতি
আইনের পারস্পরিক ক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। শত্রুর পূর্ণ অধিকারের সর্বকালী
স্বীকৃতির ধারনা শান্তি ও যুদ্ধের সময় সমানভাবে প্রযোজ্যের বিষয়টি ইসলাম
আইনেই প্রথম দেখতে পাওয়া যায় এবং এ অধিকারের স্বীকৃতি আছে কোরআনে
আছে নবী ও তাঁর উত্তরসুরীদের ব্যবহারিক জীবনে। উপরন্তু এও লক্ষ্য করা
বিষয়যে, আয়আলা, ভিটোরিয়া, জেন্টাইল, গ্রোটিয়াস এবং অন্যান্য লেখকগ
কর্তৃক লিখিত যুদ্ধরীতি সম্পর্কিত পুস্তকাবলীর অনুরূপ বই রোমান ও গ্রী
সাহিত্যে নেই। অতএব এ সব পুস্তক আমাদের কাছে সিয়ার ও জিহাদ সংক্রা
আরবী গ্রন্থাবলীর প্রতিধ্বনি বৈ আর কিছু নয়। রোমীয় ও আধুনিক যুগের মধ্যে
যোগসূত্র মুসলমানদের সেখানেই খুঁজতে হয়এবং আন্তর্জাতিক আইনের ধারনা
যুগান্তকারী পরিবর্তনের উৎস সেখানেই বলে স্বীকার করতে হয় এবং আন্তর্জাতি
আইনের বিশ্ব ইতিহাসের ভূমিকা এ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের নৈতিক ভিত্তি:

ইসলামী আইনের মূলনীতি, উৎস এবং লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা থেকে
প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী আইন নৈতিক মূল্যবোধের উপরে বেশি গুরু
আরোপ করেছে। প্রথম দিকে মুসলিম মনীষীরা কেবল ধর্মের বিধি-নিষেধ নিয়ে

গবেষণা করতেন কিন্তু যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁরা ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তবে সেগুলো সর্ব সঞ্চারী কোরআনকে কেন্দ্র করে এবং তার অধীনতা মেনে চলতো। কোরআনের উপর সমস্ত বিজ্ঞানের এ ভিত্তিই কবি, অন্যান্য মনীষী ও গবেষকদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করত, এক অনৈসলামী ভাবধারার বিস্তৃতির প্রতিরোধে।

আমাদের বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক আইনের ন্যায় আইনের শাখা সমূহ যখন স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে তখন তারা তাদের নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করে। এদের বিধানসমূহের জন্য কোরআন, সুন্নাহ্ বা সাহাবীদের কার্যপদ্ধতির অনুমোদনের প্রয়োজন হতো। অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তোয়াক্কা না করে মুসলমানরা শুধু বিষয়ের খাতিরে আলাদা ভাবে কোন বিজ্ঞান চর্চা করেনি। ইহকালে ও পরকালে মানুষের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সব কিছুকে শরীয়ার অধীন করা হয়েছে। তবে কোন কিছুকে অত্যধিক কঠিন করা হয়নি এবং একেবারে শিথিলও করা হয়নি। সুতরাং মধ্যম পন্থাই হচ্ছে ইসলামের বিধান অর্থাৎ মধ্যম পন্থাই উত্তম এবং এ নীতিটি মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ন্যায় একটি বস্তুবাদী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন সাধারণ আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান হতে বিচ্যুত হলেও মানবীয় স্বার্থে পরিচালিত হয়নি; বরং শাশ্বত কোরআন ও সুন্নাহ্ এর মৌলিক আদর্শের ভিত্তিকে অটুট রেখেছে। এটা সত্য যে ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা বিপথগামী; তথাপি পার্থিব ক্ষমতার শীর্ষকালে আন্তর্জাতিক আইনের পরম ধার্মিক মুসলমান মনীষীগণ এ সম্পর্কে বলেন, এ পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশায় মুসলিম এবং অমুসলিম সবাই সমান এবং সদৃশ। অন্যপক্ষে অমুসলিম এ অজুহাতে একজন আইন ও বিবেককে লঙ্ঘন করতে পারে না; তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হবার পর একজন কোন অবস্থাতে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে না। একের অপরাধে অন্যকে শাস্তিদান ইসলামে নিষিদ্ধ। এমন কি শত্রু আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দেয়ার বিধান রয়েছে। কোন আশ্রয় প্রার্থীকে প্রত্যাখান করা শরীয়ত ও নৈতিকতা সম্মত নয়। বস্তুত ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন কাঠামোর বেশীরভাগই অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে গঠিত; কারন এ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতারা ইসলামী বিশ্বকে একক সম্পূর্ণ বলে গণ্য করতেন। অমুসলিম ও অপর রাষ্ট্রের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে তা নির্ধারন করাই ছিল ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্য। ইসলামের নির্দেশ মুসলমানদের পার্থিব স্বার্থের পরিপন্থী হলেও পররাষ্ট্র ও যুদ্ধ দপ্তরসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এটাই কোরআনের শিক্ষা (নিসার ১৩৪নং আয়াতের তাফসীর

দ্রষ্টব্য) । আরো লক্ষ্যনীয় যে, ইসলামী আইন শাস্ত্রে আন্তর্জাতিক আইনকে এ
স্বতন্ত্র আইন হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব না দিলেও ত
ইসলামী আইনের অংশ হিসেবে আর্ন্তজাতিক আইনকে শাসকদের বা রা
নীতিবিদদের খেয়াল খুশীর উপর ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন ন
আন্তর্জাতিকআইনের এ আইনগত মর্যাদা শুধু বর্তমান নয় বরং বহু পূর্ব থেকে
স্বীকৃত ; কারণ প্রাচীন কালের আইন সংহিতা জায়েদ ইবনে আলী(মৃত্যু ১২০ হি
কর্তৃক রচিত 'আল মাজমু' গ্রন্থে আইনের অন্তর্ভূক্তি পরিলক্ষিত হয় এবং এর কে
পরিবর্তন হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ আদ দাব্বুসীর কথা উল্লেখ যোগ্য 'যেহেতু আল্ল
পার্থিব দুঃখ-দুর্দশার কারণ সমূহের ব্যাপারে আমাদের এবং তাদের (অমুসলি
মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি; কারণ এ পৃথিবীর কর্মফলের ক্ষেত্র নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

বলা হয়েছে যে,Ubi Societas, ibi jus অর্থাৎ উন্নত সম্প্রদায় সমূহের পরস্পরের সংস্পর্শে আসার কারণে আইনগত সম্পর্ক কেবল লিখিত বা অলিখিত চুক্তির মাধ্যমেই নয় বরং বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই গড়ে ওঠে, যাকে এক কথায় আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুনকে আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কেবল একটি মাত্র আন্তর্জাতিক আইন থাকতে হবে এমন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বস্তুত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক আইন একই সঙ্গে বলবৎ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইনের সংকলন নয়। অপর দিকে ইসলাম তার নিজস্ব সর্বজাতীয় আন্তর্জাতিক আইন গড়ে তুলেছে। এই আইন হল ইসলামী Corpus Juris এর অংশ ,তথা মুসলিম পৌর আইনের একটি অধ্যায়। ইসলাম ধর্মে যারা বিশ্বাসী এবং যারা এর আইন অনুযায়ী নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে চায় তাদের সবার উপর এ আইন প্রযোজ্য। ইসলামী আইন স্বর্গীয় উৎস হতে উৎসারিত এবং এ আইন সার্বজনীন ও শ্বাশত। তাই একে প্রকৃতির আইনও বলা হয়। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন পবিত্র কোরআনের ব্যাপক নৈতিক আদর্শ ও মহানবীর(সঃ) এর উত্তম আদর্শ আচরণের উপর ভিত্তি করে Positive Law এর রূপ লাভ করে এবং এ আইন শরীয়াহ্ আইনের অংশ হিসেবে একই উৎস হতে উৎপত্তি হয়েছে বলে একইভাবে আইনের অনুমোদন দ্বারা রক্ষিত হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনকে সিয়ার বলা হয়। এটি সিরাহ্ শব্দের বহু বচন যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জীবনী ও আচার-আচরণ। সিয়ারকে বিভিন্ন আইনবিদ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন: (১) ফতহুল কাদীর গ্রন্থে বলা হয়েছে : "সিয়ার হচ্ছে কাফিরদের সাথে হযরত মুহাম্মদ(সঃ) এর যুদ্ধের রীতি-নীতি বা পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি"।
(২) জামেউর রমুজ গ্রন্থে বলা হয়েছে "কাফির, বিদ্রোহী,আশ্রয়প্রার্থী, ও জিম্মিদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার্থে মুমিনগণ কর্তৃক অবলম্বিত পন্থা বা রীতিকে সিয়ার বুঝানো হয়"।

(৩) সিয়ার আল কাবীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় যে, "শত্রু এলাকার অধিবাসী মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মুস্তামিনিন(সাময়িক ভাবে বসবাসকারী বিদেশী অমুসলিমগণ) ও জিম্মিইন(স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী অমুসলিমগণ), স্বধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের সাথে বিশ্বাসীদের আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিধি-বিধানই হল ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন বা সিয়ার।

(৪) আধুনিক যুগের মুসলিম মনীষী ডঃ হামিদুল্লাহ্ বলেন ,"ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন হল দেশের আইন ও প্রথার অংশাবলী এবং সন্ধিসমুহ যা একটি বাস্তব অথবা বৈধ মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্র অপর কোন বাস্তব বা বৈধ রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রসমূহের সাথে সংযোগ রক্ষার্থে পালন করে থাকে"।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনরূপে যা গ্রহণ করে তা-ই ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন। প্রারম্ভেই একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন সর্বতো ও একান্তভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন। দেশের অন্য যে কোন ইসলামী আইনের ন্যায় ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের বৈধতা একইভাবে অর্জিত হয়। এমনকি দ্বিপাক্ষিক বা আর্ন্তজাতিক চুক্তি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতার বেলায়ও একই নীতি প্রযোজ্য। যদি এ সকল সন্ধি বা আরোপিত বাধ্যবাধকতা চুক্তিবদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত এবং কার্যকরী না হয় সে ক্ষেত্রে এসব পালনীয় নয়: এবং এগুলো অমান্য করা হলে কোনরূপ দায়িত্বের উদ্ভাবন হয় না। অবশ্য অনুমোদন উহ্য কি স্পষ্ট তাতে কিছু আসে যায় না। একথাও বলা যেতে পারে যে, দীর্ঘ মানব ইতিহাসে বিশ্বের সর্ব রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের আদর্শ ক্ষণকালের জন্য ও বাস্তবায়িত হয়নি।

ডঃ হামিদুল্লাহ্‌র দেয়া সংজ্ঞায় এ কথা স্বীকার করা হয়েছে যে, কেবল দেশের আইন ও প্রথা নয়, এমনকি চুক্তি ও মুসলিম রাষ্ট্রের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। কারণ আর্ন্তজাতিক আইন কাঠামোয় এ বিশেষ সংযোজনটির স্থায়িত্বকাল রাষ্ট্র স্বার্থের উপর নির্ভরশীল। কোন চুক্তির শর্তাবলী অবমাননাকর হওয়া সত্ত্বে ও মুসলিম সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত কল্যানের কথা বিবেচনা করে তা যে, গ্রহণযোগ্য হতে পারে ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সংজ্ঞায় উল্লেখিত অনান্য বাস্তব ও বৈধ রাষ্ট্রের সাথে সংযোগ রক্ষার্থে কথাগুলোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এ কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বলে বিবেচিত হবে সে সব আইন যা একটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম আইনের অনুসরন করে। এ সব

অন্যান্য রাষ্ট্র মুসলিম বা অমুসলিম রাষ্ট্র হতে পারে। অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম অধিবাসী সংক্রান্ত অথবা মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত অমুসলিম আইন ও রীতি-নীতিই ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের আলোচ্য বিষয়।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি

এ আইনের প্রকৃতিকে দুটি দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করা যায়। যেমন:

(১) শরীয়াহ্ আইনের অংশস্বরূপ: ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন শরীয়াহ্ আইনের একটি অংশ। যেহেতু শরীয়াহ্ আইন ঐশ্বরিক সেহেতু সিয়ার ও ঐশ্বরিক আইন। আল্লাহ্ পাক কর্তৃক প্রেরিত কোরআন এবং নবী করিম (সঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত সুন্নাহ্ এর আলোকে মানব জীবন পরিচালনার জন্য যে আইন ব্যবস্থা রয়েছে তার একটি অংশ হল সিয়ার। সুতরাং সিয়ারও কোরআন ও সুন্নাহ্ আলোকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিষয়ক নীতিমালা নির্ধারণের একটি ঐশী ব্যবস্থা।

(২) মানব রচিত আইনের পরিপন্থী : আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের মত সিয়ার মানবরচিত আইন নয়। ধর্মতত্ত্ববিদগণ যেমনি ইসলাম বলতে লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ এর প্রতি বিশ্বাস এর অনুশীলনকে বুঝিয়ে থাকেন, তেমনি সিয়ারের ভিত্তিও উক্ত কালেমায় বিশ্বাস এর উপর নির্ভরশীল। এককথায় রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ডের ভিত্তি হল আল্লাহর আদেশ: যা হযরত মুহাম্মদ(সঃ) এর নিকট প্রেরিত হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায় যে, মুসলিম আইনবিদগণ আইনের যে ব্যাখ্যা দেন তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট হতে ফেরেস্তা মারফত হযরত মুহাম্মদ(সঃ) এর নিকট যে ঐশী বাণী বা নির্দেশ পৌছেছে তারই ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ আইন সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কারণ হচ্ছে পরকালে জবাবদিহিতা ও বিচারের ভয়। শরীয়াহ্ আইন ভাল কি মন্দ তা নির্ধারণের মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্। অতএব, আল্লাহ্‌র বিধানাবলী প্রতিপালনে মানুষের পছন্দ-অপছন্দের কোন অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হল "তোমাদের নিকট আমার রাসুল যা নিয়ে এসেছেন তা নিঃসংকোচে গ্রহণ কর এবং যা হতে তিনি তোমাদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তা পরিহার করে চল" (সুরা হাশর -৭)।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়

বিষয় বলতে মুসলিম আইনবেত্তাগণ এমন একটি বস্তুকে বুঝাতে চান যার মূল ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনার আওতাধীন। তাই আন্তর্জাতিক আইনের

বিষয় বলতে সে সব পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝান হয়েছে যাদের ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য। এর আওতাভুক্ত বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

ক. স্বাধীন রাষ্ট্র: প্রত্যেকটি স্বাধীন রাষ্ট্র যার অন্য রাষ্ট্রের সাথে কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে।

খ. সার্বভৌম রাষ্ট্র : যে রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতা আছে। এ সার্বভৌম আংশিক হতে পারে: পুরাপুরি ও হতে পারে।

গ. বিদ্রোহী : যুদ্ধ মনোভাবাপন্ন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠি যারা প্রতিরোধবলে রাজ্য বা রাজ্যের কোন অঞ্চল দখল করে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করছে বা করতে চায়।

ঘ. ইসলামী রাষ্ট্রের বিদেশী বাসিন্দা: এ সব লোক কূটনৈতিক প্রতিনিধি বা ব্যবসায়িক প্রতিনিধি বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আগত লোক হতে পারে। এদেরকে আইনের ভাষায় মুসতামিনিন বলা হয়।

ঙ. প্রবাসী মুসলিম নাগরিক: কূটনীতি, ব্যবসা, বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যে সকল মুসলিম নাগরিক অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করছে।

চ. স্বধর্ম ত্যাগী: যারা নিজ ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্নউপায় ফিৎনা ফাসাদ করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

ছ. যিম্মি: ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী ও সুবিধাপ্রাপ্ত অমুসলিম নাগরিক। এ ছাড়াও মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনে কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে যদিও এসব বিষয়ের কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়নি। ১৯১৯ সালে মুসলিম রাষ্ট্রসমুহ জাতিপুঞ্জে যোগদান করে এবং পরবর্তী কালে এর উত্তরসূরী জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বিচারালয়, বৃটিশ কমন ওয়েলথ ও ফরাসী কমিউনিটির সদস্যপদ লাভ করে। এর ফলে প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই তার সার্বভৌম ক্ষমতার কিছু কেবল এসব প্রতিষ্ঠানের কাছেই অর্পণ করতে হয় নি বরং রাষ্ট্রদূত ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তি বিশেষ ও কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়েছে। উপরন্তু আরব রাষ্ট্রপুঞ্জ ও বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে এবং এর পর্যবেক্ষকগণ সরকারী জাতিসংঘে প্রবেশাধিকার পায়।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যদিও ইসলাম পার্থিব জীবনকে অনিত্য ও পরকালের মঙ্গল আহরনের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করে এবং যেহেতু মুসলিম আইনের জ্ঞানের উদ্দেশ্য বলতে চিরন্তন পরকালের মঙ্গলের উপর জোর দেয়া হয়েছে -তথাপি ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় বৈরাগ্যকে স্বীকার করেনি বরং ইহজীবনের সুখ-সাচ্ছন্দ্যকে ভোগ

করার নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোরআন পাকে বলা হয়েছে যে, "এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের ইহকালে কল্যান দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নি-যন্ত্রনা হতে রক্ষা কর। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহার প্রাপ্য অংশ তাহাদেরই। বস্তুত আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর" (সুরা বাকারাহ- ২০০-২০২)।

আল্লাহ্ পাক এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, "আল্লাহ্ পারলৌকিক গৃহের যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন তুমি তাহাতে কল্যান অন্বেষণ করিতে থাক ও সংসারের আপন অংশ ভুলিও না এবং আল্লাহ্ তোমার প্রতি যেমন হিত সাধন করিয়াছেন তুমিও তদ্রূপ হিত সাধন কর" (সুরা কাসাস-৭৭)।

আল্লাহ্ পুনরায় বলেন, "বল আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য যে সব শোভার বস্ত্র ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে নিষিদ্ধ করিয়াছে ? বল, এই সমস্ত তাহাদের জন্য যাহারা পার্থিব জীবনে বিশেষ করিয়া কিয়ামতের দিনকে বিশ্বাস করে। এই রূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি" (সুরা আরাফ-৩২)।

এ দ্বারা বুঝা যায় সংসারের প্রতি অনিহা ইসলাম সম্মত নয়। পার্থিব ভোগবিলাসের ক্ষেত্রে ইসলাম যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তাহলো আইনের গণ্ডির মধ্যে থাকা এবং অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। ওয়াদা রক্ষা করা এবং চুক্তির শর্তাবলী সততার সাথে পূরণ করার জন্য কোরআনের বারবার তাগিদ এসেছে। যেমন: "অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"(বনী ইসরাঈল-৩৪): "যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহেজগার হবে, অবশ্যই আল্লাহ পরহেজগারদের ভালবাসেন।"(আল-ইমরান-৭৬): "অতএব তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুণ আমি তাহাদের উপরে অভিসম্পাত করিয়াছি এবং তাহাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি।" (আল-মায়েদাহ্-১৩)। নবী করিম (সঃ)-এর ভাষায় "মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলে।" (সারাখসী: সিয়ার আল-কবির) কিন্তু তাই সব নয়। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্য অবিরাম সংগ্রামের নির্দেশ দেয়। যেহেতু ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি ইসলাম পছন্দ করে না এবং ধর্ম পরায়নতা ও বদণ্যতার ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে সহযোগিতার ব্যাপারে শরীয়াহ মুসলমানদের উপরে দায়িত্ব অর্পণ করেছে সেহেতু শান্তিপূর্ণ ভাবে ইসলাম প্রচারই মুসলমানদের প্রধান কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "মসজিদুল হারামে বাধা দেয়ার জন্য কোন সম্প্রদায়ের

প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পরে সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অপরের সাহায্য করিবে না। আল্লাহকে ভয় করিবে; আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর" (সুরা আল-মায়েদাহ্-২.)। বলা বাহুল্য যে, বিশ্ববাসীর পার্থিব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গোটা ইসলামী আইন কাঠামোর বিন্যাস করা হয়েছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য যাই হোক এর আশু উদ্দেশ্য ব্যক্তি বিশেষের সদুপায়ে জীবন যাপনের যোগ্যতা বিধান করা। Mutatis Mutandis এর আলোকে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের লক্ষ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের যথাসম্ভব সর্বাধিক ন্যায়াচরণ করা।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন ও সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের পার্থক্য

বিভিন্ন কারণে এ দুটি আইনের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

ক. সংজ্ঞাগত পার্থক্য: সাধারণ আন্তর্জাতিক আইন হল কতগুলো রীতি-নীতির সমাহার যা স্বাধীন রাষ্ট্রসমুহের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে। অপরদিকে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন হল ইসলামী রাষ্ট্রীয় আইনের একটি অংশ এবং চুক্তির বাধ্যবাধকতা যা ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইনরূপে গৃহীত হয়।

খ. সার্বভৌম ক্ষমতার ক্ষেত্রে: সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনকে গ্রহণ করা বা (Ratification- এর মাধ্যমে) না করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। পক্ষান্তরে সীয়ারের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। ইসলামী প্রশাসন জনগণের কল্যাণের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে মাত্র।

গ. উৎসগত পার্থক্য: সাধারণ আন্তর্জাতিক মৌলিক আইনের উৎস হল প্রথা, চুক্তি, সংরক্ষিত দলিল দস্তা-বেজ ও বিভিন্ন মনীষীদের লেখা পুস্তকাদি। অপরদিকে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক উৎস হচ্ছে পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও শরীয়াহ দ্বারা স্বীকৃত কিছু প্রথা ও চুক্তি তাই সাধারণ আন্তর্জাতিক আইন সহজেই পরিবর্তনীয় (কারণ মানব রচিত) কিন্তু ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক দিকগুলো পরিবর্তনীয় নয় (কারণ স্বর্গীয়)।

ঘ. নৈতিক দিক: সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে নৈতিকতাকে গুরুত্ব কম দেয়া হয়েছে। মিথ্যা, শঠতা, ও চুক্তি ভঙ্গের দৃষ্টান্ত বেশী করে স্থান করে নিয়েছে এ আইনে। বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিতে প্রায়শই এর বহু প্রমাণ সৃষ্টি হচ্ছে। অপর দিকে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে নৈতিকতাকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ইসলামী আইনে মিথ্যা,শঠতা ও প্রতারনার কোন স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি প্রতারনার আশ্রয় নেয় সে আমার উম্মত নয়।"

ঙ. সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব শান্তি ও কল্যান অর্জন করা এবং এ লক্ষ্যে বিরাজমান বিধানাবলী মানার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমুহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা করা। পক্ষান্তরে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উভয় জগতের কল্যাণ কামনার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। এ ছাড়াও এ আইন পালন করার আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে পরকালে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতা ও বিচারের ভয়।

চ. উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন : সাধারণ আন্তর্জাতিক আইন চারশত বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে বলে পশ্চিমা আইনবিদগণ দাবী করেন। তাদের মতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রথা ও রীতি-নীতি এ আইনের বিরাট অংশ দখল করে আছে। সে যুগের আইন বিজ্ঞানীদের লিখিত বই পুস্তক এর অন্যতম উৎস বলে গণ্য। কিন্তু ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের বিধানাবলী আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত বিধায় তা নবী করিম(সঃ) ৭ম শতাব্দীতে মানুষের নিকট পরিপূর্নভাবে নিয়ে এসেছেন এবং ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে এ আইনের ব্যাপক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। মধ্যযুগে প্রায় অর্ধ পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের প্রভাব তৎকালীন ইউরোপীয় সভ্যতাসহ অন্যান্য জাতির উপর বিস্তার লাভ করে এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের বিধানাবলীর ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শরীয়তের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রচলন হয়ে আসছে। এই ব্যবস্থা কখনো ছোট, কখনো বড়, বা কখনো নগর কেন্দ্রিক ছিলো। আবার ক কল্যাণমূলক, কখনো নিপীড়নমূলক বা কখনো একনায়কতান্ত্রিক ছি অধিকাংশ সময় ঐসব রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানুষের মনগড়া মতবাদ বা ব্যক্তিগত ই দ্বারা পরিচালিত হতো। ধর্মের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হ তবে কম, কারণ তখন ধর্ম দর্শন ভিন্ন রকম ছিলো। কিন্তু ইসলাম গতানুগতিক ধর্ম দর্শন নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় নাই। ইসলাম হচ্ছে এ সর্বব্যাপি জীবন ব্যবস্থা। এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক চেতনা আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার এক উত্তম নীল নক্সা। তাই রাসুল (সাঃ) জীবদ্দশায় ঐ নীল নক্সা বাস্তবায়িত হয় এবং সৃষ্টি হয় একটি সম্পূর্ণ আ রাষ্ট্র ব্যবস্থা(ইসলামী রাষ্ট্র)। আর এর বিপরীতে থাকে মানুষের মনগড়া মত বা অন্যান্য ধর্ম বা লোকের ইতচ্ছা দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এভাবে পৃথি দুই ধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে এই দুই ধরণের ব্যবস্থার ম আর একটি ব্যবস্থা দেখা দেয় যা চুক্তির মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ বা নিরপেক্ষ থা চায়। তাই মুসলিম মনীষীরা রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিক থেকে পৃথিবীকে তিন ভাগে করেছেন। যেমন:

ক. ইসলামী রাষ্ট্র (দারুল ইসলাম)
খ. অমুসলিম রাষ্ট্র (দারুল হারব)
গ. চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র (দারুল আমান/আহাদ)

ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা:

মুসলিম রাষ্ট্র বিজ্ঞানী বা মনীষীরা ইসলামী রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্নরূপে সং দিয়েছেন। যেমন:

১. আল্লামা সারাখসী ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: "ইসলামী র এমন একটি স্থানের নাম যা মুসলমানদের শাসনাধীন থাকবে এবং বাহ্যিক নিদ হচ্ছে সেখানে মুসলমানদের জন্য থাকবে পূর্ণ নিরাপত্তা।"

২. 'আব্দুল ওহাব খাল্লাফ বলেন: "ইসলামী রাষ্ট্র এমন একটি রাষ্ট্র যেখা ইসলামী হুকুম আহ্কাম জারি থাকবে এবং শাসক মণ্ডলী মুসলমান এবং জীম্মিদে

(অমুসলমান) সবকিছুর নিরাপত্তা বিধান করবে।"

৩. আবু জোহরা বলেন: "ইসলামী রাষ্ট্র এমন একটি রাষ্ট্র যা মুসলমানরা শাসন করবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সকল শক্তি ও চাবিকাঠি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।"

৪. অন্যান্য যে রাষ্ট্রে অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং সেখানে ইসলামী হুকুম আহ্কাম বাস্তবায়িত হয় তার নাম ইসলামী রাষ্ট্র।

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে ইসলামী রাষ্ট্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা:

- ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসীরা হবে মুসলমান।
- ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানরাও বসবাস করতে পারবে।
- ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার মূলশক্তি মুসলমানদের কাছে থাকবে।
- ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমান অথবা অমুসলমানদেরকে (জীম্মি) ইসলামী রাষ্ট্র পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করবে।
- ইসলামী রাষ্ট্রে সকল ক্ষেত্রে ইসলামী হুকুম-আহ্কাম অথবা আইন-কানুন বাস্তবায়িত হবে।

উপরের সংজ্ঞাগুলো আরো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন মনীষীদের দেওয়া সংজ্ঞার মধ্যে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। তাঁরা সবাই একবাক্যে একটি মাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলেছেন যেখানে ইসলামী হুকুম আহ্কাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁদের এ সংজ্ঞা থেকে আমরা আরো পাই যে, যদি কোন এলাকার মুসলমানরা বিরোধীতা করে তবে তাদের জন্য পৃথক প্রদেশ সৃষ্টি করে পৃথক শাসক নিয়োগ করা যেতে পারে এ শর্তে যে সেখানে শরিয়তের বিধান মোতাবেক সবকিছু পরিচালিত হবে। কেননা শরিয়তের আসল বা মূল কাঠামো বদল হয়না অর্থাৎ পুরাটাই ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে থাকবে। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র এক বা একাধিক থাকতে পারে তাতে শরীয়তের কোন নিষেধ নেই এবং অধিবাসীরা (মুসলমান, অমুসলমান, জীম্মি) নিজেদের স্বাধীনমত স্থানে বসবাস করতে পারবে। এ সব রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকবে একে অপরের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসবে। বর্তমান যুগে এ পদ্ধতিকে Confederation বলা হয়ে থাকে।

মোট কথা আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বুনিয়াদে কোরআন ও সুন্নাকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে যে ভূ-খণ্ডের জনগণ

আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন বিধান মেনে চলে এবং সেখানে আল্লাহ বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে খিলাফতের ধারণার ভিত্তিতে জনগণের নির্বাচি প্রতিনিধি ও তার সরকার ব্যবস্থাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। তবে একটি নির্দি ভূখণ্ড ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তি। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃত পা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ইসলামী বিশ্বজনীন আদর্শ ভি ইসলামী আদর্শের বুনিয়াদে বিশ্বজনীন আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শরিয়তে লক্ষ্য।

...মী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য:

কোন রাষ্ট্রের পরিচালকগণ কর্তৃক রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষ করলেই ইসলামী রাষ্ট্র হয়না। ইসলামী রাষ্ট্র হতে হলে কতগুলো বৈশিষ্টা বা শ পূরণ করতে হয়।

খোদায়ী সার্বভৌমত্ব: ইসলামী রাষ্ট্র বুনিয়াদীভাবে আল্লাহ সার্বভৌমত্বকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেনে নেবে। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বা প্রতিনিধিদেরকে বা জনগণকে সার্বভৌম ও নিরংকু শক্তি হিসেবে গ্রহণ করবে না। এ শক্তি একমাত্র আল্লাহর। এ ব্যাপারে আল্ল বলেন, "আল্লাহ সেই মহান সত্ত্বা যিনি ছাড়া আর কোন সার্বভৌম শক্তি নেই তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তিনি একম সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আসমান ও জমিনের একমাত্র মালিক তিনি " বাকারাহ্--২৫৫)।

রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য : পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মতবাদের সঙ্গে ইসলামে কোন মিল নেই। অনইসলামী রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্যর দিক দিয়ে মানুষের ইচ্ছাকে প্ করে থাকে। ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মর্জিকে কার্যকরী করার জন্য জন্মলাভ করে অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের নির্বাচিত বা মনোনীত প্রতিনিধিদের মাধ্যে জনগণের উপর আল্লাহর মর্জিকে প্রতিষ্ঠিত করাকে তার উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষ করে। আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণকর জীবনাদর্শকে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষে কার্যকরী করাই হলো ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পবিত্র আ কোরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে- "যে মুমিনদের মধ্যে যাদের হাতে রা ক্ষমতা আসবে তারা আল্লাহর জমিনে নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদা করবে, আল্লাহর পছন্দনীয় ও মানুষের জন্য 'মারুফ'-(উত্তম কথা ও কাজ) কে কায়েম করবে। আর আল্লাহর অপছন্দনীয় ও মানুষের জন্য ধ্বংসকর মুনক মুলোৎপাটন করবে।"

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা: ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা একনায়কত্বে বিশ্বাস করেনা। ইসলাম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, মুমিনদের কার্য পরিচালিত হবে পরামর্শের ভিত্তিতে। যেমন আল্লাহ বলেন, "Who conduct theirs affairs by mutual consultation" (আশ-শূরা ৩৮)। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উড়ে এসে জুড়ে বসে জনগণের নেতা সাজার অধিকার কারও নেই। রাসূল (সাঃ)-এর সবকিছু জানা সত্ত্বেও তার পরে কে খলিফা হবেন তা নিযুক্ত করে যান নি। সবকিছু হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শূরা (পরামর্শ) মূলক ব্যবস্থা লংঘন করে জবর দস্তিমূলকভাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে সে নিশ্চয় হত্যাযোগ্য অপরাধ করেছে।"

আইনের শাসন: ইসলামী রাষ্ট্র শুধু মুখে মুখে আইনের শাসনের কথা প্রচার করেনা। বাস্তব ক্ষেত্রে ইনসাফমূলক খোদায়ী আইনের শাসন প্রবর্তন করে। আইনের চোখে সকলকে সমান অধিকার দান করে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি আদালতে অভিযোগের পথ উম্মুক্ত থাকে। শাসনতন্ত্রের সংগে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তথাকথিত প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার মতো শাসন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হয়না।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা: শাসন ব্যবস্থা থেকে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখতে হবে। শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করার, তাকে প্রভাবান্বিত করার বা তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করার কোন অধিকার ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নেই। তবে শাসন ও বিচার বিভাগ উভয়কে আল্লাহর দেয়া সীমার মধ্যে থাকতে হবে।

সরকার প্রধানের বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে: শরীয়াহ্ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান বা প্রধান নির্বাহীর জন্য কতগুলি বিশেষ গুণাবলীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। যথা-

ক. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান বা প্রতিনিধিকে মুসলমান হতে হবে।
খ. তাকে পুরুষ হতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ "যে জাতি কোন স্ত্রীলোকের উপর নের্তৃত্ব অর্পণকরে সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না।"
গ. তাকে বয়োঃপ্রাপ্ত ও সুস্থ বিবেক সম্পুন্ন হতে হবে।
ঘ. রাষ্ট্র প্রধানকে ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
ঙ. তাকে পরহেজগার ও খোদাভীরু হতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন: "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেজগার ব্যক্তিই আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক সম্মানীয়" (হুজরাত-১৩)।

চ. আমানতদার ও আস্থাভাজন হতে হবে।
ছ. জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও ধৈর্যশীল হতে হবে।
জ. মন কখনো আল্লাহর স্মরণশূণা হবে না।
ঝ. তিনি বিদায়াতী হবেন না।
ঞ. পদলোভী বা মনোনয়ন প্রার্থী হতে পারবেন না।

৭. ব্যক্তি স্বাধীনতা: ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনত
মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার সুষ্ঠুভাবে নির্ধারিত। ব্যক্তির স্বাতন্ত্রকে ইসলামী রা
কখনো অস্বীকার করেনা বরং ব্যক্তি সেখানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাবতীয় অধিকা
ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। প্রতিটি ব্যক্তি অবাধে স্বীয় যোগ্যতা দক্ষ
ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী অবাধে কাজ করতে পারে। ব্যক্তির এই অধিকার
হস্তক্ষেপ করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার নিরূপণের অধিক
সম্পূর্ণভাবেই ইসলামী রাষ্ট্রের। ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের জানমাল রক্ষা
অধিকার, ধর্ম কৃষ্টি রক্ষার অধিকার জীবন যাত্রার মৌলিক প্রয়োজনে সাহায্যলাভে
অধিকার প্রভৃতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রদান করে থাকে।

৮. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা: ইসলাম পূঁজিবাদী অর্থ ও অবৈধ আয়ে
যাবতীয় পথকে বন্ধ করে দিয়ে এক আদর্শ অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলে মানুষে মানু
আকাশচুম্বী বৈষম্যের অবসান ঘটায়। প্রতিটি নাগরিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তালাভে
সমর্থ হয়। মুসলিম অমুসলিম সবার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র অর্থনৈতিক নিরাপ
নিশ্চিত করবে। সেখানে জীবন বীমা করার প্রয়োজন নেই। বেকার, পঙ্গু, অক্ষ
ও বৃদ্ধলোকের জন্য রয়েছে রাষ্ট্রীয় ভাতার ব্যবস্থা। এ ছাড়াও ইসলামী রা
যেহেতু অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের কোন সুযোগ নাই সেহেতু প্রতিটি লো
স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী করে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতি
নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করবে।

৯. অমুসলিমদের অধিকার: ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের অধিকা
সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অন্য ধর্ম ব্যবস্থায় বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা
সংখ্যালঘুদের জন্য এরূপ অধিকার রাখা হয়নি। (এ সম্পর্কে ষষ্ঠদশ অধ্যা
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

অমুসলিম রাষ্ট্রের সংজ্ঞা:

মুসলিম মনীষীগণ অমুসলিম রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন দুইটি দৃষ্টিকোন থেকে
যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: অমুসলিম রাষ্ট্র (দারুল হারব)-এর কোন শাসন ব্যবস্থা ও চালিকা শক্তি কোন মুসলিম শাসকের হাতে থাকে না এবং তাদের ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী কোন চুক্তি থাকে না। এ থেকে বুঝা যায় সম্পর্ক স্থাপন কারী কোন চুক্তির অবর্তমানই মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রধান অন্তরায়; এবং এই কারণে মুসলিম রাষ্ট্র ও অমুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে একটি শত্রুতা সব সময় বিরাজ করে। আর মুসলমানদেরকে সব সময় শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: শাসন ক্ষমতা অমুসলমানদের হাতে থাকলেই কোন রাষ্ট্র অমুসলিম রাষ্ট্র হয় না। তবে এজন্য দুটি শর্ত পালনীয় রয়েছে।

ক. সেখানে কোন মুসলমান শাসক থাকবে না এবং শরীয়ত (ইসলামী আইন-কানুন) বাস্তবায়ন বা প্রয়োগের কোন সুযোগ বা কর্তৃত্ব থাকে না।

খ. সেখানে ইসলামী নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে কোন মুসলমান অথবা অমুসলমান (জিম্মী ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ অমুসলমান) বসবাস করেনা। উদাহরণ স্বরূপ পূর্বে কোন মুসলিম রাষ্ট্র ছিল এবং সেখানে মুসলমানরা ও জিম্মীরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বসবাস করছে কিন্তু যুদ্ধ অথবা অন্য কোন কারণে সেখানে আর ইসলামী রাষ্ট্র নেই অর্থাৎ অমুসলমান বা কাফেরের হস্তগত হয়েছে এবং কাফের সরকার মুসলমানদের ও কখনো কখনো জিম্মীদের জোরকরে বের করে দিয়েছে। যেমন: স্পেন বা ভারত অথবা পূর্ব থেকে সেখানে অমুসলমানরা বসবাস করে আসছে এবং নিজেরাই শাসন কার্য পরিচালনা করছে। মুসলমানরা সেখানে প্রবেশ করেনি (কর্তৃত্ব নিয়ে) এমন রাষ্ট্রকে অনইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। যেমন: রাশিয়া, চীন, বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি।

অন্যান্য মনীষী:

ক. আব্দুল ওহাব খাল্লাফ বলেন, "এটা এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে কোন ইসলামী হুকুম আহ্কাম জারী নেই এবং সেখানে কোন মুসলমানের নিরাপত্তা নেই।"

খ. ডঃ ওহাব আজ-জোহাইলী বলেন, "এটা এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানদের কোন কর্তৃত্ব থাকেনা এবং প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বাহিক দিকগুলো বাস্তবায়ন করা যায়না।"

চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র:

মুসলিম মনীষীরা বিভিন্নভাবে দারুল আহদ বা চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

দিয়েছেন। আবু হানিফা (রঃ) ও তাঁর অনুসারীরা বলেন, "সাধারণত এম্ব চুক্তিবদ্ধ দেশ ইসলামী দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা মুসলমানরা শা ও ক্ষমতার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত কোন দেশ বা সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তিবদ্ধে কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে না।" অর্থাৎ মুসলমানরা শক্তিশালী হলে অন্য জাতি এসে আশ্রয় ও নিরাপত্তা স্বরূপ চুক্তির প্রস্তাব দিবে। তখন মুসলমানরা ইসলামে উদারতা প্রদর্শন করে তাদের উপরে শক্তি প্রয়োগ না করে তাদের চুক্তির প্রস্তা রাজী হয়ে কৌশলে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন নিয়ে আসবে।

মাওয়ারদী বলেন: "চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র এখা মুসলমানরা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করেনি বরং চুক্তির মাধ্যমে জয় করেছে। কয়েকজন আলেম অন্যভাবে বলেছেন যে, "চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র (অমুসলিম রাষ্ট্র শুধুমাত্র শান্তি ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত না হওয়ার জন্য চুক্তিব হয়েছে।" বর্তমানে দারুল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) ও দারুল আহদ (চুক্তিব রাষ্ট্র) এর সাথে ইউরোপীয় বা অন্যান্য এলাকার রাষ্ট্র সমূহের সম্পর্ক বিশ্লেষ করলে বিরাট ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

ক. মুসলিম রাষ্ট্র অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে যখন মুসলমানদে হাতে শক্তি ও ক্ষমতা থাকে। মুসলমানদের কাছে ক্ষমতা থাকার কারণে অমুসলি রাষ্ট্র বা অন্য কোন রাষ্ট্র আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হ কিন্তু বর্তমানে এই প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরিত হচেছ অথবা মুসলমান রাষ্ট্র সমূ আমেরিকা বা ইউরোপীয় রাষ্ট্র বা অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে মাথানত করছে এব নিরাপত্তার জন্য তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচেছ। কেননা তারাই আজকে সম ক্ষমতার অধিকারী আর মুসলমানরা বিদ্যাবুদ্ধি ও অস্ত্রশস্ত্র সর্বদিকে দুর্বলতা পরিচয় দিচ্ছে।

খ. মুসলমানরা যদি মনে করে যে, চুক্তিবদ্ধ দেশের পক্ষথেকে খিয়ান বা বিশ্বাস ঘাতকতার সৃষ্টি হতে পারে তখন তারা (মুসলমানরা) চুক্তি ভঙ্গে কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু এখানেও উল্টো পরিলক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ বর্তমানের শক্তিশালী দেশগুলো মুসলিম দেশগুলোর সাথে প্রহসনমূলক চুক্তি করে মুসলিম দেশগুলোকে শোষণ করছে এবং মাঝে মাঝে নিজেরা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিম দেশগুলোকে পদানত করছে বা করার চে করছে। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা জাতিসংঘের অধীনে সক দেশ চুক্তিবদ্ধ এই অজুহাত দেখিয়ে শুধুমাত্র মুসলমান দেশগুলোকে শোষ করছে। তাদের উপর বছরের পর বছর অবরোধ আরোপ, অত্যাচার, নরহত্যাস

বিভিন্ন অপকর্ম করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের অধীনে সকলদেশ চুক্তিবদ্ধ বিধায় সকল দেশের চুক্তিকে সমভাবে সম্মান করা ও একে অপরের সহযোগীতায় প্রতিটি দেশের নিরপেক্ষতা নিয়ে এগিয়ে আসা এবং সকলের জন্য একটি মাত্র আইন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় বাস্তবে এর উল্টো পরিলক্ষিত হচ্ছে।

শ্রেণী বিন্যাসের ফলাফল:

১. শক্তি ও ক্ষমতা: ইসলামী রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও শত্রুদের থেকে দেশকে রক্ষা করার (প্রতিরক্ষা) শক্তি মুসলমানদের হাতে থাকবে। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে শাসক সকল হুকুম আহ্‌কাম জারী করবেন। কেননা জিহাদ মুসলমানদের উপর ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া (প্রয়োজন মোতাবেক)। শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা ও শরীয়তের হুকুম আহ্‌কাম প্রতিষ্ঠা করা শাসকের দায়িত্ব। এ ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমান অমুসলমানদের (জিম্মী) জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করবে।

অপরদিকে অমুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষমতা থাকে অমুসলমানদের হাতে। সেখানে তারা ইসলামী হুকুম আহ্‌কাম পালন করার (ব্যক্তিগতভাবেও) সুযোগ বা অধিকার থাকে না অধিকন্তু বিভিন্ন ধরণের শোষণ নিপীড়ন ও অত্যাচার চালানো হয়। চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রে মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা না থাকলেও চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রটি চুক্তির কারণে মুসলিম রাষ্ট্রকে সম্মান দিয়ে থাকে। আর চুক্তি (শান্তি চুক্তি) মুসলমানদের জন্য ভালো যদি মুসলমানরা ক্ষমতার অধিকারী না হয়।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক পরিপূর্ণভাবে শরীয়ত বাস্তবায়ন করবেন। তিনি বা তাঁর কর্মচারীবৃন্দ বাস্তবায়ন না করলে গুনাহগার হবেন এবং তাদেরকে কোরআনে ফাসেক, জালেম ও কাফের বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন, "যারা আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ ওহী (শরীয়ত) অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেনা তারা ফাসেক" (আল-মায়েদাঃ ৪৬)। "যারা আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ ওহী (শরীয়ত) অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেনা তারা যালেম" (আল-মায়েদাঃ ৪৭)। " যারা আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ ওহী (শরীয়ত) অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেনা তারা কাফের" (আল-মায়েদাঃ ৪৮)। এভাবে পরপর তিনটি আয়াত রয়েছে।

ইসলামী সমাজ থেকে প্রতিটি অন্যায় অসত্য অপকর্ম ও অশ্লীলতাকে উৎখাত করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরাই উত্তম জাতি তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে ভাল কাজের আদেশ

দেয়া ও অন্যায় কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখা ও অপরদেরকে অন্যায়
থেকে বিরত থাকতে বলার জন্য" (আল-ইমরানঃ ১১০)। আর অমুসলিম
তাদের নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস ও খেয়াল খুশী মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

অপরদিকে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র ধর্মীয় ও অন্যান্য দিকে স্বাধীনতা ভোগ
থাকে। তবে দেখা গেছে যে চুক্তিবদ্ধ দেশ শক্তিশালী দেশের নির্দেশ পালন
থাকে।

৩. ইসলামী রাষ্ট্র সর্বত্রই ইসলামের (বাহ্যিক দিক সহ) সকল
আহ্কাম প্রতিষ্ঠা করার (ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত)
করবে। অপরদিকে অমুসলিম রাষ্ট্র ইসলামী হুকুম আহ্কাম বাস্তবায়নে
করে এবং মুসলমানদের উপর জুলুম নিপীড়ন চালায়। যদিও বর্ত
জাতিসংঘের মানবাধিকার Convention মোতাবেক প্রতিটি দেশে
স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে ঐ কথাটি শুধু মুসলিম
অমুসলমানরা ভোগকরে এবং অমুসলিম দেশে মুসলমানরা (অনেক
ব্যক্তিগত ভাবেও) ভোগ করতে পারেনা। উদাহরণ স্বরূপ- ভারত,
যুক্তরাজ্য, চীন প্রভৃতি।

আঞ্চলিক সমুদ্র ও গভীর/উন্মুক্ত সমুদ্রে ইসলামী রাষ্ট্রের এখতিয়ার:

আঞ্চলিক সমুদ্র বা Territorial Sea বলতে উপকূলবর্তী রাষ্ট্র
সমুদ্রের দিকে ধাবিত ৩-১২ মাইল পর্যন্ত ব্যাপ্ত জলরাশিকে বুঝায়। আঞ্চ
সমুদ্র বিষয়ক আইনটি ১৯৬৪ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ৮৫টি রাষ্ট্র কর্তৃক সা
ঐকামতের দ্বারা অনুসমর্থনের মাধ্যমে জেনেভা সম্মেলনে গৃহীত
জাতিসংঘের সনদের ১নং অনুচ্ছেদে আঞ্চলিক সমুদ্রের সাধারণ বিধান স
বলা হয়েছে যে, "সব রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্থলভাগ এবং অভ্যন্তরীন জল
বাইরে 'আঞ্চলিক সমুদ্র' বলে অভিহিত এক সমুদ্র বেষ্টনী পর্যন্ত বিস্তৃত।

আন্তর্জাতিক আইনের আঞ্চলিক সমুদ্রে উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলি নিজ
সব সম্পদ ও জনগোষ্ঠীর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করার বিশেষ অধি
১৯৬৪ সনের সমুদ্র ও সংলগ্ন বিষয়ক কনভেনশনের ১৪, ১৫ ও ১৬ অনু
আঞ্চলিক সমুদ্রের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে
নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে।

১৪(১) অনুচেছদে বিধৃত আছে যে, উপকূলীয় রাষ্ট্র হোক বা না
সব রাষ্ট্রের জাহাজের আঞ্চলিক সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নির্দোষ অতিক্রমনের অ
থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না অতিক্রমন উপকূলীয় রাষ্ট্রের শান্তি, শৃংখলা

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হবে, ততক্ষণ পর্যন্তই তা নির্দোষ বলে বিবেচিত হবে। এ ছাড়াও আঞ্চলিক সমুদ্রে মৎস শিকার নিরোধের উদ্দেশ্যে উপকূলীয় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও প্রচারিত আইন পালন না করলে বিদেশী মাছ ধরার নৌকার অতিক্রমন নির্দোষ বলে গণ্য হবে না। ডুবো জাহাজগুলিকে অবশ্যই জলের উপরিভাগ দিয়ে চলাচল করতে হবে এবং নিজ লক্ষ্যে পতাকা প্রদর্শন করতে হবে। (১৪/ ৪, ৫, ৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উপকূলীয় রাষ্ট্র আঞ্চলিক সমুদ্রে নির্দোষ অতিক্রমনকে বাধা প্রদান করবে না। উপকূলীয় রাষ্ট্র নিজ আঞ্চলিক সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের পক্ষে কোন বিপদ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকলে সে সম্পর্কে যথাযথভাবে প্রচারণা করবে। (১৫/১.১) উপকূলীয় রাষ্ট্র নিজ আঞ্চলিক সমুদ্রে নির্দোষ নয় এমন অতিক্রমন বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। উপকূলীয় রাষ্ট্র স্বীয় আঞ্চলিক সমুদ্রের কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বিদেশী জাহাজের নির্দোষ অতিক্রমন সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারে, যদি তা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক হয়।

এ ছাড়াও কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্রের এক অংশ হতে অন্য অংশে যাবার জন্য আন্তর্জাতিক নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলিতে বিদেশী জাহাজের নির্দোষ অতিক্রমন স্থগিত করা যাবে না বা বাধা প্রদান করা যাবে না।(১৬/১, ৩, ৪)

উন্মুক্ত সমুদ্র:

উন্মুক্ত সমুদ্র বলতে কোন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্র অথবা আভ্যন্তরিন জলরাশির অর্ন্তভুক্ত নয়, সমুদ্রের এমনতর সব অংশকে বুঝায়। অর্থাৎ সমুদ্রের যে অংশে সব রাষ্ট্রের নৌযান বিনা বাধায় চলাচল করতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কোন কাজ অবাধে চলাচল করতে পারে তাকেই উন্মুক্ত সমুদ্র বলা হয়। (১৯৫৮ সনের সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন দ্রষ্টব্য)

১৯৫৮ সনের সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনের ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ নং অনুতেছদে সমুদ্র সম্পূর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মাবলী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত সম্মেলনের ২নং অনুচেছদে বিবৃত আছে যে, আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য নিয়ম অনুসারে আরোপিত শর্তাবলীর অধীনে উন্মুক্ত সমুদ্রে উপকূলীয় ও অনুপকূলীয় রাষ্ট্রগুলি নিম্নরূপ স্বাধীনতা ভোগ করবে।

ক. নৌচলাচলের স্বাধীনতা:

খ. মৎস শিকারের স্বাধীনতা;

গ. বিমান চলাচলের স্বাধীনতা।

৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, যেসব রাষ্ট্রের উপকূল নেই, সে সব উপকূলীয় রাষ্ট্রের সাথে সমশর্তে সমুদ্র উপকূল বিহীন সমুদ্রে প্রবেশের অ সুযোগ-সুবিধা লাভ করার অধিকারী হবে। ৪নং অনুচ্ছেদে আরোও বলা হ যে, উপকূলীয় হোক বা না হোক প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকাধীনে উ সমুদ্রে নৌচালনার অধিকার থাকবে। এ সম্মেলনের ১২(১) অনুচ্ছেদের হয়েছে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র স্ব-পতাকাধীন জাহাজের মাস্টারকে, জাহাজ, নাবিক অথবা আরোহীদের কোন গুরুতর বিপদ ঘটলে নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি পা করার নিমিত্তে আদেশ দান করবে:

ক. সমুদ্রে কোন ব্যক্তির তলিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তাকে সাহায্য করা

খ. কোনরূপ সংঘর্ষের পর সংঘর্ষ কবলিত জাহাজটিকে সাহায্য করা এবং স হলে অপর জাহাজটিকে তার নিজ দেশের নাম, নিবন্ধের বন্দর এবং কোন ব ভিড়বে সে ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।

এভাবে জাতিসংঘ সম্মেলনের বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন বিধি বর্ণনা করেছে প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্যে পরিণত হয়েছে।

গভীর সমুদ্র: গভীর সমুদ্রের ব্যাপারে ১৯৫৮ সনের জেনেভা সম্মেলনের মাধ মহা-সমুদ্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত যে নীতিটি ঘোষিত হয় তাকে আন্তর্জা আইনের বিধান মোতাবেক তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় তম্মধ্যে সমুদ্র গ টেলিগ্রাম তার স্থাপন বর্তমানে প্রায় অকার্যকর।

১. অবাধ নৌচলাচলের স্বাধীনতাঃ মহাসমুদ্রে অবারিত চলাচ স্বাধীনতা কেবল সে সব নৌ-যানই ভোগ করে থাকে যা কোন রাষ্ট্রের পত (Maritime flag) বহন করে। অবারিত মহাসমুদ্রে চলাচলের নৌযানগুলিকে কতগুলি বিধি নিষেধ (১৮৭৩ বৃটিশ মার্চেন্ট শিপিং আইন, ১৮ সালের ফরাসী রেগুলেশন ও ১৯১১ সালের Maritime Convention ইত্যা পালন করতে হয়।

২. অবাধ মৎস শিকারের স্বাধীনতাঃ অবারিত মহাসমুদ্রে মৎস শিকা স্বাধীনতা কেবল সন্ধিচুক্তি কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন বাধ্যবাধক মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। যেমন- উত্তর সাগরের মৎস শিকার সংক্রান্ত বিধ ১৮৮২ সনের হেগ সম্মেলনের বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ছাড়াও ১৯ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক মৎস শিকার চুক্তি সম্পাদিত হ

ব্যতিক্রম:

১. অবরোধ : যুদ্ধকালীন অবস্থায় কেবল যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলি শত্রু রাষ্ট্রের উপকূলস্থ বন্দর ও পোতাশ্রয় অথবা রাষ্ট্রাধীন সমুদ্রাংশই অবরোধ করতে পারে না, বরং উন্মুক্ত সমুদ্রের কতিপয় অংশ ও অবরোধ করতে পারে।

২. নিষিদ্ধ পণ্য যাচাই: নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কোন বাণিজ্য জাহাজে শত্রু রাষ্ট্রে প্রেরণে নিষিদ্ধ কোন পণ্য বহন করা হতেছ কিনা তা যাচাই ও পরিদর্শন করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধলিপ্ত রাষ্ট্র অনুরূপ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক নৌযান আটক ও তল্লাশী করতে পারে।

৩. দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন: যদি কোন বিদেশী বাণিজ্যিক নৌযান কোন রাষ্ট্রের এলাকাধীন সমুদ্রাংশে কোন অপরাধ করে পলায়ন পূর্বক উন্মুক্ত সমুদ্রে চলে যায়, অবিলম্বে উক্ত জাহাজের পশ্চাদ্ধাবন করে তা আটক করা যেতে পারে। এই নীতিকে আন্তর্জাতিক আইনে দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন বা (Hot pursuit) বলা হয়ে থাকে এবং এর উদ্ভাবক প্রখ্যাত আইনবিদ ব্লুন্সলী।

৪. নৌপতাকা পরীক্ষা: সব রাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ অন্য কোন জাহাজের পতাকা যাচাই করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখে। কোন নৌযান বেআইনীভাবে কোন নৌপতাকা উত্তোলন করে থাকলে যুদ্ধ জাহাজটি উক্ত পতাকাবাহী জাহাজকে আটক করে দন্ড দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজ বন্দরে নিয়ে যেতে পারে।

যে সব অধিকার ও কর্তব্য সমুদ্র সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনে বিধৃত রয়েছে রাষ্ট্র হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র সে সব ভোগ করবে বা আদায় করবে। ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের মত পার্থিব ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ ইসলাম বা শরীয়ত নিছক কোন ধর্ম নয় যা শুধু উপাসনালয় সীমাবদ্ধ থাকবে বরং এর পরিব্যাপ্তি পার্থিব ও পরকালীন। এই কথাটিকে আমরা প্রতিদিন কয়েকবার উতচারণ করে থাকি, "হে প্রভূ তুমি আমাদেরকে এ দুনিয়ায় এবং পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই দাও।" ইসলামী রাষ্ট্র স্থল, জল ও আকাশ বা মহাকাশের সঠিক ব্যবহার করে জনগণের কল্যাণ দিবে ও সমৃদ্ধিশালীকরে গড়ে তুলবে, এবং অন্যান্য জাতির সাথে সুসম্পর্ক রাখবে। তবে এসব করতে গিয়ে এমন সব কাজ করা উচিত নয় যা শরীয়ত পরিপন্থী বা মুসলমানদের স্বার্থ বিবর্জিত। আবার এমন সব কাজ ত্যাগ করাও উচিত নয় যা মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের সাথে জড়িত। এসব দিকে থেকে বিবেচনা করলে সমুদ্র সংক্রান্ত যানতীয় সুযোগ সুবিধা ইসলামী রাষ্ট্র ভোগ করবে এবং অপরকে ভোগ করার সুযোগ দিবে। এ ছাড়াও আধুনিক যুগের এসব আইন

বা কনভেনশনে প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র স্বাক্ষর করেছে। তাই মুসলমানরা ঐসব আইন ও কনভেনশনের মাধ্যমে অর্পিত সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে ইসলামী রাষ্ট্র কেন কোথায়ও ইখতিয়ার খাটাতে পারছে না? উত্তরে বলতে হয় যে, বর্তমান যুগে ৫৬ টি মুসলিম রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বে ও এদের ভিতরে শরিয়তের হুকুম-আহ্কামের বাস্তবায়ন বর্তমানে অনুপস্থিত। আর এদের উর্ধ্বে রয়েছে অন্যান্য শক্তির চাপ ও মুসলমানদের নিজেদের অন্তরদ্বন্দ্ব সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এবং দক্ষ শাসকমন্ডলী গড়ে ওঠলে সকল ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার খাটাতে পারবে।

মো: আব্দু রায়হান রনি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উৎসসমূহ

সমসাময়িক বিশ্বে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য সমাজে আইনের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। আইন প্রয়োগকারী ক্ষমতা কর্তৃক আইন প্রনয়ণ এবং আইন কর্তৃক আইন প্রয়োগকারী ক্ষমতা সৃষ্টি এ দুটি ধারনার মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। এ কারণে আইনের উৎসের বাহুবিধ কৃত্রিম শ্রেনীবিভাগের উৎপত্তি হয়েছে। এ সকল পরস্পর বিরোধী বিষয়ে সঠিক ধারণা অর্জন আইন বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য অতীব প্রয়োজন। "সার্বভৌমত্ব" শব্দটির ধারণা হতে কোথায় সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান এবং কে প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম এ প্রশ্নের মধ্যেই দ্বন্দ্বের কারণ নিহিত রয়েছে। সাধারণ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সংঘর্ষের বিরোধীতায় শরীয়াহ্ পদ্ধতির দিকে সন্ধানী দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, এর ভিত্তিতে কোন বিরোধ নেই। যদিও আল্লাহ্ সার্বভৌম, তবুও তিনি পার্থিব কর্মকান্ডে মুসলিম উম্মাহ্র নিকট তাঁর সার্বভৌম শক্তি অর্পণ করেছেন।

শরীয়ার বৃহত্তর অংশ হিসেবে আল ফিকহর নীতিমালার উপর ভিত্তি করে ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞানের নীতিমালা গড়ে ওঠেছে। কোন প্রকার মতানৈক্য ছাড়াই ইসলামী আইনের বৈজ্ঞানিক নীতিমালাসমূহ আইনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত কল্যাণকর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইসলামী আইনের মূল উৎস হল আল-কোরআন এবং এরপর সুন্নাহ্ যা কোরআনকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে। রাসুল (সঃ) এর জীবদ্দশায় আইন প্রত্যক্ষভাবে তাঁর নিকট থেকে উৎসারিত হতো। রাসুল (সঃ) নিজেই প্রত্যক্ষভাবে কোরআনের আয়াত সমূহ কথা এবং কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতেন। অতপর সাধারণ ঐক্যমত বা ইজমা কোরআন এবং সুন্নাহর পরের স্থান দখল করে নেয়। ইজমার পর আলেমগণ অবরোহী পদ্ধতির দিকে দৃষ্টিপাত করেন অর্থাৎ কিয়াস করা শুরু করেন। এই পদ্ধতি রাসুল (সঃ) ও সাহাবারা অবলম্বন করতেন। এর পরে আসে চুক্তি বা সন্ধি। সন্ধির মাধ্যমে রাসুল (সঃ) অনেক সমস্যার সমাধান দিয়েছেন যা পরবর্তীতে আইনের উৎস স্বরূপ কাজ করছে। এছাড়া প্রথাও ইসলামী আইন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং আলোচনা ও বুঝার সুবিধার্থে ইসলামী আইনের উৎসসমূহকে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হল।

১. আল-কোরআন:

আল-কোরআনের প্রত্যেকটি শব্দ মহান আল্লাহতায়ালার প্রত্যক্ষবাণ
হিসেবে গণ্য করা হয় এবং হযরত জিবরীল (আঃ) এর মাধ্যমে রাসুলের নিক
কোরআন নাযিল করা হয়। আল-কোরআন হতে কোন উদ্ধৃতি প্রদানের সঠি
নিয়ম এই নয় যে,-ইহা লিখিত বরং সঠিক নিয়ম হল -আল্লাহ বলেন। আল্লাহ
নিয়ম এই নয় যে,-ইহা লিখিত বরং সঠিক নিয়ম হল উদ্ধৃতি লাওহে মাহফুজে ছিল এব
উচ্চারিত বানীসমূহ পবিত্র কোরআনেরই উদ্ধৃতি লাওহে মাহফুজে ছিল এব
রাসুল (সঃ) তার বিহবল অবস্থায় উহা গ্রহণ করেন।

কোরআনের অনুকরণীয়তা: সকল ঐশী গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র কোরআন
যে ভাবে নাযিল করা হয় সেভাবেই প্রতিটি শব্দ রাসুল কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে গৃহী
হয়। এক্ষেত্রে আল কোরআন অন্যান্য ঐশী ধর্মগ্রন্থ থেকে পৃথক। অন্যান
ধর্মগ্রন্থ সংশ্লিষ্ট নবীগণ কর্তৃক ধারণা রূপে গৃহিত হয় এবং পরবর্তীতে তাদে
নিজেদের ভাষায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং ঐসব কিতাব সমূহের অনুকরণীয়তা ছি
না। কিন্তু আল- কোরআনের ক্ষেত্রে অনুকরনীয়তা সংরক্ষিত। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে
রাসুল (সঃ) আল-কোরআনকে প্রত্যক্ষভাবে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেন যা
সত্যতা আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন
আপনি দ্রুত ওহী আবৃতি করবেন না এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্বে
অত:পর আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন
এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব"(আল কিয়ামাহ-১৬-১৯)। বিস্ময়কর ঘটন
হল উদ্দেশ্যের প্রাচুর্যতা ও অতিব প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বে ও আল কোরআনে
অলংকার শাস্ত্র, ভবিষৎ ঘটনা সম্পর্কে ভবিষৎ বাণী, পূর্ব হতে প্রতিষ্ঠিত কো
নিয়ম-শৃংখলা লংঘন এবং অন্যান্য অলৌকিক ঘটনা বিষয়ে আল-কোরআনে
প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় কেহ অংশগ্রহণ করেনি। আল-কোরআনে
যে কোন শব্দ তা গদ্য বা পদ্য যাই হোক উহা কান দ্বারা শ্রবন করা হলে হৃদয়ে
সুমধুর প্রভাব সৃষ্টি হয় বা স্বশ্রদ্ধা ভাবের উদ্রেক করে। রাসুল (সঃ) এর মাধ্যমে
মহা গ্রন্থ আল-কোরআন নাযিল করা হয় কিন্তু তিনি ছিলেন উম্মি অর্থাৎ তি
লিখতে ও পড়তে পারতেন না এমনকি তিনি প্রাচীন ঐশী গ্রন্থ ইতিহাস, পূর্বব
নবীদের জীবনী সম্পর্কে অবগত ছিলেননা কিন্তু তিনি আদম (আঃ)সৃষ্টি পরব
সকল ঘটনা আলোচনা করেছেন যা স্বতই প্রমাণ করে যে রাসুল (সঃ) সক
তথ্য প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করেছেন। অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যে

মধ্যে নিহিত আছে আল- কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব। আল-কোরআনে সময়ে সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল (সঃ) এর মাধ্যমে নাযিলকৃত বিষয় সমুহ অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। যা আড়াই হাজার বছরের ঘটনাকে সম্পৃক্ত করে'

(মায়েদা-১১৪)। ইহা জ্ঞান, শিক্ষা এবং সম্ভাব্য বিজ্ঞান বিশ্বকোষ" (আল বাকারাহ- ৮৭)। যা মানুষের চিন্তার জগতকে প্রশস্ত করেছে। ইহা সত্য ও কল্যানের ধারক যা মানুষকে অধিকার, ন্যায়বিচারের পথে আলোক বর্তিকার মত পথ প্রদর্শন করে। মানবতার জন্য বাস্তব কর্মপন্থা উপহার দেয়ার জন্য ইহাতে শরীয়াহ অর্ন্তভূক্ত হয়েছে যা ত্রুটিমুক্ত এবং পূর্নাঙ্গ। আইনের নীতিমালা, সরকার ও রাষ্ট্র প্রশাসন সংক্রান্ত সকল বিষয় নিয়ে আল-কোরআন আলোচনা করেছে (নিসা: ৯৪; মায়েদা: ৪৫)। এ কারণে আল-কোরআনকে বলা হয় আল-ফোরকান বা সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী; মাজীদ বা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, মুবিন বা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যেকটি বিষয় ব্যাখ্যা করা; আল-হুদা বা পথ প্রদর্শনকারী এবং একটি পূর্নাঙ্গ জীবনপাথেয় বা দাসতুর-উল-আমাল। পৃথিবীর শুরু হতে এ পর্যন্ত আরব, ফার্সী, ভারতীয়, গ্রীক বা রোমান ভাষায় এমন কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি যা একই সাথে আল্লাহর প্রসংশা, নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, অনন্ত কল্যাণকর কাজের প্রতি প্রেরণাদান, ভালকাজের প্রতি আদেশ এবং মন্দ কাজের প্রতি নিষেধ এবং বেহেস্তের সুসংবাদ ও দোজখের আগুনের ভয়কে কোরআনের মত একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আল-কোরআন নাযিল এবং সংকলন :

কোরআন শব্দের অর্থ পড়া বা আবৃতি করা। ব্যবহারিক অর্থে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফত কালে সংগৃহীত ও সম্পাদিত কোরআনের যে অনুলিপি আমাদের কাছে পৌছেছে তাই কোরআন। মহান আল্লাহ রাসুল (সঃ) কে দ্বিতীয় পদে সম্বোধন করে ধারাবাহিক যোগাযোগ রূপে কোরআন নাযিল করেছেন। তিনি মানুষের সাথে এই যোগাযোগ বার্তা প্রকাশ করেন রাসুল (সঃ) এর সর্বশেষ বাইশ বছর এগার মাস বাইশ দিনে। যে রাত থেকে সর্ব প্রথম আল-কোরআন নাযিল শুরু হয় সে রাতকে লাইলাতুল কদর বলা হয়। তখন রাসুল (সঃ) একচল্লিশ বছর বয়সে পদার্পন করেন। আল-কোরআনের আয়াতসমূহ সমাজের তাৎক্ষনিক চাহিদা পূরনের জন্য অবিরামভাবে নাযিল করা

হয়েছিল। এ কারণে যে, সকল ঘটনার প্রেক্ষিতে কোরআন নাযিল করা হয়েছিল তাকে কোরআন নাযিলের কারণ বা শানে নুযুল বলা হয়ে থাকে। ইহা আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছিল। যে সকল কারণে আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল-যথার্থ ভাবে ভাব প্রকাশ, ব্যাখ্যা ও বাক্য গঠনের সুবিধা। পর্যাপ্ত শব্দ মূল প্রকৃতি-প্রত্যয় শব্দের কারণে বৈজ্ঞানি ভাষা হিসেবে আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল যথাযথ ছিল, যার প্রত্যেকটি মূ ধারনার ইহৎ পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রকাশ করা ছিল সংবেদনশীল বা হৃদয়গ্রাহী রাসুলের মদীনায় হিজরতের পূর্বে সর্ব প্রথম মক্কায় কোরআন নাযিল শুরু হয়। অতঃপর রাসুলের মদীনায় হিজরত করে চলে আসার পরও কোরআন নাযিল অব্যাহত থাকে। সময় ও স্থানের বিষয় বস্তুর বর্নণা প্রসঙ্গের উপর ভিত্তি করে কোরআন নাযিলের দুটি সময়কাল গড়ে ওঠেছে। মক্কায় অবর্তী আয়াত বা সূর সমুহের বিষয় বস্তু হলো ঈমান, সৃষ্টি কৌশল, শেষ বিচারের দিন পুনরুজ্জীবন লাভ, কৃতকর্মের পুরস্কার ও শাস্তি ইত্যাদি। কিন্তু মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত ব সুরা সমূহ ফিকহ্ বা আইন বিজ্ঞানের নীতি মালা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। নাযিলকৃত আয়াত সমুহ রাসূল (সঃ) এর সাহাবাগণ কর্তৃক দ্রুত মুখস্থ করানো হতো, বিভিন্ন সহজলভ্য উপায় - উপকরনের মাধ্যমে লিখে রাখা হত। রাসূলের ইন্তিকালের পর অনেক সাহাবী যারা কম বেশী কোরআনে হাফেজ ছিলেন তার জিহাদে শাহাদৎ বরন করেন। ফলশ্রুতিতে এই আশংকা করা হয় যে, পবিত্র কোরআনের কোন সুরা অথবা আয়াত চিরতরে হারিয়ে যাবে অথবা বিকৃত হয়ে যাবে, তাই খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসুলের নিজস্ব ওহী লেখক যায়েদ বিন সাবিতকে নাযিলকৃত পবিত্র কোরআনের সমস্ত আয়াত এবং সুরার সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত সংকলন প্রস্তুতের দায়িত্ব অর্প্পন করেন। হযরত যায়েদ বিন সাবিত বিদ্যমান কাগজ খন্ডে বা মসৃন হাড়ে বা পাথরে খোদাইকৃত আয়াত সমূহ এবং নির্ভর যোগ্য ও বিশ্বস্ত মানুষের স্মৃতি হতে বিচ্ছিন্ন আয়াতসমুহ সংগ্রহ করে একত্রিত করেন <u>প্রথম সংকলনটি সম্ভবত হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করেন</u>। এর পরে হযরত ওসমান (রাঃ) এর আমলে রাষ্ট্রীয়ভাবে আল-কোরআনের সংকলন প্রস্তুত করা হয়। তবে সংকলনটিতে কি পাঠগত সমস্যা থাকার কারণে পুনরায় উহা যায়েদ বিন সাবিত এর সম্পাদনা কমিটিতে পাঠানো হয়। যায়েদ বিন সাবিতের সম্পাদনা কমিটির সহযোগী

সদস্য ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, সাদ বিন আল-আস, আব্দুর রহমান বিন হারিস, প্রমুখ। উক্ত সম্পাদনা কমিটি কর্তৃক কোরআন সংকলনের কাজ সমাপ্ত হলে খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) পূর্ববর্তী সংকলনের সকল কপি ধ্বংস করার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তী সংকলনের কপি মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরন করেন। এই সংকলনটি আমাদের নিকট অপরিবর্তিত রূপে পৌছেছে এবং ইহাই একমাত্র আল-কোরআনের প্রামাণ্য সংকলন যার যথার্থতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। শিয়া সম্প্রদায় এ মর্মে অভিযোগ করে যে, ওসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর প্রতিকূলে আল কোরআনের কিছু আয়াত গোপন করেছেন বা প্রকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি-করেছেন কিন্তু তারা তাদের অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এ ভাবে আল কোরআনের সত্যতা যথার্থ ভাবে প্রমানিত হয়েছে।

ইহা সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত যে, আল কোরআনের আয়াত ও সুরা সমূহের বিন্যাস রাসুল (সঃ) এর নির্দেশমত করা হয়েছিল যিনি এ বিষয়ে ঐশী নির্দেশ প্রাপ্ত ছিলেন। আল-কোরআনের ব্যাখ্যা একটি বিতর্কিত বিষয় কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারেনা, যে রাসুল (সঃ) এর সাহাবীগণ যারা সর্বদা তাঁর পাশে থাকতেন তারাই আল কোরআনের আয়াত সমূহের নাযিলের কারণ সম্পর্কে বেশী অবগত ছিলেন। এদের মধ্যে সঠিকভাবে পরিচালিত পাঁচ জন বাছাইকৃত সাহাবী হলেন:আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ, উবাই বিন কাব, যায়েদ বিন সাবিত, আবু মুসা আল আসয়ারী এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের।

আল কোরআন ১১৪টি অসম ভাগে বা সুরায় বিভক্ত। সুরা গুলো তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং সব থেকে দীর্ঘ সুরাটি প্রথমে এসেছে। আল কোরআনের শব্দসমুহ ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) খাস বা বিশেষসমূহ : (ক) বর্গ সমুদ্রে, যেমন মানব জাতি, (খ) প্রজাতি সম্পর্কে, যেমন মহিলা থেকে পৃথক করে পুরুষ। (২)আম বা সাধারন বা সামষ্টিক যেমন জনগণ। (৩) মুশতারিক বা একাধিক তাৎপর্য বা অর্থ বিশিষ্ট শব্দ। যেমন আরবী শব্দ আইন অর্থ চোখ, ঝর্ণা বা প্রস্রবন বা সূর্য। আবার 'সালাত' শব্দ আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে দয়া, কিংবা মানুষের সথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে নামাজ বা দুয়া। (৪) মুআওয়াল বা কতিপয় সম্ভাব্য অর্থ বিশিষ্ট শব্দ। উদাহরণস্বরূপ নহর শব্দের অর্থ আবু হানিফার মতে উৎসর্গ করা কিংবা ইমাম শাফেঈর মতে 'নহর' শব্দের অর্থ

নামাজে বুকে হাত রাখা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কোরআনে ব্যবহৃত বাক্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারনা লাভ করা যায়। আল কোরআনের বাক্যসমূহ দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা (ক) যাহির বা প্রকাশ, (খ) খুফী বা গোপন।

আল কোরআনের প্রকাশ্য বাক্য সমুহ নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত :

ক. যাহির : যাহির শব্দের অর্থ প্রকাশ যে বিষয়ের অর্থ স্পষ্ট এবং কারো নিকট উহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা না করেই উহার অর্থ অনুধাবন করা যায় বা যে উহা শ্রবন করে সে স্বয়ং উহার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে সে বিষয়কে যাহির বা প্রকাশ বলে। এ ধরনের বাক্য মানসুখ বা বিলুপ্ত হতে পারে। তবে যদি বিলুপ্ত না হয়ে থাকে তাহলে এরূপ বাক্যানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আল্লাহর প্রকাশ আদেশ হিসেবে গন্য হবে। দন্ডবিধিসমুহ, এবং এক জনের ধর্মীয় কর্তব্য অন্যের দ্বারা পালন নিয়ন্ত্রণকারী বিধিসমুহ, যেমন রোজা রাখার পরিবর্তে ফকির-মিসকিন খাওয়ানো, ইত্যাদি।

খ. নস: কোরআনের কোন বিষয় প্রসঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত শব্দকে নস্ বলে। কিন্তু ইহার ব্যবহারিক অর্থে কোন বাক্যে বিদ্যমান শব্দ দ্বারা ঐ বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি তা প্রকাশ করাকে নস বলে। উদাহরনস্বরূপ: -সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি" (নিসা-৩)। এই বাক্যটি যাহির, কারণ এখানে বিবাহকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে; ইহাই নস্, কারন আলোচ্য বাক্যে বিদ্যমান দুই, তিন, বা চার শব্দগুলি ইহাই বুঝায় যে চারটির বেশী স্ত্রী গ্রহণ অবৈধ।

গ. মুফাচ্ছীর : ইহা এমন বাক্য যা ব্যাখ্যা করতে ও অর্থ স্পষ্ট করতে অন্য শব্দের সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন হয়।

উদাহরণস্বরূপ ইবলিশ ব্যতীত সকল ফেরেস্তা অবনত মস্তকে আদমকে সিজদাহ্ করল এখানে ইবলিশ ব্যতিত এই শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে ইবলিশ নিজে আদমকে সিজদাহ্ করেনি।

ঘ. মুহকাম বা প্রাণঞ্জল: ইহা এমন প্রকৃতির বাক্য যার অর্থের কোন সন্দেহ না বিতর্ক থাকে না। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এ প্রকৃতির বাক্য

বিলোপ করা যায়না। এরূপ বাক্যের শাব্দিক অর্থ হতে বিচ্যুৎ না হয়ে উহার আমল করা আল্লাহর আনুগত প্রদর্শনের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। যখন এসব বাক্য সমূহের মধ্যে প্রকৃত এবং স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান বিরোধ দেখা দেয় তখনই এসব বাক্যের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

আল কোরআনের সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন বাক্য সমূহ :

ক. খুফী: যখন কোন বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের প্রকাশ্য অর্থের অন্তরালে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কোন গোপন অর্থ বিদ্যমান থাকে তখন ঐ বাক্যকে খুফী বা গোপন বাক্য বলে। উদাহরণস্বরূপ "চোর সে পুরুষ বা মহিলা যেই হোক না কেন তাদের কৃত কর্মের ফলস্বরূপ তাঁদের হাত কেটে দাও" এখানে চোরের আরবী শব্দ সারিক। এই আয়াতে 'সারিক' কেবল চোর নয় বরং দস্যু, পকেটমার, ছিনতাইকারী ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত। এই অর্থগুলোই আলোচ্য আয়াতের মধ্যে খুফী বা গোপন।

খ. মুসকিল বা দ্ব্যর্থক: "এবং (সেখানে উপস্থিত) তাদের চারিদিকে রূপার তৈরী পাত্র এবং পানপাত্র নিয়ে ঘুরবে। বোতলগুলো হবে রূপার। এখানে বোতলগুলো প্রকৃত অর্থে রূপার নয় বরং কাচের তৈরী। মুফাসসীর কারকগণ বলেন যে, কাচের রঙ অনুজ্জল থাকা সত্ত্বেও কিছু উজ্জলতা আছে। কিন্তু রূপা হচ্ছে সাদা এবং কাচের মত এত বেশী উজ্জল নয়। এখন এমন হতে পারে যে, বেহেস্তের বোতল সমূহ উজ্জলতার দিক থেকে কাঁচের বোতল হতে পারে এবং রঙের দিক থেকে সেগুলো রূপার তৈরী হতে পারে অর্থাৎ রূপার মত সাদা হতে পারে। কিন্তু যেভাবেই হোক ইহার প্রকৃত অর্থ বের করা খুবই কঠিন।

গ. মুজমাল : ১. বাক্যের অন্তর্ভূক্তি শব্দের একাধিক অর্থ থাকার কারণে যদি কোন বাক্যের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা থাকে তাহলে সে সেক্ষেত্রে ঐ বাক্যের যে অর্থ প্রদান করা হয়েছে সেই অর্থ গ্রহণ ও আমল করতে হবে।

২. বাক্যে খুবই বিরল শব্দ থাকতে পারে। যেমন- "মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীরুরূপে" (আল-মাআরিজ-১৯)। আলোচ্য আয়াতে 'হালুয়ান' শব্দটি বিদ্যমান। এই শব্দটির ব্যবহার খুবই বিরল। সুতরাং এ ধরনের বাক্যের অর্থ অনুধাবন করা আদৌ সহজ নয়।

প্রথম শ্রেণীর মুজমাল বাক্যের উদাহরণ এভাবে দেয়া যেতে পারে: সালাত কায়েম কর এবং যাকাৎ প্রদান কর। সালাত এবং যাকাৎ উভয়ই মুশতারিক। সাধারণ লোকজন এ আয়াতের অর্থ না বুঝতে পেরে রাসুল (সঃ) এর নিকট অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ জানায়। তিনি তাদের নিকট ব্যাখ্যা করেন সালাত অর্থ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে প্রার্থনা করা এবং দাড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলা এবং কুরআনের কিছু আয়াত আবৃত্তি করা। যাকাৎ শব্দের প্রাথমিক অর্থ হল বৃদ্ধি পাওয়া। রাসুল (সঃ) যাকাৎ বলতে দরিদ্র, মিসকিন এবং অন্যান্য নির্ধারিত খাতে সম্পদের একটি নির্ধারিত অংশ বন্টন করাকে বুঝিয়েছেন। রাসুল (সঃ) ধন সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত প্রদান করতে বলেছেন।

ঘ. মুতাসাবিহ: আল কোরআনের এমন কিছু কঠিন বাক্য আছে যার অর্থ মানুষ সহজে বুঝতে পারেনা। রাসুল (সঃ) এগুলোর অর্থ জানতেন কিন্তু ব্যাখ্যা করেননি। যেমন আলিফ, লাম, মিম, আলিফ, লাম, রা ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে আল্লাহর হাত বা আল্লাহর মুখমন্ডল, বা আল্লাহ্ বসে আছেন ইত্যাদি। এসব শব্দগুলো মুতাসাবিহ্ এর অর্ন্তভুক্ত। অধিকন্তু আল কোরআনের শব্দগুলোকে আরো চার ভাগে ভাগ করা যায়: ১. হাক্বিকাহ্- যে সমস্ত শব্দ শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন 'রুকু' বিনয়ের সাথে অবনত হওয়ার অর্থে এবং সালাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. মাযাজ: যে সমস্ত শব্দ ভাষার অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন দোয়া অর্থে 'সালাত' শব্দের ব্যবহার করা।

৩. সারিহ: যে সমস্ত শব্দের অর্থ সম্পুর্ণরূপে স্পষ্ট যেমন তালাক প্রদান কর বা মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হও, তাকে সারিহ্ বলে।

৪. কিনায়াহ: যে সমস্ত শব্দ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এর অর্থ অনুধাবন করার জন্য সংশ্লিষ্ট রচনা বা বর্ণনার সাহায্য গ্রহণ করতে হয় সে সমস্ত শব্দকে কিনায়াহ্ বলে। যেমন রাসুল (সঃ) এর দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে তা জেনেই বলেন তুমি কে ? লোকটি উত্তর দেয় আমি। রাসুল (সঃ) এর প্রতি উত্তরে বলেন যে তুমি কেন বলছ আমি তুমি তোমার নাম বল যাতে আমি বুঝতে পারি তুমি কে এখানে সর্বনাম আমি হচ্ছে কিনায়াহ্।

কোরআন ব্যাখ্যার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন শাখা হচ্ছে ইসতিদলাল বা কোরআন হতে যুক্তি গ্রহণের বৈজ্ঞানিক পন্থা। ইহা চারটি অংশে বিভক্ত:

ক. ইবারাহ্ বা সরল বাক্য: যেমন, মা তালাক প্রাপ্তা হবার পর তার সন্তানদের বয়স দুই বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্তনাদান করবে এবং তাদের পিতা তাদেরকে দায়িত্বানুসারে ভরন পোষণ প্রদান করবে"(বাকারাহ্-২৩৩)। অত্র আয়াত থেকে দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত-"তাদেরকে শব্দটি বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গ এবং ইহা মাকে নির্দেশ করে সন্তানদেরকে নয়। দ্বিতীয়ত, যেহেতু মাতার ভরণ পোষণের দায়িত্ব পিতার উপর ন্যস্ত সেহেতু, সন্তানদের সম্পর্ক মাতা অপেক্ষা পিতার নিকট বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এলক্ষে ইসলামী দন্ডবিধি আইন অবরোহী সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর নির্ভরশীল।

খ. ইশারাহ: শব্দ বিন্যাসের মধ্যে প্রদত্ত চিহ্ন বা ইঙ্গিত।

গ. দালালাহ: আয়াতে ব্যবহৃত কিছু বিশেষ শব্দ থেকে যুক্তি গ্রহণ, যেমন: তোমার পিতা-মাতাকে উহ্ শব্দটিও বল না বা ধিক্কার দিও না" (বনী ইসরাইল-২৩)। আল-কোরআনের আরবী শব্দ' উফ'-এর ব্যবহার থেকে এই সিদ্ধান্ত বা যুক্তি গ্রহণ করা যায় যে, সন্তানরা তার পিতা-মাতাকে মারতে বা ধিক্কার দিতে পারবে না। দন্ডবিধিও দালালাহ্র উপর নির্ভরশীল হতে পারে।

৪. ইক্বতিদাহ কতিপয় নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে আবরোহী পদ্ধতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত 'যদি কোন ব্যক্তি কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে দুর্ঘটনাক্রমে হত্যা করে তবে সে অবশ্যই একজন ঈমানদার দাসকে মুক্ত করতে বাধ্য থাকবে' (আন-নিসা- ৯৪)। যেহেতু মানুষকে তাঁর প্রতিবেশীর দাস মুক্ত করার কোন কর্তৃত্ব দেয়া হয় নাই সেহেতু এখানে যে শর্ত প্রযোজ্য এটি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ দাসকে তার নিজস্ব সম্পত্তি হতে হবে।

মানসুখ বা বিলোপ:

কোরআন ও এর বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য মানসুখ বা বিলোপ সংক্রান্ত বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনে ইহা উদ্ধৃদ্ধ হয়েছে এভাবে "আমি কোন আয়াত রহিত করলে বা বিস্মৃত করে দিলে তদাপেক্ষা উত্তম অথবা সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান (বাকারাহ্-১০৬)। ইহা একটি মাদানী সুরা। আল্লাহ যা ইচ্ছা বিলোপ করেন এবং বহাল রাখেন এবং মূল গ্রন্থ তাঁর কাছে রয়েছে' (সূরা রা'দ-৩৯)। এভাবে রাসূল (সঃ) এর জীবদ্দশায় কিছু আয়াত বিলোপ করা হয়েছিল।

উদাহরণঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুল (সঃ) একদিন কোরআনের একটি আয়াত আবৃত্তি করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে লিখে রাখেন। পরেরদিন তিনি লক্ষ্য করেন যে, যে বস্তুর উপরে আয়াতটি লিখে রাখা হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে রাসুল (সঃ) কে ঘটনা জানালেন। তখন রাসুল (সঃ) বললেন যে, আয়াতটি মানুসখ্ হয়েছে। আল কোরআনে এখনও এমন অনেক আয়াত আছে যার বিধি বিধান মানসুখ্ হয়েছে। যে সকল আয়াতের দ্বারা মানসুখ্ করা হয় তাকে নাসিখ্ এবং কিছু আয়াতসমূহকে মানসুখ্ বলা হয়। আয়াত সমূহ তিন প্রকার যথা:

১. ঐ সমস্ত আয়াত যার শব্দ এবং হুকুম উভয়ই বিলুপ্ত হয়েছে।

২. ঐ সব আয়াত যার অক্ষরসমূহ বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু হুকুম বহাল আছে।

৩. ঐ সমস্ত আয়াত যার হুকুম বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু অক্ষরসমূহ বহাল আছে।

ইমাম মালেক (রঃ) প্রথম শ্রেণীর মানসুখ্ আয়াতের একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তা হলো "যদি আদম সন্তানের দুটি স্বর্ণের নদী থাকে তাহলে সে চতুর্থ নদী পাবার জন্য লালায়িত হবে। ময়লা আবর্জনা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা আদম সন্তানের পেট পূর্ণ হবে না, যারা অনুতপ্ত আল্লাহ তাদের দিকে ফিরে আসবেন।" ইমাম সাহেব বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি সুরা তওবার অন্তর্ভূক্ত ছিল। রজম বা পাথর নিক্ষেপের আয়াত দ্বিতীয় শ্রেণীর মানসুখ্ আয়াতের উদাহরণ। আয়াতটি হলঃ "যদি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ এবং নারী ব্যাভিচার করে তাহলে তাদের প্রত্যেকে পাথর মার। ইহা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি। কারণ তিনি সর্ব শক্তিমান ও সর্বোজ্ঞ। খলিফা ওমর (রাঃ) বলেন যে, অত্র আয়াতটি রাসূল (সঃ) এর জীবনকাল পর্যন্ত বহাল ছিল কিন্তু বর্তমানে উহা বিলুপ্ত। তৃতীয় শ্রেণীর মানসুখ্ আয়াতসমূহ বাস্তব কারণে 'ইলমুল-উসুল'- এর আওতায় পড়ে। মানসুখ্ আয়াতের সংখ্যার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

আল কোরআনের ফিকহ এবং এর প্রণালী:

ফিকহর নীতি অনুসারে আল-কোরআনে সামগ্রীকভাবে তিনটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত।

১. ইলমুল কালাম বা দুরদর্শী ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক আয়াত।

২. ইলমুল আখলাক বা নৈতিক নীতিমালা সংক্রান্ত আয়াত।

৩. ইলমুল আমল বা মানুষের আচরণ বা কর্মপ্রণালী সংক্রান্ত আয়াত। এ সব আয়াত প্রত্যেক্ষভাবে উসূল আল-ফিকহ্-র সাথে সম্পৃক্ত।

বিশ্লেষাণা-ত্মকভাবে পর্যাবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, আল-কোরআনের ফিকহী আয়াত সমুহ প্রয়োজনীয়তার তাগিদে ও সমাজের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নাজিল হয়েছে। এ আয়াতগুলো কোরআন নাজিলের দ্বিতীয় পর্যায়ে মাদানী যুগে নাজিল হয় এবং এগুলো প্রধানতঃ যুদ্ধ, গণিমাহ্, যাকাত, বিবাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, বিচার-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এ সব আয়াতগুলো এমন একটি ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণ করে যার উপরে ভিত্তি করে পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে ফিকাহ্ শাস্ত্র গড়ে ওঠে। মুসলিম বা অমুসলিমদের প্রশ্ন উত্তররূপে আল-কোরআনের আয়াত সমুহ ফিকাহ্ শাস্ত্রের ক্রমবর্ধমান নীতিমালা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ধর্মের প্রকৃতি অনুসারে এরূপ ঘটনা ছিল খুবই বিরল। এর সব থেকে নিকটতম ও সহজতম উদাহরণ হলো মদপানের বিরুদ্ধে ক্রমশ নিষেধাজ্ঞা। প্রথম স্তর আলকোরআনে বলা হয়েছে 'লোকজন আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলুন উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে কিন্তু পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক' (বাকারাহ্-২১৯)। দ্বিতীয়স্তর: আলকোরআনে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, "হে বিশ্বাসীগণ মদ্য পানোন্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার" (আন-নিসা-৪৩)। তৃতীয় স্তর : আল কোরআনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলা হয়েছে যে, "হে বিশ্বাসীগণ মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক ঘৃন্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফল কাম হতে পার। শয়তান তোমাদের মধ্যে মদ ও জুয়া দ্বারা শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরন ও সালাতে বাধা দিতে চায়, তবে কি তোমরা নিবৃত হবে না "(মায়েদা- ৯০-৯১)।

ফিকহ্ নীতিমালার ক্ষেত্রে আল কোরআন মানুষের ইহ্কালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য মৌলিকভাবে মানবতা পুর্নগঠনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এ উদ্দেশ্য পরিপুর্ণ করার জন্য ইহা প্রথমে আদম আল হারয অর্থাৎ মানুষের জীবন থেকে কষ্ট ও সংকীর্ণতা দূর করার জন্য কাজ করে। আল-কোরআন এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছে এ ঘোষণার মাধ্যমে, "আল্লাহ

তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না" (বাকারাহ্-১৮৫)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে আ
কোরআনের বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয়। মানুষের অভ্যন্তরিন, বাহ্যিক, প্রকাশ্য
অপ্রকাশ্য ক্রিয়া সম্পর্কে আল কোরআনে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাহাই আইন
হুকুম। আলকোরআনের ম্যাক্সিম বা নীতিমালা, নির্দেশাবলী, মানুষের আ
বিষয়ে সাধারণ বা মৌলিক নিয়ম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ইহা সংবিধান বা আই
মৌলিক সংহিতা হিসেবে আইনের জগতে এক অতিব উচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ
দখল করে আছে ইসলামী আইনের মৌলিক নীতি মালা আল কোরআনের
মৌলিক রূপরেখা থেকে উৎসারিত। তাই দেখা যায় যে, আল কোরআন মুসলি
উম্মাহর কর্তৃত্ব ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্দেশাবলী প্রদান করে। আল কোরআ
শুধুমাত্র উপদেশ মুলক বিধান আলোচিত হয়েছে কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে
পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তাহা রাসুলের সুন্নতে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে

২. সুন্নাহ:

মুহাম্মদ(সঃ) শুধুমাত্র একজন ঐশী বাণীর বাহক ছিলেন না, তিনি
ব্যাখ্যা ও পরিপূর্ণতা দান করেছেন। রাসুল(সঃ) এর সাধারণ অভিব্যক্তি এ
তার প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল, প্রথমটির অন্তর্
বিষয়বস্তু ঐশী আর দ্বিতীয়টি গঠনমূলক ভাবে ঐশী। আল-কোরআনের বা
উপর ভিত্তি করে এই মতের যৌক্তিকতা গৃহীত হয়েছে, "এবং আপনার কাছে আ
স্মরণিকা (আল-কোরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি লোকদের সাম
ঐসব বিষয় বিবৃত করেন যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে" (আ
নাহল-৪৪)।

হাদিস এবং সুন্নাহ্র মধ্যে পার্থক্য: সুন্নাহ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে প
বা প্রথা। প্রায়গিক অর্থে আইন বিজ্ঞানীগণ এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলে
সুন্নাহ অর্থ হলো রাসুল (সঃ) এর উচ্চারিত কথা যা হাদিস নামে খ্যাত অ
তার ব্যক্তিগত কার্যাবলী এবং সাহাবীদের কথা বা কাজ যার প্রতি তিনি প্রকা
অথবা মৌন সম্মতি প্রদান করেছেন। ধর্মীয় কর্তব্যের ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ শব্দের আ
একটি অর্থ হচ্ছে শরীয়াহ্ অনুসারে অথবা শরীয়াহ্ অনুমোদিত কিছু বিধানাব
কিন্তু বাধ্যতা মূলক নয়। অপর দিকে হাদিস শব্দটি শুধু রাসুলের কথাকে অর্ন্তভূ
করে না, বরং তার কার্যাবলী এবং তার সাহাবীদের কার্যাবলী (তার অনুমোদি

সব কিছুকেই অর্ন্তভূক্ত করে। রাসুল (সঃ) মেনে নিয়েছেন বা তিনি অনুমোদন দিয়েছেন বলতে আমরা বুঝি যে, রাসুলের উপস্থিতিতে সাহাবাগণ যে সকল কাজ করতেন সেগুলোর প্রতি রাসুল মৌন অথবা প্রকাশ্য সম্মতি প্রদান করতেন। কোন সংঘটিত ঘটনার প্রতিনিধিত্বকারী তথ্যকে প্রকৃত অর্থে হাদিস বলে, অপরদিকে সুন্নাহ্ অর্থ হলো প্রথা বা আচার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সুন্নাহ্ হচ্ছে অভ্যাসগত ভাবে কৃত আচার বা প্রথা এবং হাদিস হচ্ছে এই অভ্যাস গত ভাবে কৃত আচার বা প্রথার দলিল বা প্রমাণ। হাদিস বিজ্ঞান সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা তথা কোরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি লোকদের মাঝে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে" (আন-নহল-৪৪)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে যে, রাসুল (সঃ) একাই সব সমস্যার সমাধান জানতেন এবং তিনি তার অনুসারীদের নিকট যে জ্ঞান প্রচার করতেন তা তার কথা ও কাজের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে যেত। তিনি কোরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন এবং মানসুখকৃত আয়াত বা মানসুখ হবে এমন আয়াতের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এবং সাহাবীরা তার কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন। সাহাবীরা রাসুলের কাছ থেকে আয়াত বা সুরা অবতীর্ণ হওয়ার শানে নুযুলও জেনে নিতেন । এভাবে সাহাবীগণ কোরআন ও সুন্নাহ্র উপরে দক্ষ হয়ে উঠলেন। এই জ্ঞান তাঁরা তাদের অনুসারী বা তাবেয়ীনদের নিকট মুখের কথার মাধ্যমে পৌছে দিতেন এবং তাঁরা তাদের অনুসারী অর্থাৎ তাবা তাবেয়ীনদের নিকট পৌছে দিতেন । তবে আল কোরআনের কোন অনুচ্ছেদের বা কোন সাহাবীর মন্তব্য সমালোচনা করার সুযোগ ছিল না। প্রথমটি ছিল সম্পূর্ন পবিত্র এবং দ্বিতীয়টি তখনই গ্রহণ যোগ্য হত যখন বর্ণনাকারীগণের পারস্পরিক শৃংখলা থেকে ত্রুটি মুক্ত হত। তাই ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে ব্যাখ্যার নীতিমালা নির্ধারিত ছিল। বর্তমানে প্রতিটি শব্দের ও প্রতিটি বাক্যের স্থান ও শ্রেণী আছে। ব্যাখ্যাকার গণকে এখন পূর্বে লিখিত বিষয়কে শুধু মাত্র পুনঃউপস্থাপন করতে হয় যদিও তারা বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার জন্য কিছু হাদিস সামনে উপস্থাপন করতে পারেন তবে এটি একটি কষ্টসাধ্য বিষয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, হাদিসে ঐসকল দলিল অর্ন্তভুক্ত আছে যা রাসুল (সঃ) বলেছেন ও করেছেন। সকল মুসলমান বিশ্বাস করে

যে, রাসুল (সঃ) ঐশী প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে শুধু মাত্র কথা বলেননি কাজও করেছেন। আর এ সকল কথা ও কাজ হচ্ছে আইনের দ্বিতীয় উৎস। রাসুল(সঃ) ঘোষণা করেন যে, ইসলাম অবশ্যই মানুষের হৃদয়ে লিখিত থাকবে। একারণে রাসুলের কথাসমূহকে লিখার ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে অনিচ্ছা বিদ্যমান ছিল। এছাড়া হাদিস লিপিবদ্ধ না করার আর একটি কারণ হচ্ছে কোরআনের সাথে সংমিশ্রনের আশংকা। একারণেই রাসুলের কথাগুলোকে মৌখিক শব্দের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। কোন একটি কথা রাসুলের, এ দাবীর পক্ষে কোন যুক্তিই কার্যত ফলপ্রসূ ছিলনা। জাল বা মিথ্যা হাদিসের দরজা উন্মুক্ত ছিল এবং মুসলমানদের উপর অনেক মিথ্যা হাদিস চাপিয়ে দেয়া যেত কিন্তু তা সম্ভব হয়নি কারণ এর পিছনে কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল যার সর্বাগ্রে অবস্থান করেছে রাসুলের বানী যেমন তিনি বলেন -"আমার সুনিশ্চিত কথা ছাড়া অন্য কোন কথা অপরের নিকট পৌঁছে দিও না। নিশ্চয় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যে আমার কথা ভুল করে বা মিথ্যার সাথে প্রচার করবে সে আগুন ছাড়া অন্য কোথাও স্থান পাবে না।

উপরোক্ত বিধান বলবৎ করার জন্য এই নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে যে, কোন হাদিস বর্ণণাকারীকে অবশ্যই ইসনাদ বা কর্তৃত্বের প্রবাহকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। যেমন - আমি অমুক মানুষের নিকট থেকে শুনেছি যে, সে অমুক মানুষের নিকট থেকে শুনেছে এবং এরূপ প্রবাহ যতক্ষণ না পর্যন্ত রাসুল পর্যায় পৌছায়। ইসনাদের প্রতিটি মানুষকে তাঁর সচ্চরিত্র এবং শ্রুতিধর স্মৃতি শক্তির জন্য সুপরিচিত হতে হবে।

হাদিস সংকলন এবং শ্রেনীবিভাগ:

হাদিস সংকলনের ইতিহাস রাসুল (সঃ) এর আমল থেকেই শুরু করতে হয়। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে বলা যায় যে মদীনায় হিজরতের পর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদিও রাসুল(সঃ) প্রাথমিক পর্যায় সাহাবীগণকে হাদিস না লেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি হাদিস লেখার অনুমতি প্রদান করেন। তিরমিযী অনুসারে তিনি একজন আনসারীকে তাঁর কথা কাজের বিবরণ লিখতে বলেছিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল আস

(রাঃ) কে লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন যাতে তিনি ভুলে না যান এবং আবু রাফী ও আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) কে লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমর ইবনে হাজম ইয়েমেনের গর্ভনর হিসেবে রাষ্ট্রীয় দলিল পত্রাদি সংগ্রহ করে ছিলেন। রাসুল (সঃ) এর হাদীস লেখার বিরুদ্ধে পরস্পর বিরোধী প্রকৃতির নির্দেশ সাহাবীদের মনে কোন জটিলতার সৃষ্টি করেনি। কারণ তারা রাসুল (সঃ) এর প্রতিটি ঘোষণা সম্পর্কে সম্পূর্নরূপে সচেতন ছিলেন। তারা পরবর্তী কিছু হাদীসপন্থীগণের মনে সামান্য সন্দেহের সৃষ্টি করেছিলো এবং যেসকল হাদীস তাদের জ্ঞানের আওতায় এসেছিল সেগুলো সংকলন করেছিলেন। পরবর্তীতে এর পক্ষে এবং বিপক্ষে যখন সকল উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছিল তখন বিজ্ঞ এবং উপলব্ধিক্ষম ব্যক্তিদের রাসুলের প্রকৃত ইচ্ছাকে সন্নিবেশিত করতে আদৌ কষ্ট করতে হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ সহীহ বুখারী শরীফে বুখারী (রঃ) হাদীস লেখার কলাকৌশল অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি বিশেষ অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন। এর আলোকে হাদীস সংগ্রহের পদ্ধতি সাধারণভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শুরু হয়।

প্রথম স্তরের সময়কালে আসহাব-আস-সুফ্ফাহ নামে ধর্ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মদীনায় বসবাসরত রাসুলের (সঃ) একদল সাহাবী হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন আবুহুরায়রা (রাঃ) যিনি রাসুলের (সঃ) সাথে সার্বক্ষণিকভাবে থাকতেন এবং তাঁর প্রত্যেক কথা ও কাজের দ্বারা নিজের স্মৃতিশক্তিকে পরিপূর্ণ করেছিলেন। জাবির বিন আব্দুল্লাহ হজ্জের উপর একটি পুস্তিকা লিখেন এবং উম্মুল মুমেনিন হজরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর বোনের ছেলে আব্দুল্লাহ বিন জোবায়ের (রাঃ)-এর নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। খলিফা আবু বকর সি-দ্দীক (রাঃ) যে সব হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন ধর্মীয় বিভেদের আশংকায় তা ধ্বংস করে দেন। খলিফা ওমর (রাঃ) হাদীসের একটি সংহিতা প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন যেখানে হজরত আলী (রাঃ) এর আলীর সহীফা নামক হাদীস গ্রন্থে, হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান ছিল। আব্দুল্লাহ বিন আবি আস (রাঃ) হাদীসের উপরে প্রশিক্ষণ দেন এবং সামুরা বিন জানদুব (রাঃ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়াও আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ (রাঃ)-এর হাদীস সংক্রান্ত নির্দেশিকা সংকলনের ব্যাপারে সা'দ বিন ওবায়দাহ (রাঃ) একই ভূমিকা পালন করেন।

রাসুল (সঃ)-এর ওফাতের পর হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় স্তরে যে কোন সমস্যার সমাধান আল-কোরআন অথবা রাসুলের (সঃ) কিছু রায় বা কথার ভিত্তিতে সমাধান করা হত যা ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছিল।

তৃতীয় স্তরে হাদীস ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সমষ্টিগত পর্যায়ে চলে যায় অর্থাৎ হাদীস মুখে মুখে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হাদীস সংগহ ও লেখা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়। ইমাম মালেক, ইবনে যুরাইজ, সুফিয়ান সাউরী, ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হাদীস সংকলন করে পরিচিতি লাভ করেন।

চতুর্থ স্তরে অতঃপর চিরস্থায়ী আকারে সংকলিত হাদীস সমুহ মাসানিদ, মুসান্নাফাত তথা বিষয়বস্তু অনুসারে শ্রেণীবিণ্যাস করা হয়েছে যেমন ইমাম মালেকের মুয়াত্তা। সর্বশেষ স্তরে আমরা লক্ষ্য করি যে, হাদীসসমুহ একত্রে সংকলিত হয়েছে: সিয়াসিত্তা হচ্ছে হাদীসের সবচেয়ে প্রামাণ্য সংকলন।

শ্রেণী বিভাগ:

বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ হাদীসের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা প্রণালীবিদ্যা, আইন বিজ্ঞানী, ধর্মতত্ত্ববিদ ও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। উসুল-আল-ফিকহ্-এর নীতিমালার ভিত্তিতে আইন বিজ্ঞানীগণের বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপন হাদীস বিজ্ঞানকে আইনের একটি প্রাথমিক উৎস হিসেবে গণ্য করেছে। প্রাথমিক স্তরে সার্বজনীন ভাবে গৃহীত নীতিমালার ভিত্তিতে একটি হাদীস, হাদীসে কাওলী হতে পারে অর্থাৎ রাসুল (সঃ) যা কিছু বলেছেন তার বিবরণ - অথবা হাদীসে ফেলী অর্থাৎ রাসুল (সঃ) এর কার্যাদীর দলিল: অথবা হাদীসে তাকরীরি অর্থাৎ কিছু কাজের বর্ণনা যা সাহাবীরা রাসুলের (সঃ) উপস্থিতিতে সম্পাদন করেছেন এবং সে সব কাজকে রাসুল (সঃ) নিষেধ না করে বরং মেনে বা প্রকাশ্য সম্মতি দিয়েছেন।

ধারাবাহিকতা বা ইত্তিসালের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থাৎ সর্বশেষ বর্ণনাকারী থেকে রাসুল (সঃ) পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা বা প্রবাহের সম্পূর্ণতার দিক থেকে আইনতত্ত্ববিদরা সুন্নাহকে চার ভাগে ভাগ করেছেন।

ক. মুতাওয়াতির:

নির্ভুল বা সন্দেহাতীত হাদীস যার বর্ণনাকারীদের প্রবাহ সঠিক এবং

বর্ণনাকারীদের সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। অন্য কথায় কিছু অনির্দিষ্ট সংখ্যাক লোকের প্রদত্ত- তথ্য যা তাদের সংখ্যাধিক, নির্ভরযোগ্যতা এবং আবাসস্থলের ভিন্নতার কারণে মিথ্যা হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। কতিপয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলেন যে, এরূপ হাদীসের সংখ্যা খুবই কম কিন্তু অন্যান্যরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। একটি মতানুসারে কোন একটি তথ্য বা সংবাদকে মুতাওয়াতির বলা যাবে না যদি না এর বিষয়বস্তু সত্য প্রমাণিত বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিশ্বাসযোগ্য হয়। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মুতাওয়াতির শব্দটি কেবল মাত্র ঐ সংবাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যা বহুসংখ্যক সংবাদদাতার কারণে আবিশ্বাসের প্রেরণা দান করে।

খ. মাশহুর:

যখন কোন সংবাদ বা তথ্য মৌলিকভাবে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সমর্থিত কিন্তু পরবর্তীতে রাসুলের (সঃ) সাহাবীদের উত্তরসূরী কতিপয় অনির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে এবং যাদের মতানৈক্য মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধারণা বিশ্বাস করা অসম্ভব তখন সে সংবাদ বা তথ্যকে হাদীসে মাশহুর বলা হয়। ইহা আবশ্যকীয় যে, সংবাদ বা তথ্যকে রাসুলের প্রথম বা দ্বিতীয় বংশধরদের সময়কালের মধ্যে বিস্তৃত হতে হবে, পরে নয়। সাধারণ মতানুসারে মাশহুর হাদিস কোন ব্যক্তি বা আহাদ হাদিসের উচ্চে অবস্থান করছে এবং ইহা গ্রহণ না করা অপরিহার্য রূপে ভুল বা অন্যায় যদিও ইহা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বিশ্বাস নয়। ইহা দৃঢ় বিশ্বাসকে বিপদাপন্ন করে কিন্তু ইতিবাচক জ্ঞান বা ইয়াকীনকে কোন ক্ষতি করতে পারেনা।

গ. খবর আল ওয়াহিদ :

মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণনা করার জন্য যতজন বর্ণনাকারী প্রয়োজন তার থেকে কম এক বা একাধিক বা দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারী কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদ বা তথ্যকে খবর আল ওয়াহিদ বলে। এই হাদিস কোন ইতিবাচক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করে না কিন্তু মানুষের আচরণবিধির উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। হানাফী আইনবিদগণ এই মতের সমর্থক। অপর দিকে কতিপয় মুহাদ্দিস অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ব্যক্তিগত তথ্য জ্ঞানকে বিপদাপন্ন করে কারণ ইহা মানুষের আচরণের উপর দায়-দায়িত্ব আরোপ করে। এ ছাড়াও আরো কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন যে, ইহা মানুষের আচরণের উপর কোন বাধ্য বাধকতা আরোপ

করে না। কারণ মানুষের আচরণ শুধুমাত্র জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। [illegible] ফকিহ্গণের দৃষ্টি ভঙ্গি কোরআন, ইজমা ও কিয়াসের আইনগত সাক্ষ্য [illegible] সমর্থিত।

ঘ. খবর আল মুনকাতি :

যে সকল খবর বা তথ্য বর্ণনার দিক থেকে বর্ণনাকারী [illegible] ধারাবাহিকতা বা প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরোক্ত হাদিস [illegible] বর্ণনাকারীদের মত হয়নি সে সকল তথ্যকে খবর আল মুনকাতি বলে। [illegible] আল মুনকাতি দু' প্রকার :

১. জাহির খবর আল মুনকাতি: যখন কোন হাদিসের বর্ণনাকারী [illegible] ধারাবাহিকতা বা প্রবাহ রাসুল পর্যন্ত সম্পূর্ন নয় তখন তাকে জাহির খবর [illegible] মুনকাতি বলে।

২. বাতিন খবর আল মুনকাতি: যখন কোন তথ্য বা খবর নিজেই [illegible] থেকে শক্তিশালী কোন সাক্ষের সাথে পরিপন্থী হয় তখণ তাকে বাতিন বা [illegible] খবর আল মুনকাতি বলে। এই ধরনের খবর চারটি কারণে হতে পারে : [illegible] যখন তথ্যটির সাথে কোরআনের পরিপন্থী হয়। (খ) যখন প্রতিষ্ঠিত সুন্না[illegible] সাথে বিরোধ হয়। (গ) ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে স্বীকৃতি অর্জনে ব্যর্থ হ[illegible] (ঘ) যখন ইহাকে সাহাবীগণ কর্তৃক প্রকাশ্যে বাতিল বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, কোন একটি ব্যক্তিগত হাদিস[illegible] হাদিসে আহাদ সহী হতে পারে যদি বর্ণনাকারী মুত্তাকি ও ন্যায়ানুগ [illegible] অভ্যাস-আচরণে সংযমী হন, প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হন, নিন্দা ও অপবা[illegible] থেকে মুক্ত হন এবং প্রতিবেশীর সাথে শান্তিতে বসবাস করেন।

হাদিস বর্ণনার যোগ্যতা ও শর্তাবলী:

হাদিস বর্ণনাকারী বা রাবী দুই প্রকার যথা মারুফ বা সুপরিচিত এব[illegible] মাযাহুল বা অপরিচিত বা কম পরিচিত। যাহারা অনেক বেশী হাদিস বর্ণ[illegible] করেছেন তাদেরকে মারুফ বা সুপরিচিত বলা হয় এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত ক[illegible] হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদেরকে মাযহাল বা কম পরিচিত বলা হয়। সুপরিচিত রাবীগণ একই সাথে ফকীহ্ ও বর্ণনাকারী বা শুধুমাত্র বর্ণনাকারী হতে পারেন। ফকীহ্ বর্ণনাকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রথম চার খলিফা, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ,

আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু মুসা আল আশারী ও আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ। তাদের বর্ণনাকৃত হাদিসসমূহ কিয়াসের অনুগামী হোক বা না হোক গ্রহণ করা হতো। ফকীহ্ না এমন বর্ণনাকারীদের মধ্যে ছিলেন আবু হুরায়রা (রা:) অন্যতম এবং তাদের হাদিস কেবলমাত্র কিয়াসের অনুগামী হলেই গ্রহণ করা হতো। হাদিস সংকলন ও সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, কিভাবে কাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, যাহাদের নিজেদের কোন অক্ষর জ্ঞান সম্পর্কে স্বাভাবিক প্রবনতা ছিলনা যদিও তারা প্রতিটি প্রশ্নের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আরো লক্ষনীয় যে, এতদসংক্রান্ত জ্ঞানের ব্যাপারে কোন কিছু অবশিষ্ট ছিল না : কিভাবে ব্যক্তিগত স্মৃতি শক্তিসমূহ প্রস্তুত ছিল, তারপর এলাকাভিত্তিক, প্রাদেশিক এবং ব্যাপক সংকলন কিভাবে রাসুল (সঃ) এর কথা ও কাজ সংক্রান্ত সকল পর্যাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। কিভাবে হাদিসের সঠিকত্ব ও তার শুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিস্কার করা হয়েছিল। বর্ণনাকারীগণের বা রাবীগণের বিশেষ জীবনী অভিধান প্রনয়ণ করা হয়েছিল এবং এ গ্রন্থ সংকলনের বিষয়, ঐতিহাসিক ন্যায় সংগত বিষয় এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়েছিল। প্রথম থেকেই জন শ্রুত সাক্ষ্য পরিহার করার জন্য হাদিসের প্রামাণ্যতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে পাশ্চাত্য পন্ডিতদের মন্তব্য দৃষ্টিকটু, আপত্তিকর ও অপ্রসংশনীয়। কোরআন এবং হাদিস একত্রে উসুল-উল-উসুল অথবা আইনের ঐতিহাসিক ও বস্তুগত উৎসের ভিত্তির ভিত্তি যার সর্ব্বোচ্চ আইনগত কর্তৃত্ব রয়েছে।

৩. ইজমা

যেহেতু আল্লাহর বানী এবং হাদিস উসুল-উল-উসুল সেহেতু আইনবিদগণ একথা জোরালোভাবে সমর্থন করেন যে, যেহেতু আল্লাহ্ আমাদের নিকট কোরআন নাযিল করেছেন সেহেতু তিনি আমাদের উহা উপলব্ধি করার মত মেধা দান করেছেন; এবং তিনি চান না যে, আমরা সর্তকতা এবং অধ্যায়ন ছাড়াই কোরআন বুঝি। কঠোর চেষ্টাসাধনার নীতির আওতায় আল-কোরআন এবং সুন্নাহ্ আইনের বিষয় বা উপাদান সরবরাহ করে। মুজতাহিদ ও আইনবিদগণ যথার্থ কর্তৃত্বমুলক বিবৃতি প্রদান করে ইহার কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই যথার্থ বিবৃতির সব থেকে সঠিক প্রকার হলো ইজমা, তথা সব

গুলো বা অন্তত একটি মাযহাবের আইনের উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সার্বজ
ঐক্য মত। ইহা আইনগত বিপ্লবের ক্ষেত্রে একটি যথার্থ প্রতিদান । প্রত্যক্ষ
আল-কোরআন বা সুন্নাহতে বর্ণিত সকল ক্ষেত্রে নয় বরং উসুল-উল-উসু
মূলনীতির ভিত্তিতে সকল ক্ষেত্রে আইন বিজ্ঞানীগণের প্রভাবে প্রভাবিত
ইজমা সকল পরিবর্তিত পরিস্থিতি, সময় ও ব্যবহারিক জীবনের সকল চা
পূরণের জন্য সম্ভাব্য পরিবর্তন সাধন করেছিল।

ইজমার সংজ্ঞা ও ভিত্তি:

বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ঐক্য মতকে আইন বিজ্ঞানীগণ শরীয়ার তৃতীয় উ
হিসেবে গন্য করেছেন এবং এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, শরী
সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট যুগের মুসলিম আইন বিজ্ঞানীগণের ঐ
মত। কোন সভা কর্তৃক নির্ধারণ ছাড়াই সহজাত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে
আর্বিভাব ঘটেছে। যখন প্রকৃতপক্ষে সচেতনভাবে কোন ঐক্যমতকে ইজ
হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে কেবল তখনই কোন বিষয়ে ইজমার অ
উপলব্ধি করা যায়। ইহা ইসলামী আইনের একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরি
হয়েছে। শরীয়ার নির্দেশিত পন্থায় আইনগত ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আইন
নতুন নতুন দিক উন্মোচনের প্রয়াসের দ্বারা সময় ও অবস্থার দাবী অনুস
মানুষের প্রয়োজনে ইহা জনসাধারণের নিকট পৌছেছিল। আইনগত বি
চিন্তা ও বিশ্লেষণের জন্য শরীয়াহ প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে ইজতিহাদ ক
জন্য মুজতাহিদগণের যে সকল গুনাবলী থাকা আবশ্যক সে সকল গুনাব
যাদের মধ্যে ছিল তারাই ইজমা সম্পাদন করেছিলেন। মোটকথা ইসলা
সার্বজনীন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে ইজমা বলা হয়।

আইনের উৎস হিসেবে আল-কোরআন ও সুন্নাহতে ইজমা করার বৈধ
রয়েছে। আল-কোরআনে বলা হয়েছে: -"এমনি ভাবে আমি তোমাদেরকে সঠি
পথের অনুসারী জাতি বানিয়েছি" (বাকারাহ-১৪৩)।

আরো বলা হয়েছে যে "কেউ রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে তার কা
সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরু
চলে, আমি তাকে ঐদিকেই ফিরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তা
জাহান্নামে নিক্ষেপ করব আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান "(আন-নিসা-১১৫
আক্ষরিক এবং আভিধানিক অর্থে ইজমা শব্দের অর্থ হচ্ছে সিদ্ধান্ত এবং ঐ

যার ভিত্তি - আল-কোরআন হতে উৎসারিত যখন ইহা মুসলমানদের উপদেশ
দিয়ে বলছে, "যারা তাদের পালন কর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম
করে, পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক
দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে "(আশ- শূরা-৩৮)। পবিত্র কোরআনে আরো বলা
হয়েছে যে, "এবং কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন; অতঃপর যখন
কোন কাজের সিদ্ধান্ত করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করুন।
আল্লাহর তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন "(আল-ইমরান ১৫৯)। ইজমার চূড়ান্ত
ভিত্তি - আল-কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণ স্বরূপ
কোরআনে বলা হয়েছে, " হে ইমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসুলের
আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের আনুগত্য কর
অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবিষ্ট- হয়ে পড়, তাহলে তা
আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর প্রত্যার্পন কর- যদি তোমরা আল্লাহ, ও
কিয়ামত দিবসের উপর ইমান রাখ। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিনতির
দিক দিয়ে উত্তম" (আন-নিসা-৫৯)। এ ছাড়াও আরো বলা হয়েছে, "তোমরা
সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর : পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"
(আল- ইমরান -১০৩)। রাসুল(সঃ) এর হাদিসেও ইজমার পক্ষে পূর্ণ সমর্থন
পাওয়া যায়, যেমন তিনি বলেন "আমার অনুসারীগণ কখনো মিথ্যা বা ভূলের
উপর একমত হবে না অথবা আল্লাহর হাত সংঘবদ্ধ দলের সাথেই আছে"।
এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেঈ বলেন "মুসলমানরা সম্প্রদায়ভূক্ত হবার জন্য একত্রিত
হয়েছে কারণ নিঃসঙ্গ ব্যক্তি অন্যায় কাজ করতে পারে এবং মুসলিম উম্মাহ
এরূপ অন্যায় কাজ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত"। ইহা সত্ত্বেও কতিপয়
আইনবিদ ইজমার কর্তৃত্ব এই যুক্তিতে অস্বীকার করেছেন যে, যেহেতু কোন
নির্দিষ্ট সময়কালের জীবন্ত কোন মুজতাহিদের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না
সেহেতু ইজমার অস্তিত্ব নির্ধারণ করা অসম্ভব। তারা অবশ্য মেনে নিয়েছেন
যে, মুয়ায বিন জাবালের সাথে জড়িত বিখ্যাত হাদিস এ বিষয়ে নিরব।
তৎসত্ত্বেও ইজমার ব্যবহার ঐতিহাসিক এবং উপকারী। রাসুল(সঃ) এর উদ্ভাবিত
পারস্পরিক পরামর্শ ও সাংবিধানিক পদ্ধতি এবং সঠিকভাবে পরিচালিত
খলিফাগণের পদ্ধতি বিজ্ঞান ইজমাকে সার্বিকভাবে ও সম্পূর্নরূপে প্রমাণ
করেছে। শীয়া সম্প্রদায় তাদের ইমামতের মতবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য

ইজমাকে অভ্রান্তর বলে এবং আইনে গনতান্ত্রিক আর্দশের জন্য এ
প্রতিষ্ঠিত সংবিধান অপরিহার্য এ বিষয় অস্বীকার করেছিল। তাদের
বিজ্ঞ-জনদের মতামতের উপর একমত হবার পরিবর্তে ইমামত মতাদ
শ্রেষ্ঠত্বের কারণে রাসুলের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা আবশক।

ইজমা গঠনের উপাদান:

ইজমার সমন্বয় সাধনের প্রস্তাব এবং নতুন পরিস্থিতির আলো
বিতর্কিত বিষয়াবলী রহিত করার গুনাবলী থাকা সত্ত্বেও যে সকল বি
ইজমা প্রতিষ্ঠা করা খুব জটিল সে সকল প্রশ্নে কিছু মত পার্থক্য বিদ্য

আইনবিদগণ ইহাকে মুসলমানদের উপর আল্লাহ্‌র রহমতের নি
হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন; রাসুল (সঃ) এর এই হাদিসের উপর ভিত্তি করে
"আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমতের নি
স্বরূপ"।

ইজমা গঠনে যোগ্য ব্যক্তি:

প্রত্যেক মুজতাহিদের মতামত অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যদি
অধার্মিক বা ইসলাম বিরোধী না হন। এখানে উল্লেখ্য যে, ইজমা গঠনের বি
উপর যদি কোন রায়ের প্রয়োজন না হয় ক্ষেত্রে ইজমা গঠনকারী ব্যক্তি
মুজতাহিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন আল-কোরআনে অবতীর্ণ বিষ
প্রত্যেক মাযহাবে বাধ্যতামূলক হিসেবে স্বীকৃত মৌলিক বিষয় যেমন দৈনিক
ওয়াক্ত নামাজ ইত্যাদি বিষয়ে যদি ইজমা করার প্রয়োজন হয় তবে ইজমা কা
মুজতাহিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে বিচার বা রায় সংক্রান্ত বিষয়ে ই
গঠনকারীকে অবশ্যই মুজতাহিদ হতে হবে।

এসকল বিষয়ে ইজমা গঠনের জন্য ইহা আবশ্যকীয় যে, খাস
মুজতাহিদগণের এবং আম বা সাধারণ মানুষের উভয়েরই একত্রে ঐক্য
পৌছানো উচিত। সুতরাং যদি কোন সাধারণ বা অদক্ষ মানুষ মুজতাহিদ গ
সাথে মতানৈক্য পোষণ করে তাহলে ইজমা গঠন ব্যর্থ হবে কিন্তু এমনটি ক
ঘটেনি।

অপরপক্ষে, যদি কোন বিষয়ের উপর ইজমা গঠন করতে হয় আর
বিষয়টি এমন হয় যে উহার জন্য গভীর চিন্তা প্রসূত মতামত এবং রায় প্রয়ো

যেমন লেন-দেন, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইনগত প্রশ্নে ইজমা গঠনের জন্য মুজতাহিদ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের অংশ গ্রহণের নিমিত্তে সম্মেলন আহবান করতে হবে নির্দিষ্ট ঐক্যমতে পৌছানোর জন্য। ফলাফল হচ্ছে যে, যদি সাধারণ তথা অদক্ষ মানুষ মুজতাহিদ বা বিশেষজ্ঞগণের সাথে মতানৈক্য পোষণ করে তাহলে ইজমার উপর কোন প্রভাব পড়বে না; প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, যখন সকল মুজতাহিদগণ একটি বিষয়ের উপর একমত হন তখন সাধারণ লোকও একমত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, ইজমার ক্রিয়াকে সংকুচিত করা বা যথোচিত নয়। ইজমা গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তির সংখ্যার প্রশ্নে, একথা বলা যায় যে, ভিন্নমত পোষণকারীদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও ইজমা গঠনের যোগ্যতা সম্পন্ন নির্ধারিত অধিকাংশ লোক, যদি তাদের সর্বনিম্ন সংখ্যা তিনও হয় তবে ইজমা গঠন অনুমোদিত হবে। যদিও ইসলাম প্রতিটি সিদ্ধান্ত অধিকাংশ লোকের মতের ভিত্তিতে গ্রহণের পক্ষপাতি, তবুও ইহার অর্থ এই নয় যে, ইজমার পদ্ধতির সাহায্যে নির্ধারিত ব্যক্তিগণ সর্বোত্তম হবে না। ইজমার সাহায্যে আইনগত উন্নয়ন ঘটাতে হলে সমগ্র শরীয়ার নীতি ও বিধিমালা কর্তৃক প্রদত্ত কাঠামোর আলোকে ইহার ক্রমোন্নতি ঘটাতে হবে।

ইজতিহাদ করার জন্য ইজমা একটি ব্যাপকতম কৌশল। ইসলামী আইনের মৌলিক নীতিমালা যেন লঙ্ঘিত না হয় সেজন্য নিরাপদ কৌশল অবলম্বনের জন্য কোন বিষয়ে ইজমার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এতদ্বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সুযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। নির্ধারিত ব্যক্তিগণকে মুসলিম উম্মাহর পক্ষে তাদের জ্ঞান, সততা ও সত্য বাদীতার জন্য সনদ প্রাপ্ত বা নিযুক্ত হতে হবে। অন্য কথায়, তাদেরকে কোরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত ফিকাহ্ বিজ্ঞানে পন্ডিত হতে হবে,বিশেষ করে, হাদিসবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, সাহাবীগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্মপন্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগতি, আইন বিজ্ঞানে আলোচিত আইনানুগ যুক্তিসম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান, জনগণের জাতীয় এবং সাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান এবং জনগনের প্রচলিত ও প্রথাগত পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুভূতি এবং আধুনিক মানবিক উন্নয়নের সাথে সমসাময়িক চাহিদা সম্পর্কে সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান এবং একত্রে চিন্তা করার পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।

তাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনে তাদেরকে ন্যায়পরায়ন, সঠিক পথের

অনুসারী, ধার্মিক,পার্থিব নিন্দা থেকে মুক্ত এবং নিজস্ব মতামতের যুক্তি
অগ্রাধিকার প্রদানের মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে ।

সংক্ষেপে বলা যায়, ইজমা গঠন একই পদ্ধতির অধীনে ধর্মীয় আদেশপূর্ণ
পরিবেশকে স্বাগত জানায়। অধিকাংশ আইনবিজ্ঞানী গণের মতে, প্রমাণ বা সাক্ষ্য
ব্যতিত কোন ইজমার আবির্ভাব ঘটতে পারে না । ইহার কারণ খুবই সাধারণ
অন্তত ইহা স্পষ্ট যে ,ধর্মীয় কোন বিষয়ে, প্রমাণ বা সাক্ষ্য ব্যতীত কোন মতামত
ভ্রান্তিপূর্ণ। এতদ্‌সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করা হয় যে, কোন কর্তৃত্ব ছাড়া গঠিত ইজমা
অর্থাৎ যে ইজমা শরীয়াহ্ নির্ধারিত উপাদানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়
তা বৈধ হতে পারে, কারণ আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর অনুসারী সম্প্রদায়কে সঠিক
পথে পরিচালনা করেন এবং আরো কারণ হচ্ছে , যদি ইজমার জন্য কর্তৃত্বপূর্ণ
প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তবে ইজমার ভবিষ্যতে স্বাধীন প্রমান হিসাবে
তেমন কোন ব্যবহার থাকবেনা । বলা যায় যে, ইহা সঠিক নয় কারণ, রাসূল (স)
নিজে কখনো ঐশী প্রত্যাদেশ দ্বারা অনুপ্রাণীত হওয়া ব্যতীত বা উহার উপর ভিত্তি
করে অবরোহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন কথা বলতেন না। সূত্র
তুলনামূলকভাবে প্রমাণের উপরে ভিত্তি করে কথা বলাই মুসলিম জাতির
শোভনীয়। অধিকন্তু ইহা স্বীকৃত যে, ইজমাতে অবশ্যই প্রমাণ থাকতে হবে:
প্রতিকূল ধারণা বা অনুমানের উপরে নির্ভরশীল মতামত কেবল ধর্মমতে বি
মতাবলম্বীদের জন্য শোভা পায়। তাঁরা ইজমাকে স্বাধীন প্রমাণ বা সাক্ষ্য হিসে
ব্যবহার করেন, কারণ, তারা উল্লেখ করেন যে, যে বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়
একই বিষয়ে মতবিরোধ বা বিতর্ক অনুমোদিত নয়। কারণ, ইজমার সাহা
কোন বিষয় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, উহা কোন সন্দেহ সংশয় অনুমো
করে না। সুতরাং ইজমা গঠনের জন্য মতামতের কর্তৃত্ব বা প্রমাণ সম্ভাব্য
দলিলে জন্ন যেমন, কিয়াস হতে পারে: অথবা ইহা কোন ব্যক্তিগত সংবাদ
তথ্য হতে পারে অথবা ইহা কোরআনের আয়াত বা মুতাওয়াতির প্রকৃতির
সুন্নাহর মত ইতিবাচক প্রমাণ বা সাক্ষ্য হতে পারে।

ইহা উল্লেখ করা যায় যে, ইজমা গঠন পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভরশী
ইজমার ব্যবহারিক গঠন এবং ইহার পদ্ধতি বিজ্ঞান কি হবে ইসলামের ইতিহ
ইহার কোন প্রত্যক্ষ জবাব নেই, তা বলা যায়। প্রাথমিক যুগে মুসলিম ওল
তাদের সময়ে বিদ্যমান পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভর করত এবং তদানু

ইজমার সাহায্যে কাজ করতেন। তারা কোন শত্রু রাষ্ট্রের শাসন বহির্ভূত স্বাধীন
অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত ধর্মীয় বিধিমালার ভিত্তিতে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতেন।
তাদের সকল কাজ ধর্মীয় চেতনা অনুসারে পরিচালিত হতো । ফলাফল সুস্পষ্ট
যে, সমসাময়িক কালে বিদ্যমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইজমার
পদ্ধতি বা প্রনালী বিদ্যা গঠন করা সম্ভব ।

ইজমার ক্রমোচ্চ শ্রেনীবিভাগও বিলোপ:

প্রামাণ্যতার স্তর বা মান অনুসারে ইজমাকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা
যায়। প্রথম স্তর বা সব থেকে শক্তিশালী ইজমা হচ্ছে রাসূলের সাহাবীগণের
ইজমা। সন্দেহাতীতভাবে এধরণের ইজমা কোরআন ও মুতাওয়াতির হাদিসের
অনুরূপ। এ ধরণের ইজমা অস্বীকারকারীকে পুরা পুরি মুসলমান বলা যায় না।
উদাহরণস্বরূপ হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফত, সালাত এবং রোযার বিধান
সংক্রান্ত ইজমা।

দ্বিতীয় স্তরের ইজমাকে ইজমায়ে সুকুত বলা হয়। এ ধরণের ইজমায়ে
কিছুসংখ্যক সাহাবী মতামত ব্যক্ত করেন এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী নীরব ছিলেন।
অর্থাৎ সাহাবীগন কর্তৃক ইজমা গঠন কালে যখন কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রকাশ্য
মতামত ব্যক্ত করেন এবং অপর কিছু সংখ্যক পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মতামত
ব্যক্ত না করে নীরব থাকেন তখন ঐ ইজমাকে ইজমায়ে সুকুত বলা হয় । যদিও
ইহা চূড়ান্ত প্রকৃতির ইজমা তবুও এর অস্বীকারকারীকে ফাসিক বা ধর্মমত বিরোধী
বলা যাবে না।

তৃতীয় স্তরের ইজমা প্রথম ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সাহাবীগণের উত্তরসূরীগণ
কর্তৃক গঠন করা হয় । এইরূপ ইজমার সাথে সাহাবীগণের ইজমার কোন পার্থক্য
পরিলক্ষিত না হলে তার কর্তৃত্ব বা প্রামাণ্যতা মাশহুর হাদিসের ন্যায় গন্য করা হয়
যদিও এর হুকুম চূড়ান্ত নয় তবুও মতামত গঠনের জন্য গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন
করে। চতুর্থ স্তরের ইজমা সাহাবীগণের উত্তরসুরীগণ কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট
বিষয়ের উপর মতামতের ভিত্তিতে গঠন করা হয়েছে । এ ধরণের ইজমার সাথে
সাহাবাগণের ইজমার পার্থক্য রয়েছে । অন্য কথায় বলা যায়,এ ধরনের ইজমার
ক্ষেত্রে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান থাকে যার একটি পরবর্তী যুগের আলেমগণ কর্তৃক
গৃহীত হয়ে থাকে। এ প্রকৃতির ইজমা সব থেকে নিম্নমানের। কারণ ইহাতে প্রমাণ
হিসাবে হাদিসে আহাদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানের দিক থেকে ইতিবাচক

না হলেও এধরনের ইজমা অনুসারে কাজ করা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপা
প্রকাশ্য হুকুম বিদ্যমান। ইহা অবরোহী সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ ক
হয়, যা কিয়াসের থেকে একটি মাত্র প্রমাণের উপর গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে
অনুরূপ। কেবল একই প্রকৃতির ইজমা দ্বারা অপর ইজমাকে বিলোপ করা সম্ভ
সুতরাং সাহাবীগণের কোন ইজমা শুধুমাত্র সাহাবীগণের ইজমা দ্বারাই বাতিল
রহিত করা যায়। তদ্রুপ সাহাবীদের পরবর্তী যুগের বংশধরগণের ইজমা এ
বংশধরগণের ইজমা বা পরবর্তী বংশধরগণের ইজমা দ্বারা রহিত করা যায়। কারণ
সাহাবীদের বংশধরগণের (তাবেই) ইজমা এবং তৎপরবর্তী বংশধরগণের (তা
তাবেই) ইজমাকে মানের দিক থেকে একই গণ্য করা হয়।

ইজমার ক্রিয়া প্রনালী ও ব্যবহার:

কোন একটি বিষয়ে একবার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ একই বিষয়
পুনরায় বিতর্ক অনুমোদিত নয় এবং বিষয়টি চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় যদি ন
উহা উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে বিলুপ্ত হয়। ইজমা গঠন করা হলে উহা শরীয়াহ
আইন এবং আইন বিজ্ঞানের গুরুত্ব অর্জন করে। শরীয়াহ্ এবং আইন বিজ্ঞানে
আল-কোরআনে এবং সুন্নাহ্‌তে বর্ণিত মানব আচরণের সাধারণ নীতিমালা
বাহ্যিক সীমারেখা, এবং ম্যাক্সিম বা সূত্র অন্তর্ভূক্ত আছে। শরীয়াহ্ এবং আই
বিজ্ঞানে বিস্তারিত বিধানাবলী এবং বিশেষভাবে উল্লেখিত বিষয়বস্তু অর্ন্তভুক্ত নেই
এ কারণেই শরীয়াহ পদ্ধতি অন্যান্য সকল উদ্ভাবন প্রণালী থেকে শ্রেষ্ঠত্বে
দাবীদার। পবিত্র বা ধর্মীয় নীতিমালা মানুষের বিবেক ও যুক্তির সাথে সামঞ্জস
রেখে ইজমার সাহায্যে প্রণয়ন করা হয় এবং সেগুলি পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে
স্বয়ংক্রীয়ভাবে খাপ খেয়ে যায়।

চিরস্থায়ী প্রকৃতির বিধিমালার আলোকে প্রণীত আইন ও বিধি সময়
পরিস্থিতির প্রয়োজনানুসারে গৃহীত হবার জন্য পরিবর্তনীয় থেকে যায়। সময়
পরিস্থিতির চাহিদা পূরণের জন্য বিদ্যমান বিধিমালায় বা নীতিমালায় প্রণালী
বিদ্যা-সংক্রান্ত কৌশল বিদ্যমান যা আইন এবং পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সমাজে
মধ্যকার বিরোধ পুনঃমিমাংসার জন্য গ্রহণ করতে হয়। আইনগত সমস্যা
সমাধানের পন্থা হিসেবে ইজমার পশ্চাতে এই প্রণালীবিদ্যা সংক্রান্ত কৌশল
বিদ্যমান। পরিবর্তনশীল যুগের চাহিদা অনুসারে আইন প্রনয়নের মাধ্যমে ইজমা
ধর্মীয় বিধিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত আইনের বাস্তব প্রয়োগের জন্য একটি পদ্ধতি

গ্রহণের জন্য পেশ করেছে। আইনের ঐশী বৈশিষ্ট্যের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন
না করে ইজমা নতুন পরিস্থিতিতে চাহিদা পুরণের জন্য আইন তৈরীর পদ্ধতি
উদ্ভাবন করে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ইজমার প্রণালীবিদ্যা কর্তৃক ইহার ধর্মীয়
নীতিমালায় বিদ্যমান নেই। উল্লেখ্য যে, শরীয়াহ্‌র নীতিমালা চিরস্থায়ী প্রকৃতির নয়
ইহা একাধারে রক্ষণশীল, স্থির, সুপরিবর্তনীয়, এবং প্রকৃতি ও বৈশিষ্টের দিক
থেকে প্রাচীন। এ কারণে শরীয়াতে নমনীয়তা বিদ্যমান এবং মানব জীবনের পথ
ও আচার-আচরণের পরিবর্তিত ধারণার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের যোগ্য। আল-
কোরআন, সুন্নাহ্ ও উসুল-আল ফিকহ্ গ্রন্থ সমুহে ইজমা মতবাদের যথার্থতা
প্রমানের জন্য পর্যাপ্ত উপায়-উপকরণ বিদ্যমান এবং এ কারণে ইজমাকে ইসলামী
আইন ও আইন বিজ্ঞানের তৃতীয় উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একবার ইজমা
প্রতিষ্ঠিত হলে ইহা ইসলামী কর্তৃত্বকে উপাদান গত সুবিধা প্রদান করে। সময়ের
চাহিদা অনুসারে নতুন আইন প্রণয়ন করা যায়। আইনগত ভিত্তি পরিবর্তনের
মাধ্যমে আইনের নমনীয়তা অথবা সরকার ও প্রজাসাধারণের মধ্যে স্বার্থের সমতা
বিধান করা যায়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং কৌশলের ক্ষেত্রে যথার্থ ও মানানসই
সংশোধনী মানুষের জীবনকে নতুন যুগের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে কল্যাণ কর
ভূমিকা রাখতে পারে। প্রাচীন প্রথার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম নীতির
যথাযথ বা মানানসই নীতির সূচনার মাধ্যমে জটিলতাপূর্ণ সমাজের চাহিদা পূরন
করতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে রাসুল(সঃ) এর সাহাবীগণের মতামতের মধ্যে
কোন পার্থক্য ছিল না সে সকল ক্ষেত্রে যে কোন একটি মতামত গ্রহণ করে ইজমা
গঠন করা যায়। এ ছাড়াও প্রাথমিক যুগের আইন বিজ্ঞানীদের মতামত আনু-
পাতিক হারে গ্রহণ করে ইজমা গঠনের মাধ্যমে আধুনিক যুগের দ্বন্দ্ব সমূহের
অপেক্ষাকৃত পছন্দ সই যথার্থ সমাধান দেয়া সম্ভব। ইসলামী আইন ব্যবস্থায়
ইজমার লক্ষ্য - উদ্দেশ্য ও স্থান ব্যাপক এবং সব থেকে বেশী কার্যকর। ইহা
মানব জীবনের একটি ব্যবহারিক দর্শন এবং এর বিরোধিতা অবৈধ। জন
সাধারণের মধ্যে একটি ভূল ধারনা আছে যে ইজমা গঠনের জন্য মুসলিম উম্মহ্‌র
সকল সদস্যের অংশগ্রহণ আবশ্যক এবং এ কারণে ইহা স্বীকৃত যে আইনগত
সমস্যা সমাধানে ইজমার অনুশীলন বা চর্চা সম্ভব নয়। জনসাধারণ যে প্রনালী
বিদ্যা চর্চা অনুসরণ করছে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু ইতিহাসে এর কোন প্রমাণ নেই।
ইতিহাস এর বিরুদ্ধে বিবৃতি দেয় যে, প্রখ্যাত আইন বিদগণ, মুহাদ্দীসীন, এবং

আহলে আল- হাল্লে ওয়াল আক্‌দ বা রাষ্ট্র পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণ নির্ধারিত আইনগত সমস্যার দ্বন্দ্ব পুনরায় সমাধানের কাজ সম্পাদন করতেন। খলিফা ওমর (রঃ)কর্তৃক গৃহিত প্রশাসনিক, বিচারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিতে ইহার নজীর পরিলক্ষিত হয়। নজীরের অনুপস্থিতিতে খলিফা পারস্পরিক ও বিচারিক পরামর্শ নীতির ভিত্তিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে ইজমার সাহায্যে বিতর্কিত বিষয় সমাধান করতেন। তিনি মদিনায় সাত জন আইন বিজ্ঞানীর একটি কমিটি গঠন করেন এবং সকল জটিল আইনগত সমস্যা তাদের নিকট সমাধানের জন্য পেশ করা হতো এবং এতদ বিষয়ে তাদের আইনগত মতামত সকল অধীনস্থ ও মুসলিম রাজ্যের সকল কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতামূলক ছিল।

ইহা পরিলক্ষিত হয় যে ইজমা এবং এর গঠন যত কঠিন মনে করা হয় তত কঠিন নয়। সমগ্র মুসলিম জাতির বৃহত্তম স্বার্থে এবং কল্যাণার্থে নীতি গ্রহণের জন্য ইহা মুসলমান এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সার্থকতা এবং গভীর ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দিপনার উপর সার্বিক ভাবে নির্ভরশীল।

৪. কিয়াস:

যে সময়ে একটি অপরিবর্তনীয় পদ্ধতিকে আইন কঠিনরূপ দান করেছে সে সময়কাল পর্যন্ত সকল মাযহাবের বিখ্যাত আইন বিজ্ঞানীগণ জ্ঞাত মানুষের নিকট থেকে অজ্ঞাত মানুষের নিকট পৌছানোর জন্য আল- কোরআন ও সুন্নাহর অর্ন্তনিহিত অর্থ বা তাৎপর্য উন্নয়ন এবং বিকাশ ঘটানোর জন্য মানুষের নিকটও যুক্তি ব্যবহারের উপর নির্ভর করতে বাধ্য ছিল। হানাফী মাযহাবের ফকিহগণ অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় অনেক বেশী এরূপ করেছিলেন। কিন্তু সকলে বস্তুগত বা উপাদানগত উৎসের উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত মতামতের উপর ভিত্তি করে আইন প্রণয়নে উদ্দোগী ছিলেন তবে তারা মানের তারতম্যের ক্ষেত্রে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ইহা ছিল একটি অবরোহী পদ্ধতি যার সাহায্যে কোন বিষয়ে মূল আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভাষাগত অর্থে প্রয়োগযোগ্য নয় কিন্তু উহা যুক্তির আলোকে প্রয়োগযোগ্য।

মতবিরোধ:

আরবের দক্ষিণে সিরিয়া এবং পূর্বে ইরাকে ইসলামের বিজয় এবং প্রসারের সাথে ঐসব অঞ্চলের বিচিত্র কৃষিকাজ ও সামাজিক অবস্থার কারণে ইসলাম আরবের আইনের দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির আইনের সংস্পর্শে আসে।

এজন্য ইসলামী আইনকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয়। নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে উহা সমাধানের জন্য কোরআনে, সুন্নাহতে বা ইজমায় কোন তথ্যের যোগান পাওয়া যেত না। বিচারক এবং মুফতিগনকে ধর্মীয় বিধিমালার মূল নীতিকে অক্ষুন্ন রেখে ব্যক্তিগত মতামতের ব্যবহারের দ্বারা সমস্যাকে সমাধান করতে হতো। এ কাজে তারা সামগ্রিক ভাবে স্বাধীন ছিলেন না কারণ তাদেরকে বৈজ্ঞানিক নীতিমালা এবং ভূমিকার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হতোএবং তাদের উদ্ভাবিত নতুন এইপদ্ধতি শরীয়ায় কিয়াস নামে স্থান লাভ করে। উপরোক্ত ক্রমবিকাশ আইনে দুটি ভিন্ন মতাদর্শ বা মতবাদের সূচনা করে। হাদিস সংস্থাসহ ধর্মের উৎপত্তির শহর মদিনা এবং মক্কার আইন বিজ্ঞানীগণ হাদিস সংরক্ষন ও অধ্যায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন .আইনগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে তারা কিয়াসের ব্যবহার ব্যতীত সমাধানের জন্য তাদের বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট অর্পণ করতেন। আরবের বাহিরের ভূখন্ড বিশেষ করে ইরাকের আইন বিজ্ঞানীদের জন্য ইহা যথার্থ ছিলনা। সেখানকার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন এবং সেখানে বসবাসরত আইন বিজ্ঞানীগণ আনেক দূরে থাকার কারণে এবং হাদিসে মক্কা ও মদিনার জনগণের ন্যায় গভীর জ্ঞান সম্পন্ন না হওয়ার কারনে নতুন পরিস্থিতিতে ব্যাপকহারে ব্যক্তিগত মতামত বা রায়ের উপর ভিত্তি করে কাজ করতে হতো। এ কারণে তাদেরকে বলা হতো "রায় পন্থী"বা "আহল আল রায়"। ইহা হিজাজের আইন বিজ্ঞানীগণ হতে পৃথক ছিল যারা "হাদিস পন্থী" বা "আহল আল হাদিস" হিসেবে খ্যাত ছিলেন ইহা কালের বিবর্তনে দুটি পৃথক নামে প্রসিদ্ধ পরস্পর বিরোধী মতবাদে রূপ লাভ করে।

কিয়াসের সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থে "কিয়াস" শব্দের অর্থ আনুমান করা বা ধারণা করা বা পরিমাপ বা তুলনা করা এবং আইনের ভাষায় ইহা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে অবরোহী পদ্ধতিকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে কোন বিষয়ে মূল আইন প্রয়োগ করা যায় যদিও উহা ঐ একই বিষয়ে ভাষাগত অর্থে প্রয়োগ যোগ্য নয় কিন্তু যুক্তি বা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রয়োগ যোগ্য। অন্য কথায় বলা যায়, কিয়াস হচ্ছে মৌলিক বিষয় বা আসলের ক্ষেত্রে নাযিলকৃত নির্দেশীকার উপর ভিত্তি করে নতুন বিষয়ের দিকে শরীয়ার সম্প্রসারন করা যেহেতু পরের বিষয়টি পূর্বের বিষয়ের অনুরূপ। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে, কোরআন এবং সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান দ্বারা মদ্যপান

নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো মদপানের প্রমত্ততাদায়ক ফলাফল। যদি ব
করা হয় যে, মদ বা বিয়ার বা মাদক জাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধ করা হয়নি । তবে পবি
হাদিসে আছে যে, "প্রত্যেক প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী বস্তুই মদ এবং প্রত্যেক মদ
নিষিদ্ধ "(সহীহ্ মুসলিম্: ৬ষ্ঠ খন্ড/১০১)। যে কোন ব্যক্তি এই হাদিস দ্বারা সাধার
ভাবে কিয়াসের মাধ্যমে কোন বস্তুকে মদপানের সমকক্ষ করতে পারে, য
সেবস্তুটিতে প্রমত্ততা সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ যদি কোন বস্তুতে প্রমত্ততা না থাকে তাহ
সে বস্তুতে কোন নিষেধাজ্ঞা থাকবে না । যে সকল কার্যাবলীর মধ্যে প্রকৃত স্
নিহিত আছে তা প্রকাশ্যভাবে বা অপ্রকাশ্যভাবে নিষেধাজ্ঞামূলক বিবৃতির মা
অর্ন্তভূক্ত করা উচিত নয় কারণ নিষেধাজ্ঞামূলক বিবৃতির মাধ্যমে নিষিদ্ধ হয়ে যে
পারে তবে কিয়াসের বলে নয়। কিয়াসের গুরুত্ব ইজমার মতই এবং এ
প্রয়োজনীয়তা ব্যবহারের মধ্যেই নিহিত। পরিবর্তনশীল মানব সমাজের চাহি
পূরনের লক্ষে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য আইনগত উন্নয়নের উদ্দে
আঙ্গিকে ইহা একটি কৌশল বা যুক্তি। শরীয়ার মৌলিক উপাদানই এর ভিত্তি
সুসজ্জিত করেছে এবং এ সকল নীতিমালার ভিত্তিতে পবিত্র শরীয়াহ্ সকল সমা
জন্য একটি চিরস্থায়ী পদ্ধতিতে পরিনত হয়েছে ।

কিয়াসের মৌলিক ভিত্তি :

কিয়াসের ব্যাপারে সঠিক অভিযোগ একটি প্রশ্নের উপর প্রতিষ্ঠিত
কিয়াস আইনগত বিষয়ে বৈধ না জ্ঞানগত বিষয়ে বৈধ? শিয়া এবং খারি
সম্প্রদায়ের মত হ'ল, কিয়াস কেবল শরীয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনুমোদি
হাম্বলী মাযহাব আইনগত বিষয়ে এর ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে কিন্তু বুদ্ধি
বিষয় নির্নয়ের ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছে। জাহিরী মতাবলম্বীরা বলেন যে, ই
অত্যাধিক যুক্তিসঙ্গত হওয়ার কারণে বুদ্ধিগত বিষয়ে দলিল গঠনে সহায়তা ক
পারে তবে শরীয়ার কোন বিষয়ে ব্যবহার করা যাবে না। তাঁরা এর স্বপক্ষে পবি
কোরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করেন অর্থাৎ " আমরা তোমার নিকট স
বিষয়ের ব্যাখ্যা স্বরূপ কোরআন অবতীর্ণ করেছি" (আন-নাহল-৬৪)। এছাড়
তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে যুক্তির কোন অবকাশ নেই।
নির্দেশিকা যুক্তির মাধ্যমে প্রয়োগ করা যায় না। তাঁরা কিয়াস প্রসঙ্গে সাহাবী
প্রতিকূল কথাবার্তা উল্লেখ করে এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, কি
মাজহাব এবং ব্যাখ্যার জগতকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিরোধের দিকে পরিচালিত ক

কিয়াসের স্বপক্ষের আলেমগণ কিয়াস গ্রহণের ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহকে দলিল স্বরূপ উল্লেখ করেন। ক. আল্লাহ্ বলেন, "এরূপ সাদৃশ্যতার জন্য আমরা সেগুলোকে মানবজাতির জন্য উল্লেখ করি কিন্তু জ্ঞানীরা ব্যতীত কেউই উপলব্ধি করতে পারে না "(আল-হাসর-২১) এবং "অতএব, হে চক্ষুমান ব্যক্তিরা তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর "(হাশর-২)। "তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না যারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে "(আত-তাওবাহ্-১২২)। উপরোক্ত আয়াত তিনটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কিয়াসের কর্তৃত্ব বা ভিত্তি কোরআন দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে ।

খ. মুয়াজ বিন জাবাল বলেন, যখন আল্লাহর রাসুল (সঃ) তাঁকে ইয়েমেনের গর্ভনর করে পাঠান তখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, যখন কোন সমস্যার উদ্ভব হবে তখন সে কিভাবে সমাধান করবে?

উত্তরে তিনি বলেন যে, আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী সমাধান দিবেন । আল্লাহ্র রাসুল পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করেন যদি আল্লাহ্র কিতাবে কোন দিক নির্দেশনা না থাকে তাহলে তিনি কি করবেন ? এর উত্তরে মুয়াজ বলেন, রাসুলের সুন্নাহ্ অনুসরন করবেন । রাসুল (সঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি রাসুলের সুন্নাহ্তে না পাওয়া যায় তাহলে তিনি কি করবেন ? উত্তরে মুয়াজ বলেন, তিনি মতামত গঠনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন এবং কোন কাজই অমীমাংসিত রাখবেন না। আল্লাহ্র রাসুল তখন তাকে প্রশংসাভরে বুকে মৃদু আঘাত করেন এবং বলেন "প্রসংশা আল্লাহ্র জন্য যিনি তার রাসুলের বার্তাবাহককে এমন সব কাজে নিযুক্ত করেছেন যার প্রতি আল্লাহ্র রাসুল সন্তুষ্ট।"(তিরমিজি, ২য় খন্ড/ ৭৯৪)। আর একটি ঘটনায় রাসুল (সঃ) আবু মুসাকে ইয়েমেনে পাঠান এবং বলেন, "আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে বিচার কর এবং তাতে যদি কোন দিক নির্দেশনা না থাকে তখন তোমার নিজস্ব মতামত ব্যবহার কর।" এসব হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, শরীয়তে কিয়াস করার অবকাশ রয়েছে।

এছাড়াও তাঁরা কিয়াস গ্রহণের সমর্থনে সাহাবীগণের সর্বসম্মত ঐক্য মত উল্লেখ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, অবিরাম চর্চার ফলে কিয়াস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বিশেষ করে উত্তরাধীকার বিষয়ে তাদের পরামর্শ সভায় নিজস্ব মতামত ব্যবহার করে কথা বলতেন যতক্ষণ না হযরত ওমর মতামত ও কিয়াস আকারে যা বলেছেন তদানুসারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। হযরত ওমর কিয়াসের ব্যাপারে

মন্তব্য করেন " তোমরা কি পার্থিব ব্যাপারে ঐ লোকের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না [illegible] লোকের প্রতি রাসূল (সঃ) ধর্মীয় বিষয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন"। খিলাফতের উত্তরাধীকারের প্রশ্নটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তারা তার মতামতের উপর সম্মত ছিলেন। এছাড়াও বিচার কার্য পরিচালনা প্রসঙ্গে হযরত ওমর আবু মুসা আশারিকে লিখিত নির্দেশ দেন যে, "যে সকল বিষয় কোরআন বা হাদিস দ্বারা সমাধান করা যায় না এবং যে সকল বিষয় আপনাকে কিং কর্তব্য বিমূর করে সে সকল বিষয়ে আপনার মেধা ব্যবহার করুন। একই রূপ বিষয় পর্যবেক্ষন করুন এবং কিয়াসের মাধ্যমে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করুন।" মদ পানের শাস্তি নির্ধারণের জন্য যে মামলায় সাহাবীগণের আয়োজিত পরামর্শ সভায় হযরত আলী (রাঃ) বলেন যখন কোন ব্যক্তি মদ পান করে মাতাল হয় এবং ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। এক পর্যায় সে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ে। এ কারণে মদ্যপায়ীকে মিথ্যা অভিযোগকারীর ন্যায় একইরূপ শাস্তি প্রদানের নির্দেশ করা হয়েছে।

অতএব, কিয়াসের সমর্থকগণ বিরোধীদেরকে বলেন যে, কিয়াস শুধুমাত্র খেয়াল- খুশির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়,বরং কিয়াস শরীয়ার উদ্দেশ্যাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, বাস্তব ও স্পষ্ট কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী আইন তত্ত্বের বিজ্ঞানকে প্রকৃতি এবং বৈশিষ্টে চিরন্তন, স্বক্রিয় এবং প্রানবন্ত বিবেচনা করা হয়। এর একটি আলাদা প্রণালী বিজ্ঞান আছে যার উপর ভিত্তি করে মানুষের অভ্যাস ও জীবন যাত্রার প্রণালীর পরিবর্তনের আলোকে নতুন আইনগত সমস্যার সমাধান করা যায়। একাজ সম্পাদনের জন্য কিয়াস প্রদত্ত আইনের উৎসকে স্বয়ং আইনগত প্রণালী বিজ্ঞান কর্তৃক যে ভাবে শর্তারোপ করা হয়েছে. সেভাবে ব্যবহার করা উচিত। কিয়াসকে গৌণ করে দেখা উচিত নয়। আইন প্রদত্ত প্রণালী বিজ্ঞান গ্রহণের সর্বশ্রেষ্ট ও একমাত্র সম্ভাব্য কৌশল। রাসুল (সঃ), সাহাবা বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণ এবং পরবর্তিতে অন্যান্যদের দ্বারা কিয়াস ব্যবহৃত হয়েছিল এবং সমসাময়িক যুগেও এর ব্যবহার করা যায়।

কিয়াস নির্ণয়ের ফলপ্রসূ কারণ বা ইল্লাত:

উপরে বর্ণিত কিয়াসের সংজ্ঞার আলোকে কিয়াসের ভিত্তি চারটি: মৌলিক বা আদি যার সাথে নতুন বিষয়টি তুলনা করা হয়। কিয়াসের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নতুন বিষয় অর্থাৎ অবরোহী পদ্ধতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গৃহীত বিধি এবং সর্বশেষ যে কারণে মৌলিক বিষয় ও নতুন বিষয় [illegible] হয় তার যুক্তি।

অন্য কথায়, কোরআন, সুন্নাহ্ এবং ইজমা দ্বারা সুসমর্থিত মৌলিক ভিত্তিকেই শরীয়তের ভাষায় মুকিসই ইলা বলা হয়. যে বিষয়টি সমাধান করতে হবে তাকে বলা হয় মুকিস এবং কিয়াসের পদ্ধতিতে কাঙ্খিত ফলাফলে পৌছানোর জন্য তুলনা করার বিধানকে ইল্লাত বা ফলপ্রসূ কারণ বলা হয়। পূর্বে উল্লেখিত উদাহরণে মদ পান ছিল মৌলিক বা আদি বিষয়, মদ ছিল নতুন বা সমাধানের বিষয় এবং প্রমত্ততা বা খামর ছিল কারন বা ইল্লা এবং প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী সকল বস্তু নিষিদ্ধকরনের ফলাফল ছিল এভাবে তথা কিয়াসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শরীয়ার বিধান।

ঐশ্বরীক আদেশ অনুসরনের পদ্ধতি:

শরীয়াহ্ আইনের আওতায় মানুষের আচরণ সংক্রান্ত প্রণীত বিধানাবলী সম্বলীত সকল আদেশ সমূহ ঐশ্বরীক প্রকৃতির এবং তাদের উদ্দেশ্য কেবল পার্থিব উন্নতি নয় বরং ভবিষ্যতে পুরস্কার ও নিহিত আছে। নিয়তি বা পূর্ব হতে ভাগ্য নির্ধারনের মতবাদ অনুসারে যে কোন প্রকার আদেশই ঐশ্বরীক কারণ সেগুলো আল্লাহর নিকট হতে উৎসারিত। আদেশ দান করাই আল্লাহর বৈশিষ্ট্য সে কারণে মানুষের বিবেক বা যুক্তি ইহাকে পরিত্যাগ করার অযোগ্য। মানুষের ঐশ্বরীক উদ্দেশ্যের জ্ঞানের পথ ও পন্থা সম্পর্কে প্রশ্নের সমাধান অনুসন্ধানের জন্য ইহা আবশ্যক যে, যে তাত্ত্বিক অংশের উপর নির্ভরশীল তা উপলব্ধি করা উচিত, কারণ ব্যবহারিক বিধি বিধান তাদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে তাদের বর্ণ ও রং ধার করে এবং এ কারণেই তাত্ত্বিক বিধি বিধান ব্যবহারিক বিধি-বিধান কে বুঝার মূল মন্ত্র সরবরাহ করে। সুতরাং ইহা স্বীকৃত যে, ইসলামী আইন তত্ত্বের তাত্ত্বিক অংশের উপর ব্যবহারিক বিধি-বিধান নির্ভর শীল। রাসুলের জীবদ্দশায় সব বিষয় ছিল উম্মুক্ত এবং প্রকাশ্য। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আইন ব্যাখ্যার জন্য তাঁর কাছে প্রতিনিধিদল আসতো। কিন্তু তাঁর ওফাতের পরে শরীয়ার বিষয়সমূহ লিখিত ঐশ্বরীক উপাদান থেকে খুঁজে বের করা হতো।

ইল্লাহ, সাবাব, হিকমাহ্ এবং আলামাহ্:

শরীয়াহ্ আইনের লক্ষ্য হলো আল্লাহর ইচ্ছা এবং আদেশের বাহ্যিক দিকগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। আদেশ দুই প্রকার-ঘোষণামূলক এবং বাধ্যতামূলক আদেশ। ঘোষণামূলক আদেশ এমন সব বিবৃতি যা দায় গঠনের

জন্য বিশেষ ঘটনা ও পরিস্থিতিকে প্রকাশ করে এবং এ ধরনের আদেশকে হক্বা
ওয়াদায়ী বলা হয়। অপর পক্ষে যে আদেশে ঘোষণামূলক আদেশ কা
আরোপিত দায়-দায়িত্ব সমুহ পালন করা আবশ্যক করে তুলে তাকে বাধ্যতামূ
আদেশ বা আহকাম-ই তাকলীফি বলা হয়। ঘোষণামূলক আদেশের বিভিন্ন ধ
আছে যার মধ্যে অন্যতম হলো সাবাব যা বাহ্যিক জগত এবং মনের জগত
ঘটনা ও পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে এবং দায়-দয়িত্বের জন্য পর্যাপ্ত কারণ
করে। যেমন দিনের বেলায় সূর্য ,সামাজের সাবাব সৃষ্টি করে। পারস্পরিক চা
ও অভাব বিক্রয়, ইজারা ইত্যাদির কারণ সৃষ্টি করে ইহা আদেশমূলক
বাধ্যতামূলক আদেশ শব্দের মধ্যে প্রকাশ করা হয়না কিন্তু ইল্লাহ্ বা কারণ
সহযোগীতায় বোধগম্য করা হয়। সাবার কারণ বাহ্যিক ঘটনা নিয়ে গঠি
হিকমাহ্ বা দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য হলো মোসালাহ্ বা জ্ঞানকে অর্ন্তভূক্ত করা যার উ
বাধ্যতামূলক আদেশ নির্ভরশীল অর্থাৎ ইল্লাহ্ বা কারণ ও বাধ্যতামূলক আদে
পরস্পর জড়িত। শরীয়ার মতবাদ অনুসারে আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ ক্রিয়া দ্বা
প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্ট। বিবাহে জৈবিক চাহিদা পূরণ, মালিকানা হস্তান্তর দ্বারা বি
ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহ্র অনুমোদন প্রয়োজন। প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আল্লা
অনুমোদন অবশ্যই থাকতে হবে তাই প্রত্যেকটি বাহ্যিক ঘটনার সাহা
আল্লাহ্র আদেশ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মানুষের আচরণ ও উপলব্ধির মাধ্য
বিক্রয়ের সাথে আদেশের আল্লাহ্র কি হিকমাহ্ আছে তা পর্যবেক্ষন করা উচি
হিকমাহ্ বা মানুষের আচরণের সাথে সম্পৃক্ত বিচক্ষনতা বা দূরদর্শীতার মা
অবশ্যই স্পষ্ট এবং সংজ্ঞায়িত হতে হবে যাতে ইহা ইল্লাহ্ বা কারণের যথা
অর্জন করে। হিকমাহ্ অস্পষ্ট নির্দেশ ইল্লাহ্ গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অংশীদারগণের সম্মতিক্রমেই অংশীদারী ব্যব
বৈধ। এ বিষয়ে আল্লাহ্র ইচ্ছাকে জাগ্রত করা যাবে না। অস্পষ্ট বিষয় সম্মা
দ্বারা আল্লাহ্র আদেশ লাভ করা যাবে না। সুতরাং সম্মতি আল্লাহ্ নিঃসৃ
আদেশের জন্য ইল্লাহ্ গঠন করতে পারে না; কিন্তু যখন অংশীদারগণ এই সূ
ব্যবহার করে "আমি সম্মতি প্রদান করেছি।" তখন ইহা কিছু অংশে নির্দিষ্ট হয়
যায় এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশ গঠন করা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা হতে ইল্লাহ্ ও সাবাবের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষি
হয়। সাবাব হচ্ছে বস্তুগত বা উপাদানগত বিষয়। এর থেকেই দায়-দায়িত্ব উদ্ভূ

ও গঠিত হয়। সাবাব হিসেবে পরিচিতি লাভের জন্য কিছু গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক এবং এর সাথে হিকমাহ্র অবশ্যই সামঞ্জস্য থাকতে হবে। এ ভাবে সাবাব একটি শক্তিশালী কারণ যেমন মাতাল ব্যক্তির জন্য মদ একটি শক্তিশালী কারণ। যখন বিষয়টি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী তখন ইহা ইল্লাহ্র রূপে পরিবর্তিত হয় ,যেমন মদ মাতাল তৈরী করে।

সাবাবের রহস্য:

সাবাবের প্রতীয়মান উপাদান হলো যথাক্রমে:

১. অবিলম্বে দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ আদেশের চিহ্নস্বরূপ পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে ;
২. অত্যধিক প্রাচুর্যতা যাকাতের সাবাব;
৩. দিন রোজার সাবাব;
৪. হজ্জের সাবাব ক্বাবা;
৫. ওশর বা রাজস্বের সাবাব উৎপাদন বৃদ্ধি;
৬. শাস্তি বা হদ্দের সাবাব হলো অপরাধ;
৭. লেন-দেন বা ক্রয়- বিক্রয়ের সাবাব হলো মানুষের প্রয়োজন বা পারস্পরিক চাহিদা এবং
৮. বিবাহ ,তালাক ইত্যাদির সাবাব হলো মানুষের ক্রিয়া কলাপ অর্থাৎ এ ধরনের কার্যকলাপ আইন কর্তৃক অনুমোদিত যা তাদের ফলস্বরূপ মানুষকে নির্ধারিত ফলাফল প্রদান করে ।

ইল্লাহ্ বা ফলপ্রসূ কারণ নির্ণয়:

কিয়াসের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইল্লাহ্ নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন পন্থা আছে, যেমন নস্ বা কোরআন, হাদিস ,এবং ইজমা আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, (কারণসমুহ সুবিনাস্তকরন অতঃপর সেগুলো গ্রহণ বা বর্জন) এবং মানুষের যথোচিত আচরণ যার মধ্যে হিকমাহ্ এবং ইল্লাহর ন্যায় আল্লাহ্র কৌশল ও দূর-দর্শিতার ধারণাকে উপযোগী করার মত পর্যাপ্ত প্রবনতা বিদ্যমান থাকে। এভাবে ইল্লাহ্ ও সাবাব কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশুদ্ধভাবে জানা যায় । কিয়াসের মধ্যে চার প্রকার ফলপ্রসূতা বিদ্যমান । যেমন:

ক. একই স্বীকৃত গুন একই মান বা হুকুমের কারণে ফলপ্রসূ কারণ হিসেবে উৎস সমূহে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইহা মূল উৎসের সমতুল্য এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক

স্বীকৃত। যেমন যদি ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, খেজুরের বিষয়ে সুদ নিষিদ্ধকরণ
কারণ পাত্রের আয়তন দ্বারা পরিমাপ করন হয় তাহলে নিঃসন্দেহে পাত্রের উ
অতিরিক্ত চাপানোর প্রবনতাই খেজুরের সুদ নিষিদ্ধকরনের কারণের অনুরূ
হবে। এবং অপর পক্ষে যদি আহার্য সামগ্রী সুদ নিষিদ্ধকরনের কারণ হয় তাহ
শুকনা আঙ্গুর বা কিশমিশ খেজুরের সুদ নিষিদ্ধকরনের অনুরূপ হবে। এক্ষে
উভয়ক্ষেত্রে স্বীকৃত গুন ও হুকুম একই। এক দিকে পাত্রের আয়তন দ্বারা পরিমা
করন বা আহার্য সামগ্রী হওয়া এবং অপর দিকে সুদের কারণ হওয়ার জন্য এ
নিষেধাজ্ঞা।

খ. একই স্বীকৃত গুনকে হুকুমের ভিত্তির ফলপ্রসূ কারণ হিসেবে চিহ্নিত ক
হয়েছে। যেমন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সৎ ভাইয়ের স্থলে আপন ভাইয়ের স্বীকৃ
মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দেয়া। কিয়াসের ক্ষেত্রে একই গুন বা মর্যাদার কারণ সৃ
করে তবে এ ক্ষেত্রে একই হুকুম কোন কারণ সৃষ্টি করেনা।

গ. স্বীকৃত মর্যাদা বা গুনের ভিত্তিকে একই হুকুমের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা
হয়েছে। উদাহরনস্বরূপ যখন কোন ব্যক্তি দাবিদারগণের ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ
করতে ব্যর্থ হয় তখন সে কিয়াসের সাহায্যে ঐ ঋণের দায় থেকে মুক্ত যদি সে
অজ্ঞান বা নিস্তেজ হয়ে থাকে। কিয়াসের ভিত্তি এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত
যে, উম্মত্ততা ও রক্তস্রাব উভয়ই একই হুকুম তথা নামাজের দায় রদ করনের
ফলপ্রসূ কারণ হিসেবে গণ্য। এখানে আইন বিজ্ঞানীগণ উৎসের কারণ হিসেবে
ইতিপূর্বে চিহ্নিত অজুহাতের একটি বা দুটিক হুকুমের কারণ হিসেবে গ্রহণ
করেননি বরং উক্ত দুটি স্বীকৃত গুন অজ্ঞান হওয়া ও রক্তস্রাবকে হুকুমের কারণ
হিসেবে গণ্য করেছেন। এপ্রকৃতির স্বীকৃত গুনকে স্বাভাবিক ভাবে মুলাইম বলা
হয়।

ঘ. স্বীকৃতগুণ যার ভিত্তিতে হুকুমের ভিত্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে
তাকে মুনাসিব আল গরীব বলা হয়। যেমন রক্তস্রাবের কারণে কিয়াসের মাধ্যমে
নামাজ পড়ার দায় হতে অব্যাহতি দান ভ্রমন অবস্থার ন্যায় একই স্বীকৃত গুনের
কারণে নামাজের দুই রাকাত বাতিলকরন ইতিমধ্যে একই প্রকৃতির হুকুমের কারণ
হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এখানে নামাজের দৃষ্টিভঙ্গি হতে রক্তস্রাবকাল বা
ভ্রমনরত অবস্থায় অসুবিধা বা ঝামেলা মূল ভিত্তি বা কারণ।

কিয়াসের শর্ত:

কিয়াস করার জন্য মোটামুটিভাবে চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

যেমন:

প্রথমত: কোন নতুন বিষয়ের হুকুম কোন পর্যন্ত বিস্তৃত হবে তা মৌলিক বিষয়ের সাথে প্রকাশ্যভাবে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। সুতরাং যখন খুজায়মার প্রামাণ্য সাক্ষ্য স্বয়ং একটি আইনগত সাক্ষ্য (হাদিসের ভিত্তিতে) তখন তাকে কিয়াসের মাধ্যমে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যাবে না। অন্য কোন একক ব্যক্তির প্রামান্য সাক্ষ্য অনুরূপ ভাবে আইনগত সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হবে।

দ্বিতীয়ত: মৌলিক বিষয়ের হুকুম কিয়াসের বিধানের পরিপন্থী হতে পারবে না। যেমন নামাজের রাকাত সংখ্যা অথবা যখন ইহা কিয়াসের পরিপন্থী হয় যেমন অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু খেলে রোজা যাবে না যদিও কিয়াসের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্ত যে শরীরের অভ্যন্তরে কিছু প্রবেশ করলেই রোজা ভঙ্গ হয়েছে বলে গন্য হবে। ইহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যাবেনা যে, অনিচ্ছাভাবে কিছু খেলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কিয়াসের মাধ্যমে ভুলবশতঃ বা দূর্ঘটনাক্রমে কিছু খেলেও রোজা ভঙ্গ হয় না

তৃতীয়ত: কাঙ্খিত নতুন বিষয়ের হুকুমকে কিয়াস পর্যন্ত বিস্তৃত নয়, বরং কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শরীয়ার হুকুম হতে হবে। অর্থাৎ হুকুমটির নতুন বিষয়ে পরিবর্তনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন করা যাবে না। নতুন বিষয়টির হুকুম আদি বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে তবে নতুন বিষয়টির ক্ষেত্রে কোন নস্ থাকা আবশ্যক নয়।

চতুর্থত: ঐশী নির্দেশীকা পরিবর্তনের জন্য কিয়াসের ব্যবহার যথার্থ নয়। কারণ ইহা মানুষের বিচার বুদ্ধি বা রায় দ্বারা ঐশী নির্দেশীকা পরিবর্তন বলে গণ্য হবে, যেমন মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য নির্দেশীকা বা নস্ দ্বারা চিরস্থায়ীভাবে মিথ্যা অভিযোগকারীর সাক্ষ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়কে শাফেঈগণ কিয়াসের মাধ্যমে যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করেন যে, যেহেতু কোন ব্যক্তি মারাত্মক অপরাধ করে যদি অনুতপ্ত হয় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়, সেহেতু মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রেও অনুতপ্তের সাক্ষ্য গ্রহণের প্রতিবন্ধকতাকে অপসারণ করে। হানাফী আইনবিদগণ যুক্তির দ্বারা শাফেঈদের উত্তর দেন যে, মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রে কিয়াসের প্রয়োগ ঐশ্বরিক

বিধান পরিবর্তনের শামিল হবে যে, ঐশ্বরিক বিধানে ঘোষণা করা হয়েছে এ
মিথ্যা অভিযোগকারীকে আজীবন সাক্ষ্য প্রদান করা হতে বিরত রাখতে হবে।
শরীয়াহ্ আইনের উৎস হিসেবে কিয়াসের প্রামাণ্যতা বিষয়ে এতদসংক্রান্ত
আলোচনা আইন বিজ্ঞানে বিদ্যমান ব্যাপক ভান্ডারের ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র।
সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রাথমিক যুগের আইনবিদগণ বৈধ কিয়াসের ব্যবহারের
মাধ্যমে সকল আইনগত সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। সম্ভবতঃ একারণেই ইমাম
আজম একক কর্তৃক বিশিষ্ট হাদিস তথা কেবল একজন রাবি কর্তৃক বর্ণিত
হাদিসের থেকে কিয়াসকে বেশী পছন্দ করতেন ।

৫. সন্ধি বা চুক্তি

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। "চুক্তি অবশ্য পালনীয়" (Pacta Sunt Servenda) এই মতবাদ আন্তর্জাতিক আইনের মূল ভিত্তি । চুক্তি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কেবল একটি অঙ্গিকার পত্র নয় ;বরং এটা দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য সাধারন ভাবে পালনীয় আইন কানুনের সৃষ্টি হয় । এগুলোই হচ্ছে আইন সৃষ্টি কারী চুক্তি (Law Making Treaties) । ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে চুক্তি একটি অন্যতম উৎস হিসেবে স্বীকৃত এবং আইন উন্নয়নে এর ভূমিকাও অনস্বীকার্য। চুক্তি শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সন্ধি বা সম্পর্ক স্থাপন, বন্ধন বা নীতিতে আবদ্ধ হওয়া। চুক্তিকে আরবী ভাষায় বলা হয় আল-আক্দ বা আস-সুলহ্ বা আদ-দায়। সাধারণভাবে চুক্তি শব্দটি যে অর্থ বহন করে, উভয় আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতর অর্থ বহন করে । আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী চুক্তি বলতে, দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত বিষয়ে লিখিত দলিল মূলে আবদ্ধ আন্তর্জাতিক ঐক্যমতকে বুঝায়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে চুক্তির সঠিক ইংরেজী প্রতিশব্দ হবে -Treaty.

চুক্তির শ্রেণী বিভাগ:

- আইন বিশারদ ডঃ যোনায়ের চুক্তিকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যাস করেছেন।

যথা:

১. আইন সৃষ্টিকারী সন্ধিচুক্তি: অধ্যাপক ওপেনহায়মের সংজ্ঞানুসারে, কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রের পারস্পরিক আচরণের জন্য সাধারণ বিধি বিধান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে

সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে আইন সৃষ্টিকারী সন্ধি চুক্তি বলে । এ ধরনের চুক্তিসমূহ চুক্তিভূক্ত পক্ষগণের মধ্যে পারস্পরিক আচরণ সম্পর্কিত নিয়মাবলী নির্দেশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ উক্ত নির্দেশিত নিয়মাবলী পালন করতে বাধ্য থাকে । মদিনা সনদ ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে আইন সৃষ্টিকারী সন্ধি চুক্তি হিসেবে গণ্য করা হয় ।

২. সন্ধিমূলক চুক্তি: দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে কোন বিতর্কিত বিষয়ে সন্ধিমূলকচুক্তিতে আবদ্ধ হয় । সন্ধিমূলক চুক্তি রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ নীতি অনুযায়ী স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে। প্রয়োগগত দিক থেকে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. সার্বজনীন চুক্তি : এই চুক্তি সকল রাষ্ট্রের উপর প্রযোজ্য ।

খ. বহু জাতিক চুক্তি : সকল রাষ্ট্রের উপর প্রযোজ্য না হলেও অধিকাংশ রাষ্ট্রের উপর প্রযোজ্য ।

গ. দ্বিমূখী চুক্তি : ইহা শুধু দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রয়োজ্য ।

এর উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে সন্ধি-চুক্তিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা

১. শান্তির সন্ধি-চুক্তি : যখন কোন রাষ্ট্র শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন তাকে শান্তির সন্ধি- চুক্তি বলা হয় ।

২. সম্পর্ক উন্নয়নের চুক্তি: একটি রাষ্ট্র যখন আর একটি রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য দূত বিনিময় ,সংস্কৃতি বিনিময়,প্রভৃতি বিষয়ে চুক্তি করে তখন তাকে সম্পর্ক উন্নয়নের চুক্তি বলে।

চুক্তির শর্তাবলী :

একটি বৈধ সন্ধি চুক্তির জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে-;যেমন-পক্ষগণকে চুক্তি করার যোগ্যতা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্রসমুহ চুক্তির যোগ্য পক্ষ। চুক্তি আলোচনায় অংশগ্রহনকারী ব্যক্তি বা প্রতিনিধিকে রাষ্ট্র কর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হতে হবে। চুক্তি সাক্ষরের সময় স্বাধীন সম্মতি থাকতে হবে। অনুচিত প্রভাব বা প্রতারনার দ্বারা চুক্তি সাক্ষরিত হলে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের ইচ্ছায় চুক্তি বাতিল হতে পারে।

চুক্তি ও ইসলামী আর্ন্তজাতিক আইনের সম্পর্ক :

ইসলামী আর্ন্তজাতিক আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারন, উন্নয়ন, ও নিয়ন্ত্রন করা এবং এজন্য প্রয়োজনে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নীতিমালা গৃহীত হতে পারে। বর্তমান বিশ্বে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রনে প্রায় ৩০০ আর্ন্তজাতিক সংস্থা রয়েছে যা এক বা একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত। এই সমীক্ষা থেকে একথা স্পষ্ট যে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়নে চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। সুতরাং, ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, শান্তি স্থাপনে তথা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়ন প্রসঙ্গে চুক্তি বৈধভাবে প্রাসঙ্গিক।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে চুক্তির গুরুত্ব :

- মুসলিম কনডাক্ট অব ষ্টেট গ্রন্থে ডঃ হামিদুল্লাহ্ ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের যে কয়টি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, তার মধ্যে তিনি চুক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মজিদ খাদ্দুরী তার 'মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন' গ্রন্থে উল্লেখ করেন -আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের উৎস সম্পর্কে ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় সংবিধিতে এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যার উল্লেখ আছে তার সাথে ইসলামীক ল' অব নেশনস বা মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ মিল রয়েছে। এগুলোকে প্রথা, কর্তৃপক্ষ, চুক্তি এবং যুক্তি শিরোনামে সুবিন্যাস্ত করা যায়। আফজাল ইকবাল কূটনীতি ও ইসলাম গ্রন্থে বলেন ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উৎস সমূহের মধ্যে প্রধান হলো চুক্তি, প্রথা ও যুক্তি। তিনি আরো বলেন পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্ হলো বিধিসম্মত ক্ষমতার উৎস, আর প্রথা এবং চুক্তি হলো বিভিন্ন সন্ধি স্থাপনের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা।

উল্লেখিত গ্রন্থ তিনটির উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায়, চুক্তি ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। চুক্তি একটি গতিশীল উৎস কারণ সতত পরিবর্তনশীল সমাজের প্রেক্ষাপটে চুক্তি তার নিজের অবস্থানকে অটুট রাখছে। এছাড়াও বর্তমানের যে কোন আন্তঃরাষ্ট্রীয় জটিলতা মোকাবিলায় ও সম্পর্ক উন্নয়নে কোরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশ

বিবেচনায় রেখে গ্রহনীয় নীতিমালা প্রনয়ণে সহায়তা করছে।

চুক্তির মূল নীতি ও বাধ্যবাধকতা:

ইসলামী আইনে চুক্তির মূলনীতি অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদন, পালন ও চুক্তি রক্ষার বাধ্য বাধকতা সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব পোষন করা হয়েছে তা অনুধাবনের জন্য অবশ্যই কোরআন, হাদিস ও ইজমার দিকে আলোকপাত করতে হবে। চুক্তি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে -"তোমরা পারস্পরিক ওয়াদাসমুহ পূর্ণ কর। কেননা এই ওয়াদা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"(বনী ইসরাইল-৯৪)। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন -"এবং কল্যাণ প্রাপ্ত হচ্ছে সেই সব মুমিন লোক যারা তাদের আমানত সমূহ এবং তাদের ওয়াদা পূর্ন সতর্কতার সাথে রক্ষা করে" (মুমিনুন-৮)। আল্লাহ্ পাক সুরা তওবার কয়েক জায়গায় বলেন, "দ্বিতীয় পক্ষের লোক যতক্ষণ তোমাদের সাথে অঙ্গীকারে অটল থাকে তোমরাও অটল থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীনদের সাথে আছেন "(তওবা-৭)। "যে জাতি নিজেদের সন্ধি-চুক্তি এবং শপথ ভঙ্গ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করনা কোন কারণে ? "(তওবা-১৩)

আল্লাহ্ পাক আরো বলেন -"শত্রুও যদি শান্তি ও সন্ধি সমৃদ্ধির জন্য আগ্রহী হয় তাহলে তুমিও তার জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্র উপর পূর্ণ নির্ভর কর"(আনফাল-৬১)। "দ্বীনের ব্যাপারে তারা যদি তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তাও এমন কোন জন গোষ্ঠির বিরুদ্ধে হতে পারবে না ,যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে" (আনফাল -৭২)।

চুক্তি সম্পর্কে রাসুল(সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার সে যেন ওয়াদা পুরন করে") সলীম ইবনে আমের থেকে বর্ণিত - মুয়াবীয়া(রাঃ) এবং রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ না করার চুক্তি হয়েছিল। মুয়াবিয়া চুক্তি ভঙ্গ করতে উদ্ধত হলে আমর ইবনে আব্বাস (রাঃ)বলেন, "আমি রাসুলপাক (সঃ) কে বলতে শুনেছি যার সাথে কোন কওমের চুক্তি হয় তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়ার আগে কোন পরিবর্তন করা বৈধ নয়। তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে।"

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের উপরোক্ত বর্ননা থেকে দেখা যায় যে, ইসলামী আইনে চুক্তি পালনের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা কঠোরভাবে আরোপ করা হয়েছে।

একদিকে চুক্তি পালনে উৎসাহিত করা হয়েছে অপর দিকে চুক্তি ভঙ্গের জন্য শা
কথাও বলা হয়েছে ।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়নে চুক্তির ভূমিকার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত :

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নে যে সব চুক্তি ঐতিহাসিক দৃষ্টা
হিসেবে চিহ্নিত সে গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মদিনা সনদ, হুদায়বিয়ার স
ইত্যাদি । মদিনা সনদ ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর নির্দেশে ৬২২ খৃষ্টা
মদিনা হিযরত করেন। মদিনায় এসে তিনি দেখলেন যে, মদিনাবাসীদের মধ্য
নানা গোত্র, উপ-গোত্র, ধর্মমত ও বিশ্বাসের মানুষ রয়েছে । যেমন মদিনার আ
পৌত্তলিক সম্প্রদায়, ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়, নব দীক্ষিত মুসলিম সম্প্রদা
(আনসার) এবং মক্কা থেকে আগত মুসলিম সম্প্রদায়। এদের ভিতরে আদর্শগ
কোন মিল ছিল না । তাদের ভিতরে বিরাজ করছিল হিংসা ও বিদ্বেষ। এরূপ
পরিস্থিতিতে হযরত মুহাম্মদ(সঃ) মদিনায় সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সাধারণ
গঠনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প করেন এবং এরই ফলশ্রুতিতে ৬২৪ খৃষ্টাব্দে
মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ
চুক্তিটি ঐতিহাসিক মদিনা সনদ নামে পরিচিত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম
মুর এ চুক্তির গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মদিনা সনদ শুধু সে যুগে কে
বরং সর্বযুগে ও সর্বকালে হযরত (সঃ) এর অসামান্য মাহাত্ম ও অপূ
মননশীলতা ঘোষণা করবে । প্রফেসর স্টিফেন্স এর ভাষায় - "মহা বিজ্ঞতা প্রসূত
একটিমাত্র উদ্দোগে তিনি একই সাথে তার দেশের অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, ও নৈতিক
ক্ষেত্রে সার্বিক পরিবর্তন এনেছিলেন" । জন ডেভেনপোর্ট এ সম্পর্কে বলেন,
"মুহাম্মদ (সঃ) বিশৃংখল, নগ্ন, ক্ষুধার্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে এক বিরাট
একতাবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেছিলেন। আদর্শ রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে এটা তাঁর
শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ।"

মদিনা সনদে মোট ৪৭ টি অনুচ্ছেদ ছিল। এর মধ্যে ছিল মদিনার ইহুদী,
খৃষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সকলে একই জনগোষ্ঠি বা কাওম বলে গণ্য হবে।
এবং তারা অন্যান্য জনগোষ্ঠি থেকে স্বতন্ত্র থাকবে । প্রত্যেক সম্প্রদায় সমান
নাগরিক অধিকার ভোগ করবে । মদিনায় সকল ধরনের অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়।
সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে, কেউ কারো ধর্মে
হস্তক্ষেপ করবে না। স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায় সমুহ মদিনা শহরের মর্যাদা রক্ষা

করবে, এবং মদিনা আক্রান্ত হলে সকলে একত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ
হবে। কোন সম্প্রদায় বহিঃশত্রুর সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না। দূর্বল ও
অসাহায়কে সর্বতভাবে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে। অপরাধীদের রীতিমত বিচার
ও শাস্তি হবে এবং অন্যায়কারীকে কেহ সাহায্য করতে পারবে না। মদিনা সনদের
সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি হচ্ছে -এ সনদ যে বা যারা ভঙ্গ করবে তার বা তাদের উপর
আল্লাহর অভিসম্পাত।

পর্যালোচনা:

সনদের প্রথম ধারাটি ইসলামী আর্ন্তজাতিক আইনের উদ্দেশ্যকে ধারন
করতে সক্ষম হয়েছে । কেননা ইসলামী আর্ন্তজ্যাতিক আইনের উদ্দেশ্যই হলো
ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অনৈসলামিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন যদিও রাষ্ট্র
শব্দটি সনদে অনুপস্থিত তবুও একাধিক গোত্র বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক
উন্নয়নের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । উল্লেখ্য যে সে সময় রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা ছিল
এবং একটি সম্প্রদায় একটি রাষ্ট্রের ন্যায় আচরণ করত, তাই গোত্র সমুহের
একত্রীকরন ও সম্পর্ক উন্নয়ন বাস্তবিক অর্থে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়নের নামন্তর ।
তাছাড়া এই সনদের মাধ্যমে ইহুদি, খৃষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান মিলে মূলতঃ
একটি রাষ্ট্রেরই গোড়াপত্তন হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত: মদিনা সনদের মাধ্যমে মুহাম্মদ যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তন
করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ প্রভাব তদানিন্তন বিশ্বের সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছিল ।
মুহাম্মদ(সঃ) মদিনা সনদের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা
নিশ্চিত করেছিলেন । তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মে পূর্ন স্বাধীনতা
দিয়েছিলেন ,যা আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনেরও চাহিদা ।

তৃতীয়ত: মদিনা সনদ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গোত্র ধারণা তিরোহিত
করে তাদেরকে এক রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সমন্বিত করে। ফলে তাদের মধ্যে
রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয় এবং একটি সুসংহত জাতিতে পরিণত করে ।
মদিনা সনদের মাধ্যমে দেশ ভিত্তিক প্রথম ইসলামী আন্তর্জাতিক জাতীয়তাবাদের
প্রকাশ ঘটে ।

চতুর্থত: মদিনা সনদ ঘোষণার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায় একজাতি হয়ে
বসবাস করার সুযোগ পায় এবং একটি যৌথ শক্তির ধারণার সৃষ্টি হয় ।

পঞ্চমত: মদিনা সনদের ফলশ্রুতিতে মদিনায় বিশৃংখল রাজনৈতিক

পরিস্থিতির অবসান ঘটে এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় । মদিনা স
সাফল্য আন্তর্জাতিক পর্যায় বৃহত্তর সনদ স্বাক্ষরের সম্ভাবনার পথকে সুগ
এবং এ ভবেই আন্তর্জাতিকতাবাদের সূচনা হয়।

ষষ্ঠত: আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের সূচনা এবং জাতিসংঘ গ
ধারনা মদিনার সম্প্রদায়সমূহের মধ্যকার সমঝোতা ও ঘোষিত সনদপত্রে
নিহিত ছিল। এ প্রসঙ্গে আরনোল্ড টয়েনবীর বক্তব্য প্রনিধাণ যোগ্য তি
"উইজডম অব মোহাম্মদ" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইসলামই প্রথম জা
গঠনের ধারণা দিয়েছিল । মদিনা সনদ শুধু জাতি সংঘ গঠনের ধারনাই
বরং জাতিসংঘ সনদের ধারাসমুহকে মদিনা সনদের পরিশীলিত সংস্করন
অভিহিত করা যায় । বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য জাতিসংঘ সনদের ক
ধারা উল্লেখ করা হলো ঃ

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং সেই উদ্দেশ্যে শান্তি
হুমকি নিবারন ও দূরীকরণের জন্য যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণ এবং শান্তিপূর্ণ উ
আন্তর্জাতিক বিরোধের নিস্পত্তি করা। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম অধিকা
আত্মনিয়ন্ত্রন নীতির ভিত্তিতে সৌহার্দপূর্ন সম্পর্কের প্রয়াস এবং বিশ্বশান্তি
করার জন্য অন্যান্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করা । অর্থনৈতিক সামাজি
সাংস্কৃতিক বিষয় সমুহের সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশ
নারী, পুরুষ, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মৌল অধিকারসমুহের প্রতি
প্রদর্শন করা । জাতিসংঘ সনদের এই অনুচ্ছেদের সাথে মদিনা সনদের ২
এবং ৬নং অনুচ্ছেদের সংগতি রয়েছে । ২নং অনুচ্ছেদ আন্তর্জাতিক সম্প
ক্ষেত্রে সকল সদস্য আঞ্চলিক অখন্ডতার বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন রা
রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগে ভীতি প্রদর্শন থেকে
জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সংগে সামঞ্জস্যহীন কোন উপায় গ্রহণ করা থেকে বি
থাকা । সকল সদস্য বর্তমান সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সমস্ত
প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে এবং যে সব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতি
প্রতিষেধক বা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেই সব রাষ্ট্রকে সাহায্য সহযো
না করা। এই অনুচ্ছেদের সাথে মদিনা সনদের ৭, ৮ ও ১৩ নং অনুচ্ছে
সংগতি রয়েছে। ১৯৪৮ সালে মানুষের অধিকার সংরক্ষনের জন্য বিশ্বমানবাধি
ঘোষণা করা হয়েছে অথচ ৬২৪ খৃষ্টাব্দে ঘোষিত মদিনা সনদই মানুষের মৌ

অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে । মদিনা সনদের শর্তগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জাতিসংঘে কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারের ধারণা মদিনা সনদ থেকেই নিঃসৃত।

হুদায়বিয়ার সন্ধি:

দীর্ঘ ছয় বছর পর ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে ১৪০০ নিরস্ত্র সাহাবা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মদিনা ছেড়ে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কাতে হজ্জ ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন । কুরাইশগণ এ খবর শুনে বাধা দেয়ার জন্য অগ্রসর হলে মুহাম্মদ (সঃ) পথ পরিবর্তন করে হুদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং সেখানে দূত বিনিময়ে অনেক আলাপ- আলোচনার পর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত । সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলমানরা সে বছর হজ্জ না করে মদিনায় ফিরে যাবে তবে পরের বছর হজ্জ করতে পারবে কিন্তু তিন দিনের বেশী থাকতে পারবে না এবং আত্মরক্ষার জন্য নিয়ে আসা অস্ত্র ব্যতীত অতিরিক্ত অস্ত্র রাখতে পারবে না । মক্কায় অবস্থানকারী কোন মুসলমানকে মুহাম্মদ (সঃ) মদিনায় নিয়ে যেতে পারবেন না। কোন মুসলমান কুরাইশ দলে যোগদান করলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না কিন্তু কোন কুরাইশ মুসলমানের দলে আসলে তাকে ফেরত দিতে হবে । আরবদের কোন গোত্র মুহাম্মদ অথবা কুরাইশদের সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হতে পারবেনা। উভয়ের মধ্যে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

পর্যালোচনা:

এই সন্ধি কুরাইশদের অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছে বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা ছিল ইসলামের জন্য এক মহা বিজয়। পবিত্র কোরআনে ইহাকে ফাতহুম মুবিন বা শ্রেষ্ট বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করলাম"(ফাতহ্-১)। এই সন্ধির ফলে মুসলমানরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে । আল্লাহর অস্তিত্ব ও মুহাম্মদকে নবী হিসেবে স্বীকার করা হয় এর ফলে ইসলাম প্রচারের পথ সুগম হয় ইসলামের সৌন্দর্য ,শ্রেষ্ঠত্ব, ও মহত্ব বুঝতে পেরে কুরাইশগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং এভাবে কুরাইশদের শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষীয়মান হতে থাকে। দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতির ফলে মুসলমানরা যুদ্ধাবস্থা ও আক্রমনের

আশংকা হতে মুক্ত হয়ে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও ইসলামী রাষ্ট্রের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করে নিয়েছিল ।

মদিনা সনদ ও হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে। এই দুটি সনদ ছাড়াও ইসলামের ইতিহাসে আরো কিছু চুক্তি দেখতে পাওয়া যায়, যেমন খৃষ্টানদের সনদ প্রদান। মুহাম্মদ (সঃ) ষষ্ঠ হিজরীতে এই সনদ প্রদান করেন । সনদের মূল বিষয়বস্তু হলো -খৃষ্টানদের উপর অন্যায়ভাবে কর আরোপ করা যাবে না

তাদের কোন গীর্জা ভেঙ্গে মসজিদ নির্মান করা যাবে না এবং গীর্জা মেরামতের সময় প্রয়োজনে মুসলমানরা সাহায্য করবে আরবের বাইরে মুসলমানদের সাথে খৃষ্টানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে আরবীয় খৃষ্টানদের গো... করা যাবে না। এই চুক্তি মুসলমানদের পরধর্মের প্রতি সীমাহীন সহনশীলতার একটি নজীর সৃষ্টি করেছে ।

জেরুজালেম চুক্তি :

৬৩৭ খৃষ্টাব্দে খলিফা ওমরের সাথে এ চুক্তি সম্পাদিত হয় । ইয়ারমুক যুদ্ধের পর আমর বিন আস জেরুজালেম অভিমুখে অগ্রসর হলেন । আমরের আগমনে রোমান সেনাপতি আরতাবুন নগর ছেড়ে চলে গেলেন । জেরুজালেমের অধিবাসীরা এই শর্তে আত্মসমর্পণ করতে চাইল যে খলিফা ওমর নিজে এ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবেন খলিফা ওমর (রাঃ) কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে যেমন বাসিন্দাদের জান-মাল, গীর্জা ও ক্রসের পূর্ন হেফাযত করা হবে ,গীর্জা সমূহ বাসগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে না, ইসলাম ধর্ম তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না,পুরুষ পরম্পরায় সন্ধির শর্ত মেনে নিতে হবে ইত্যাদি শর্তে সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন।

গ্রীক সম্রাজ্ঞীর সাথে চুক্তি :

৭৭৮ খৃষ্টাব্দে আব্বাসীয় বংশের আল-মাহদীর সময়ে গ্রীকগণ কয়েকবার যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে সম্রাজ্ঞী আইরিন বার্ষিক কর দেয়ার শর্তে খলিফা হারুন-অর-রশীদের সাথে সন্ধি করেন। পরবর্তীতে ৭৯২ খৃষ্টাব্দে রোমানগণ সেই চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। মুসলমানরা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে পুনরায় চুক্তি পালনে বাধ্য করে । সমগ্র আলোচনা

থেকে বলা যেতে পারে ইসলামী আর্ন্তজাতিক আইন উন্নয়নে চুক্তি একটি গতিশীল ও অন্যতম একটি উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে । আইন কোন স্থির বিষয় নয়; পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদাকে সামনে রেখে আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে চুক্তি একটি অন্যতম পদক্ষেপ হতে পারে ।

৬. প্রথা বা উরফ :

ইসলামী আইন শাস্ত্র উন্নয়নে প্রথার গুরুত্ব একেবারে কম নয় । প্রথা হলো এমন কিছু রীতিনীতি যা সমাজে বহুকাল থেকে প্রচলিত বা ব্যবহৃত হয়ে আসছে । শরীয়াহ্ এসে প্রথাকে উপেক্ষা করে নাই অথবা একে বাতিল ও করে নাই বরং কিছু কিছু প্রথাকে শরীয়াহ্ গ্রহণ করে নিয়েছে, তাই এ দিক থেকে প্রথা শরীয়াহ্র একটি ক্ষুদ্র অংশ দখল করে আছে ।

প্রথার সংজ্ঞা :

ইসলামী আইনে প্রথার আরবী পরিভাষা হলো উরফ। "মুজামু লুগাতুল ফুকাহা" গ্রন্থে বলা হয়েছে,"সংখ্যাধিক্য জনগোষ্ঠির দীর্ঘকালের ভাবগত ও কর্মগত অভ্যাসই প্রথা"।

"কাওয়ায়িদুল ফিকহি" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, কোন মুসলিম জনগোষ্ঠির দীর্ঘকাল ধরে পালিত আচার-আচরণ বা রীতি-নীতি যা কোরআন সুন্নাহ্র নীতির পরিপন্থী নয় ইসলামী আইনের পরিভাষায় তাকে প্রথা বা উরফ বলে ।

সুতরাং বলা যায় যে, মুসলমানরা সমাজের কল্যান সাধন কল্পে স্মরনাতীতকাল থেকে যে সকল রীতি-নীতি অনুসরন করে তাকে প্রথা বলে এবং উক্তরূপ প্রথা শরীয়ার পরিপন্থী হতে পারবে না । প্রথা গ্রহণের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- ".প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুযায়ী (প্রথা) তাদের (স্ত্রীদের) কে মোহরানা প্রদান কর "(আন-নিসা:২৫)।

এ ব্যাপারে রাসুল (সঃ) বলেন "মুসলমানরা যে সব রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠান ভাল মনে করে আল্লাহ্র কাছে ও তা ভালো।"

প্রথার শ্রেনী বিভাগ:

শরীয়াহ্ প্রথাকে চার ভাগে ভাগ করেছে যেমন, প্রথায়ে কাওলী, প্রথায়ে আমালী, বিশেষ বা স্থানীয় প্রথা এবং সাধারণ প্রথা ।

যেসব শব্দগত প্রথা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং উক্ত শব্দ দ্বারা একের অধিক অর্থ বোঝান হয় তাকে প্রথায়ে কাওলী বলে যেমন,সন্তান বা

ওলাদুন। এ শব্দটি দ্বারা ছেলে এবং মেয়ে উভয়কে বুঝানো হয়। এরূপ শব্দ প্রথা পবিত্র কোরআনেও ব্যবহৃত হয়েছে যেমন,"আল্লাহ্ পাক তোমাদে ছেলেমেয়েদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে,একজন ছেলে অংশ দুজন মেয়ের অংশের সমান হবে"(আন-নিসা:১১)।

অনুরূপভাবে "ঘর" শব্দটি মানুষের মাঝে এভাবে ব্যবহৃত হয়, এ মানুষ যেখানে বসবাস করছে সেকেই বুঝায় কিন্তু মসজিদকেও মানুষ ঘর হিসেবে ব্যবহার করছে, যেমন আল্লাহর ঘর। এ ছাড়াও সুদ বা রেবা আরব দেশে দুটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়: ব্যবসায় মুনাফা লাভ বা বৃদ্ধি ও ঋন গ্রহণের সময় অতিরিক্ত অর্থ বা সম্পদ গ্রহণ এই অর্থে বৃদ্ধি বুঝায় কিন্তু শরীয়ার হুকুম-আহকাম নাযিল হওয়ার সময় ঋন সংক্রান্ত বিষয়ে বৃদ্ধির উপরে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথায় আমালী: যেসব প্রথা বা রীতি-নীতি মানুষের মাঝে কাজের মাধ্যমে বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাকে প্রথায় আমালী বলা হয় যেমন, ক্রয়-বিক্রয়। অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট কোন দ্রব্য প্রধান করাকে ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়। ক্রয়-বিক্রয়কে প্রথাগত চুক্তিও বলা যায় কারণ এসকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য সৃষ্টি হয় এবং ধরনের প্রথায় শরীয়ার সাথে বিরোধের কিছু নেই। এ রকম বহু প্রথা আছে যে গুলো মানুষ স্থান কাল ও পাত্র ভেদে ব্যবহার করে আসছে, যেমন কৃষি কাজ বা ইজারা সম্পর্কিত প্রথা।

বিশেষ প্রথা : যে সকল প্রথা কেবল কোন নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যবহৃত হয় তাকে স্থানীয় বা বিশেষ প্রথা বলে। বিশেষ প্রথা কেবল নির্দিষ্ট এলাকাতেই শরীয়ার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রথার সাথে মিসরের প্রথার অনেকাংশে মিল নাই। কিন্তু, শরীয়ার সাথে বিরোধ নেই এমন প্রথা উভয় দেশে বিবাহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সাধারণ প্রথা: যে প্রথা কোন নির্দিষ্ট এলাকাতে নহে বরং সমগ্র মুসলিম দেশে প্রচলিত আছে তাকে সাধারণ প্রথা বলা হয়। যেমন সন্তান বা ওলাদুন শব্দটি দ্বারা ছেলে-মেয়ে উভয়কে বুঝানো হয় অনুরূপভাবে আকিকাহ্ এটি মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত একটি প্রথা।

প্রথা বৈধ হওয়ার শর্তাবলী: শরীয়ার অংশ হিসেবে বৈধ হতে হলে প্রথাকে অবশ্যই কয়েকটি শর্তপূরন করতে হবে যেমন:

১. যৌক্তিকতা : প্রথাকে অবশ্যই যুক্তি সংগত হতে হবে। প্রথার কর্তৃত্ব চূড়ান্ত নহে। ন্যায় বিচার ও জনসাধারণের উপযোগিতার সহিত সংগতিপূর্ন হলে শরীয়ার অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

২. প্রথা অবশ্যই শরীয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। পরিপন্থী হলে বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ছাড়াও প্রথাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত হতে হবে।

৩. প্রথাকে শরীয়তের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য অবশ্যই স্মরনাতীতকাল থেকে প্রচলিত হতে হবে অর্থাৎ দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত থাকতে হবে। প্রথাকে পরিবর্তনশীল ভাবধারার সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী হওয়া উচিত। কারণ আদালত প্রথার যৌক্তিতা মামলা শুনানীর সমসাময়িক মাপকাঠিতে বিচার করে থাকেন।

ইসলামী আইন বিকাশে প্রথার ভূমিকা : প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের কোন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কাঠামো ছিল না। তারা ছিল গোত্র ভিত্তিক। গোত্র প্রধানগণ তৎকালীন আরব সমাজে স্মরনাতীতকাল থেকে প্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথার ভিত্তিতে গোত্র পরিচালনা করতেন। অর্থাৎ ইসলাম আসার আগে আরবে প্রথা ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল। ইসলাম আবির্ভাবের পর প্রচলিত প্রথার বিপরীত একটি নতুন আইন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে জনসাধারনের জন্য পালন করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে সুতরাং এদিকে লক্ষ রেখে শরীয়াহ্, যে সকল প্রথা সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী, তা বর্জন করে বা কিছু সংশোধন করে একটি ভারসাম্য পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, যা মুসলমানদের জন্য পালন করা সহজ হয়। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলমানরা অনেক প্রথা বা আচার-অনুষ্ঠান মেনে নিয়েছে। অনুরূপভাবে ব্যবসা-বানিজ্য সংক্রান্ত বহু প্রথা মুসলমানরা গ্রহণ করে নিয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, প্রাক ইসলামী যুগের বহু প্রথা ইসলামী আইনের অনেক বিধি-বিধান প্রনয়ন করতে সহায়তা করেছে তবে ইহা সত্য যে ইসলামী আইন তত্ত্বে প্রথা সমূহ গ্রহনের ব্যাপারে কোন বাধা বাধকতা নেই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

বর্তমান প্রগতিশীল যুগে ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ এ দুটি বিষয় আজ আলোচিত ও পরিচিত এবং এদের নিগুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করলে নিঃসন্দে স্বীকার করতে হয় যে, অর্ন্তনিহিত ভবধারা, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের দৃষ্টি ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ পরস্পর বিরোধী দুটি আদর্শ। জাতীয়তাবাদ এক সংকীর্ণ ভাবাদেশ যা বিশ্বকে বিষময় করে তুলেছে। সাধারণত স্বদেশীক আঞ্চলিকতা, বর্ণ, ভাষা, বংশ-গৌরব এবং গোত্রীয় আভিজাত্যের বোধ থে উৎপত্তি হয় জাতীয়তাবাদের। এর প্রধান উদ্দেশ্যে হচ্ছে মানবতাকে বিচ্ছি করা। অপরদিকে ইসলাম আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে গোটা বিশ্বের মানবজাতির একই আসনে সমাসীন করা। ইসলামে স্বদেশীকতা, আঞ্চলিকতা, বর্ণ, ভাষা বংশীয় আভিজাত্যের কোন স্থান নেই।

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা :

ইংরেজী শব্দ Nationalism এর ভাবার্থ জাতীয়তাবাদ। Nationalism এবং Nationality অভিন্নার্থক যা আমরা বাংলাভাষায় জাতীয়তাবাদ জাতীয়তা বলে অভিহিত করি। তবে Nationality শব্দটি জনগণ ও তার জাতি মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশক। জাতি হচ্ছে এমন এক জনসমষ্টি যা কতগুলো সাধার ঐক্যবোধে আবদ্ধ ও সংগঠিত। জাতীয়তা মূলতঃ একটি বিশেষ মানসিক ধার -জাতি একটি বাস্তব সত্তা। Encyclopadea Britannica-য় বলা হয়েছে "Nationalism is an ideology and sentiment of the individuals secul loyalty to the nation-state." জাতীয়তাবাদ বলতে অভিন্ন ভাষা বর্ণ, গো দেশ বা নিদিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখার দ্বারা পরিবেষ্টিত মানব মণ্ডলীর সামাজি এবং সামগ্রীক কল্যাণ ও প্রয়োজন পুরনে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানোকে বুঝায়। জাতীয়তাবাদের সঠিক সংজ্ঞা দেয়া কঠিন কারণ এ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক মতপার্থক্য। তাঁরা নির্দিষ্ট জাতি, বা গোষ্ঠি, অভিন্ন ভাষা, দেশ ব নৃতত্ব, সম্মিলিতভাবে বসবাসের আকাংখা, সৃষ্টির সাথে ব্যক্তির সংযোগ, অথবা

ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করে জাতীয়তাবাদের বহিপ্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয়তাবাদ নির্দিষ্ট কোন ভাবকে বুঝায় না। এ প্রসঙ্গে জুমআতুল বাওলি বলেন, 'কাওমিয়াহ বা জাতীয়তাবাদ হচ্ছে গোঁড়া চৈন্তিক রাজনৈতিক আন্দোলোন যা আহ্বান করে জাতি বা গোষ্ঠির বৈষয়িক কল্যাণের পথে এবং ধর্মীয় বর্ণ ব্যতীত রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের বন্ধনের উপর একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে।' Hans Kohn বলেন, Nationalism is first and formost a state of mind an act of conciousness. Hays. তাঁর. Essay on Nationalism গ্রন্থে বলেন, Nationalism consists of modern emotional fusion and exaggeration of two very cold phenomena- nationality and patriotism.

অপর একজন দার্শনিক মাকাইভার জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বলেন- জাতীয়তাবাদ হ'ল ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দ্বারা সৃষ্ট আধ্যাত্মিক চেতনা সম্বলিত জনসমষ্টির সম্প্রদায়গত মনোভাব যা নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র শাসনতন্ত্র রচনা করে একত্রে বসবাস করতে চায়।"

প্রফেসর লাস্কি বলেন, "জাতীয়তাবাদ সাধারণতঃ এক প্রকার মানসিক ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ জন সমষ্টি, যে ঐক্যবোধে কোন জন সমাজকে অন্যান্য জনসমাজ থেকে পৃথক করে।"

এসব সংজ্ঞা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে কোন এক জনসমষ্টি নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থে ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে একটি পৃথক সত্তা নিয়ে আলাদাভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাস করে একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে: নিজেদের ভাগ্য নিজেরা রচনা করবে কিন্তু একটি জাতি গঠন হওয়ার পর ঐ জাতির আত্মঅহমিকার প্রভাবে অন্য সব জাতির প্রতি একটি বিদ্বেষ ভাব জেগে ওঠে এবং জাতি সমুহের মধ্যে ধীরে ধীরে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে ওঠে: যা আজ গোটা বিশ্বে পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রাক ইসলামী যুগ এবং মধ্যযুগে ইউরোপে জাতীয়তাবাদ গোত্র বা বংশবাদ নামে পরিচিত ছিল। তারা নিজস্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের উপর চলত। একথায় বলা যেতে পারে যে, জাতীয়তাবাদ হচ্ছে প্রাচীনকালের গোঁড়া গোষ্ঠি বাদের নব সংস্করণ।

জাতীয়তাবাদের মৌলিক উপাদান

জাতীয়তাবাদের মৌলিক উপাদান

ঐক্য ও সম্মিলনের বহু কারণের মধ্যে কোন একটি কারণকে উপাদা করেই জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। জাতীয়তার ভিত্তি সমূহই যে গোট মানবজাতির জন্যে এক কঠিন ও মারাত্মক বিপদের উৎস হয়ে রয়েছে তা কে অস্বীকার করতে পারে না। যেসব কারণ বিশ্বমানব সমাজকে শত সহস্র ভাগে বিভক্ত করেছে তা নিম্নরূপ:

ক. বংশীয় ঐক্য: বংশ বা গোত্রবাদ জাতীয়তার একটি অন্যতম ভিত্তি। একই পিতা-মাতার ঔরসজাত হওয়ার দিক দিয়ে কিছু সংখ্যক লোকের মাঝে রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটাই হচ্ছে বংশবাদের প্রথম ভিত্তি যা সম্প্রসারিত হয়ে পরিবার রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তার থেকে ধীরে ধীরে বংশ বা গোত্রের সৃষ্টি হয়। এই বংশ বা গোত্র আত্মঅহমিকার প্রভাবে আলাদা জাতি হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামে এই বংশীয় প্রভাবের কোন মূল্য নেই যদিও ইসলাম বংশ বা গোত্রকে অস্বীকার করছেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে বংশ হচ্ছে একে অপরকে চেনার একটি সূত্র মাত্র।

খ. বর্ণের ঐক্য: এই উপাদান একই বর্ণ বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার অনুভূতি জাগিয়ে দেয় এবং উক্ত অনুভূতিই অন্যান্য বর্ণ বিশিষ্ট লোকদের হতে স্বতন্ত্র থাকার জন্য অনুপ্রানিত করে । বর্ণ কেবল দেহের একটা বাহ্যিক গুণ মাত্র। এই বাহ্যিক গুণ দ্বারা মানুষ মনুষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না। মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে তার আত্মা ও মানবিকতার জন্য। মানুষের মাঝে সাদা, কালো ও বাদামী প্রভৃতি বর্ণের দিক দিয়ে পার্থক্য করার কোন অবকাশ নাই।

অথচ তথাকথিত পশ্চিমা সভ্য সমাজ বর্ণবাদের করালগ্রাসে নিমজ্জিত। অপরদিকে ইসলাম বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে কোন পার্থক্য করে নেই; সকলকে সমান মর্যাদা দিয়েছে।

গ. ধর্মীয় ঐক্য : পৃথিবীতে তিন ধরনের ধর্মীয় সত্ত্বা বিরাজ করছে; খোদা প্রদত্ত-ধর্ম যেমন ইসলাম, খোদা প্রদত্ত-ধর্মসমূহ কিন্তু মানুষ কর্তৃক বিকৃত যেমন ইহুদী ও খৃস্টান ধর্ম এবং মানব রচিত রীতি-নীতি বা ধর্ম। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ একতাবদ্ধ হয় আর ইসলামের নির্দেশও তাই। তবে অনেকে ধর্মকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে এবং ধর্মীয় অন্ধ উম্মাদনায় মেতে ওঠে মানুষকে একতাবদ্ধ করতে পারে কিন্তু তা ঘৃণিত ও ক্ষণস্থায়ী. ইসলা[illegible] অবকাশ নাই।

ঘ. ভাষা গত ঐক্য: জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার প্রধান উপাদান হচ্ছে ভাষা। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ নিজেদের মধ্যে চিন্তার ও আদর্শের আদান-প্রদান করে এবং একই পতাকা তলে সমবেত হওয়ার যোগসূত্র খুজে পায়। এ কারণে কোন এক নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠি কোন এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে থাকার প্রয়াস চালায়।

ঙ. আঞ্চলিকতা: আঞ্চলিকতা হচ্ছে জাতীয়তাবাদের আর একটি অন্যতম কারণ। একই অঞ্চলে বহুদিন ধরে বসবাস করার কারণে একটি ঘনিষ্ট সম্প্রীতি ও বন্ধন গড়ে ওঠে এবং এক পর্যায়ে তারা নিজেদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক ভাবতে শুরু করে। এভাবে মানুষের মাঝে জাতীয়তাদের সৃষ্টি হয়। ভ্রান্ত কারণে সৃষ্ট ঐক্য সংকীর্ণতার পরিচয় বহন করে। অপরদিকে ইসলাম আঞ্চলিকতাকে স্বীকৃতি দেয় নাই। কারণ মানুষ যত বড় অঞ্চল নিয়ে বসবাস করবে, যত বেশী গোত্র বা সম্প্রদায়ের সাথে মিলেমিশে বাস করবে ততো বেশী তার মানসিক বিকাশ ঘটবে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নতি হবে এবং সম্পদেরও প্রাচুর্যতা থাকবে।

চ. মানসিক ভাবগত ঐক্য : জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মানসিক ভাবগত ঐক্য. জাতীয়তাবোধ একটি মানসিক সত্ত্বা, এক প্রকার সজীব মানসিকতা। প্রফেসর স্পেংগলারের মতে, জাতীয়তাবাদের উপাদান কুলগত বা ভাষাগত নহে বরং তা ভাবগত।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানুষের এত বিভক্তির মাঝে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই। ভাগ হয়ে মানুষ কল্যাণ ও উন্নতি যতটুকু করতে পারে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী স্থায়ী কল্যাণ ও স্বার্থ নষ্ট করে।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোন:

ইসলামে জাতীয়তার ধারণা ভিন্ন প্রকৃতির । মানুষের মাঝে ইসলাম কোন বৈষয়িক কিংবা ইন্দ্রিয়গত পার্থক্য সমর্থন করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ একই মূল হতে উদ্ভুত। পবিত্র কোরআনের ভাষায় "আল্লাহ তোমাদেরকে একই ব্যক্তির সত্ত্বা হতে সৃষ্টি করেছেন.....অতঃপর তা হতে তিনি তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের মিলনে অসংখ্য নর-নারী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন" (আন- নিসা-২)।

ইসলামে জাতীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় মহান আল্লাহর একত্ববাদ
(Monotheism) এর উপর ভিত্তি করে। মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে
তাঁর প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে মেনে নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে
এক জাতি তথা মুসলিম জাতী হিসেবে পরিগণিত হয়। এখানে বর্ণ, ভাষা, গোত্র
দেশ বা ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে পৃথক জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

ইসলামে জাতীয়তার এই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা "লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। বন্ধুত্ব আর শত্রুতা সব কিছুই এই কালেমার
ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। ইহার স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে এবং এর অস্বীকৃতি
মানুষের মাঝে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। ভাষা, গোত্র, বর্ণ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও
ভৌগলিক সীমা রেখা বা অঞ্চল মুসলমানদের মাঝে কোন বৈষম্য আনতে পারে
না। মুসলিম ব্যক্তি চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা, বা বিশ্বের যে এলাকারই
হোক না কেন সে মুসলিম জাতির অর্ন্তভূক্ত। অর্থাৎ তার জাতীয়তার প্রথম ও
প্রধান পরিচয় সে মুসলমান। আধুনিক জাতীয়তাবাদের উপাদান এখানে গৌন।
যেমন বংশের গৌরব সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, "হে মানুষ তোমরা সকলে
আদম সন্তান, আর আদমকে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের মধ্যে
সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ও মুত্তাকী ব্যক্তিই আল্লাহুর কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানীয়"
(হুজুরাজ-১২)।

এছাড়াও রাসুল (সঃ) বলেন, হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তোমাদের
জাহেলী যুগের সকল হিংসাদ্বেষ, গর্ব, বংশ গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ নির্মূল
করেছেন।

বর্ণবাদেরও স্থান ইসলামে নাই। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সঃ) বলেন,
"অনারবদের উপর আরবদের আর আরবদের উপর অনারবদের, শ্বেতাঙ্গদের
উপর কৃষ্ণদের এবং কৃষ্ণদের উপর শ্বেতাঙ্গদের কোন বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নাই"
(গাদুল মা'আদ)।

রাজনৈতিক ঐক্যের ব্যাপারেও ইসলাম দ্বিমত পোষণ করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
ভূখন্ড নিয়ে রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক ঐক্য করে পৃথক জাতি হিসেবে থাকলে
মুসলমানদের শক্তি হ্রাস পায় এবং মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমরাও
নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা একই জাতি
বা বিশ্বরাষ্ট্রের (World State) সদস্য। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ

পাক বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের জাতি একই জাতি (উম্মাহ্) এবং আমি তোমাদের
প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার ইবাদাত কর" (আম্বিয়া-৯২)। মহান
আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপি একই রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার অধীন
মুসলিম জাতীয়তা পরিচালিত হবে এটাই ইসলামের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক
দর্শন। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে তবে কেন এত জাতি এত ভাষা দুনিয়ায়
বিদ্যমান? উত্তরে বলতে হয় এগুলো একে অপরকে চিনার জন্য, ভাবের আদান
-প্রদানের জন্য ও মানুষের ভুল সংশোধনের জন্য। আল্লাহ পাক বলেন, "হে
মানবজাতি আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি" এবং
তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে
চিনতে পার" (হুজুরাত-১৩)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালা মানব
জাতিকে বিভিন্ন জাতিতে ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন শুধুমাত্র একে অপরকে
জানার জন্য ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য। হানাহানী, হিংসা-বিদ্বেষ, ও জাতির
শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে অন্য জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন বা দখল করার জন্য নয়।
বিচ্ছিন্নতাবাদ বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সমর্থন করে না। এ
ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ হচ্ছে "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলাম) দৃঢ়ভাবে
ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (আল-ইমরান-১০৩)। অর্থাৎ
মুসলমানরা এক জাতি হয়ে পরস্পরে ভাই ভাই রূপে থাকবে; সেখানে কোন
ভৌগলিক সীমারেখা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না। যেমন আল্লাহপাক বলেনঃ
"সকল মুমিন পরস্পরের ভাই" (হাজুরাত-১০)

মহানবী (সঃ) বলেন -পারস্পরিক প্রেম ভালোবাসা ও স্নেহ-বাৎসল্যের
দিক দিয়ে মুসলিম জাতি একটি পূর্ণাঙ্গ দেহের সমতুল্য। উহার একটি অঙ্গ কোন
ব্যাথা অনুভূত হলে গোটা দেহই সেজন্য নিদ্রাহীন ও বিশ্রামহীন হয়ে পড়ে।
সুতরাং একটি দেহের ন্যায় মুসলিম জাতিকে আঞ্চলিকতার নামে বিভক্ত করা
ইসলাম সমর্থন করে না।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, যেসব গন্ডিবদ্ধ জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
বৈষয়িক ও কুসংস্কারপূর্ণ ভিত্তির উপর পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয়তার প্রাসাদ স্থাপিত
হয়েছে রাসুল (সঃ) সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে ইসলামের অমোঘ বাণীর
উপর ভিত্তি করে ইসলামী বা মুসলিম জাতীয়তাকে স্থাপন করেছেন যার বন্ধন
স্থায়ী ও মজবুত। বিশ্বনবীর জাতীগঠনের বিপ্লবকে অভূতপূর্ব সৌভাগ্যরূপে

অভিহিত করে একজন পশ্চিমা দার্শনিক বসওয়ার্থ বলেন, "By a fo
absolutely unique in history Muhammad (PBUH) is a three
founder of a nation of an empire and of a relegion." শব
এককথায় বলা যায় যে, ঈমান, তাওহীদ এবং একমাত্র খোদাই সার্বভৌ
ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি।

পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়:

মধ্যযুগে গোটা ইউরোপ ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। খৃষ্টান পাদ্রী
ইহুদী ধর্মযাজকরা মানবজীবনের সকল ক্ষেত্র বেষ্টন করে রেখেছিল। খৃ
লোকদেরকে স্বর্গ-নরকের সনদ বিতরণ করত। তাদের ছিলপ্রচুর ক্ষমতা। এম
অনেক সময় রাজার হুকুমকে পদদলিত করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহি
সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতো। তখন মুসলিম বিশ্বে শি
সাহিত্য ও সভ্যতার চরম স্তর বিরাজমান ছিল। ঐ সময় পাদ্রিদের প্ররো
ইউরোপীয় শাসকগণ ধর্ম রক্ষার দোহাই দিয়ে (১১০০-১৩০০ খৃষ্টাব্দ) ম
মুসলমানদের সাথে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না
ইউরোপীয়রা এক নতুন দিগন্তের আভাস পায় অর্থাৎ তারা মুসলমান
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার সাথে পরিচিত হয় এবং ইউরোপে এগুলো ছড়িয়ে প
এরই আলোকে মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬ খৃঃ) সংস্কারমূলক বিপ্লব ঘট
তিনি সর্বপ্রথম গীর্জার নাগপাশ হতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পাদ্রী
শিক্ষাকে শয়তানের শিক্ষা বলে ঘোষণা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হতে
হতেই তারা ধর্মকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া শিক্ষা-সংস্কৃতির দিকে ঝুকে প
ও দার্শনিকদের চিন্তাধারা গ্রহণ করে নাস্তিকতার পথে ধাবিত হয়। এর কিছুক
পরে ফরাসী বিপ্লব ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে শুরু হয় পাশ্চা
জাতীয়তাবাদ। উনবিংশ শতাব্দী ইতিহাসে স্থান পায় জাতীয়তাবাদী
হিসেবে। ইউরোপীয় ঐ জাতীয়তাবাদ এস আঘাত হানে মুসলিম বিশ্বে। ১৯২
১৯২২ সালের দিকে তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে প্রথম তুরস্ক
জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা পায়। এর পরে তা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়
মুসলিম বিশ্বে কয়েকটি উপায় পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে যেমন
১৭৯৮ খৃস্টাব্দে নেপোলিয়ানের নেতৃত্বে মিসর দখল, দ্বিতীয়ত: উনবিং
শতাব্দীতে সিরিয়া, লেবানন ও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় ব্যাপকহার

মিশনারী তৎপরতা, তৃতীয়ত: তুরস্কের নেতা কামাল আতাতুর্কের গঠিত তুর্কী যুব সংস্কার মাধ্যম এবং

চতুর্থত: মুসলিম Orientalist দের ব্যাপক প্রচারনা। আজ ইউরোপের ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের এমনভাবে গ্রাস করেছে যার ফলে মুসলমানদের ঈমান ও আমল সঠিক পথ সরে এসেছে। মুসলমানরা সহজেই হাজার ভাগে বিভক্ত হয়েছে। তাদের নিজস্ব বলতে কিছুই নেই। আর এই সুযোগে ইউরোপীয় জাতীয়বাদী এক জোট (EEC) হয়ে মুসলমানদের শাসন-শোষণ ও অত্যাচার করার নতুন করে মহাপরিকল্পনা করছে। আমার মনে হয় ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের দর্শনের-এটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। আজ তারা সেই লক্ষে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে।

পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী আদর্শের মৌলিক পার্থক্য :

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী আদর্শ পরস্পর বিরোধী এ দুটি মতাদর্শের মধ্যে যে সব মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান তা নিম্নরূপ;

ক. বর্ণ, গোত্র, ভাষা, ভৌগোলিক সীমারেখা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত। সংকীর্ণ এ জাতীয়তাবাদের উগ্রতায় আজ বিশ্বমানবতা খন্ডিত ও বিখন্ডিত। অপর দিকে ইসলামে জাতীয়তার ভিত্তি ঈমান ও এক খোদার সার্বভৌমত্ব। এই জাতীয়তার বিস্তৃতি অসীম। দুনিয়ার সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং এর স্থায়িত্ব চিরন্তন।

খ. পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা অর্থাৎ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। কিন্তু ইসলামী জাতীয়তাবাদ তাওহীদ বা একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ধর্মকে তথা ইসলামকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে শুরু করে জীবনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

গ. পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় প্রত্যেক জাতির সদস্য অন্য জাতি হতে শ্রেষ্ঠ এই মতাদর্শে বিশ্বাসী করে তোলে। ফলে মিথ্যা আভিজাত্যের অহংকারে প্রত্যেক জাতি আগ্রাসী হয়ে ওঠে এবং শুরু হয় জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বিগ্রহ। কিন্তু ইসলামী আদর্শে বাহিকতার কোন স্থান নেই। খোদাভীতি ও সৎকর্মের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ইহা মুসলিম জাতির প্রতিটি সদস্যকে বিনয়ী, নম্র, ও পরমত সহিষ্ণু করে গড়ে তোলে।

ঘ. পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ বিশ্বমানবতাকে বিখন্ডিত করে ছোট ছোট জাতীয় রাষ্ট্র (Nation State) প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহ যোগায় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন দেয়। অপরদিকে ইসলামী জাতীয়তাবাদ সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে বিশ্ব রাষ্ট্র (World State) অথবা সমগ্র মুসলিম এলাকা নিয়ে Pan-Islamic State প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলামী জাতীয়তাবাদে বিশ্বের সকল মানুষকে একই পরিবার ভূক্ত বিবেচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে যেমনটি রাসুল(সঃ) বলেন, "Mankind is the family of Allah and the most beloved of them before Him is one who is best of his family.।" অন্য কথায় বলা যায় যে, ইসলাম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও জাতীয় সংকীর্ণতাকে উপেক্ষা করে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে সকলকে আহবান জানায়। এ প্রসঙ্গে একজন মনীষী বলেন "This divine law(Islam) has prescribed the Universal brotherhood of mankind irrespective of colour, race, tribe, language or rationalism.

পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট সমুহ:

ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে জাতীয়তাবাদের বিশেষ কোন সুফল বা ইতিবাচক দিক নেই, তবে যেহেতু বিশ্বে জাতীয়তাবাদ বিরাজ করছে সেহেতু এর কিছু ইতিবাচক দিক অবশ্যই আছে। যেমন জাতীয়তাবাদের কারণে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় কোন এক নির্দিষ্ট ভূখন্ড নিয়ে স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে পারে। নিজেদের ভাগ্য নিজেরা রচনা করতে পারে। অন্য জাতিকে তাদের ব্যাপারে সহযোগিতা ব্যতীত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। নিজ জাতির কল্যাণের জন্য নিজস্ব ষ্টাইলে শিক্ষা-সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটায় এবং আইন-কানুন প্রনয়ন করে নিজেদের মধ্যে একটি পৃথক রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করে ঐক্য গড়ে তোলে এবং নিজ জাতি ও ভূখন্ডকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদের সুফল যাই থাকুক না কেন এর কুফল বা নেতিবাচক দিক অনেকগুণ বেশী। প্রথমত: জাতীয়তাবাদের মধ্যে আগ্রাসনবাদ নিহিত রয়েছে। এক সময় জাতীয়তাবাদকে গণতন্ত্র ও উদারনীতির (liberty) সহযোগী

বলা হত কিন্তু জাতীয়তাবাদ এমন এক পর্য্যায়ে চলে গিয়েছে যেখানে রয়েছে পরস্পরের প্রতি ঘৃনা ও আগ্রাসী মনোভাব। এ কারণে আজকে অনেকে জাতীয়তাবাদকে সর্বগ্রাসীবাদ (Totalitarianism) বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। জাতীয়তাবাদের মধ্যে রয়েছে অসহিষ্ণুতা সংকীর্ণতা ও আত্মঅহমিকা: যার কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকে এবং সব বড় বড় জাতি ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন ..Nationalism was a great menace because it called for a strenuous effort after strength and efficiency and thereby drains man's energy from his higher nature where he is self sacrificing and creative. একজন রাশিয়ার দার্শনিক V. Solovyv বলেন "It destroys a nation, for it makes it the enemy of mankind. অন্য একজন দার্শনিক Hays জাতীয়তাবাদকে শয়তানী শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন "It is a curse and nothing but a curse."

জাতীয়তাবাদের প্রভাবে সৃষ্ট রাষ্ট্রের আয়তন কমে যায় এবং সম্পদের স্বল্পতার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও অন্যান্য জাতির বা অন্যান্য ভাষাভাষির লোকদের সাথে বসবাস না করার কারণে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদান-প্রদান হয় না। ফলে নির্দিষ্ট জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতির উন্নতি হয়না এবং মানসিক বিকাশ ঘটে না। জাতীয়তাবাদী লোক যতই নিজেকে প্রগতিশীল ও উদার মনে করুক না কেন উপরোক্ত কারণে সে প্রকৃতপক্ষে থাকে সংকীর্ণমনা ও পরশ্রীকাতর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জাতীয়তা

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে নাগরিকতা হচ্ছে এমন একটি উপাদান যা রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মাঝে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সৃষ্টি হয়। আধুনিক যুগে এটাকে ব্যক্তির জন্যে রাজনৈতিক অধিকার বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর অধিকার শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কিছু প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আর অধিকার হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত এমন কিছু সুযোগ সুবিধা যা অস্বীকারযোগ্য নয়, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত এমন সব সুযোগ সুবিধা যা রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তি তলব করতে পারে। এ প্রসঙ্গে একজন মুসলিম মনীষী আলী খাফিফ (মিসরীয়) বলেন, অধিকার হচ্ছে এমন কিছু সুযোগ-সুবিধা যা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মানুষের উপর অর্পিত হয়। অপর একজন দার্শনিক (Salmond) বলেন, অধিকার হচ্ছে আইন দ্বারা অর্পিত বা স্বীকৃত মানুষের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা। রাজনৈতিক অধিকার হচ্ছে সেই সব অধিকার যা কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন দেশের নাগরিক হিসেবে অর্জন করে থাকে। এবং এর মাধ্যমে কোন ব্যক্তি দেশের কল্যাণ বা উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের অংশ হিসেবে ভোগ করে থাকে। আর জাতীয়তা বা নাগরিকতা হচ্ছে একটি অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার। তাই জাতীয়তা অর্থে আর্ন্তজাতিক আইনে এমন একটি বাধাবাধকতাকে বুঝায় যা নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্রের জনসাধারণকে একতাবদ্ধ করতে সহায়তা করে। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব কোন বিশেষ ব্যক্তি লাভ না করলেও সে আর্ন্তজাতিক আইনের সর্বজন স্বীকৃত নীতি মোতাবেক উক্ত রাষ্ট্রের কাছ থেকে সব প্রকার নিরাপত্তা সুবিধা ভোগ করার অধিকারী। কেননা ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজ নিজ জাতীয়তার মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক আইনের সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

জাতীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন: জে. জি. ষ্টার্ক বলেন, -জাতীয়তা হচ্ছে কোন দল বা সম্প্রদায়ের কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সদস্যপদ লাভের আইনগত একটি উপাদান যার মাধ্যমে তার রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায় এবং সে ঐ রাষ্ট্রের আওতার মধ্যে থেকে সকল ধরনের আইন-কানুন, নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলা ও এ ব্যাপারে নিজের

মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়।

অধ্যাপক ওপেনহাম-এর মতে, জাতীয়তা হচ্ছে একটি বিশেষের গুণাবলী, যা নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্রের বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য হয় এবং উক্ত গুনাবলীর মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে।

এ ব্যাপারে অপর একজন মুসলিম মনীষী আহমেদ মুসলিম (মিসরীয়) বলেন, "-নাগরিকত্ব হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয় তুলে ধরার একটি উপাদান যার মাধ্যমে সে বৃহত্তম কোন জনগোষ্ঠির সদস্যপদ লাভ করতে সক্ষম হয়, বা এই উপাদানের মাধ্যমে সে কোন নির্দিষ্ট দেশের সদস্যপদ লাভ করে থাকে আর সে উপাদান ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মাঝে রাজনৈতিক ও আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে"।

উপরোক্ত সংজ্ঞা তিনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এদের মধ্যে বিষয় বস্তুর দিক থেকে কোন পার্থক্য নাই, অর্থাৎ জাতীয়তা হচ্ছে ব্যক্তি পরিচয়ের একটি উপাদান মাত্র। শরীয়াহ্ বা ইসলাম উক্ত উপাদানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলামী আর্ন্তজাতিক আইনে এই উপাদানকে বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ইসলামী রাষ্ট্র বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং অভ্যন্তরীনভাবে নাগরিকদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান করে । যদিও ফকিহ্‌গণ এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেন নাই, কারণ এটি আধুনিক যুগের একটি রাজনৈতিক পরিভাষা।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনের পথ প্রতিটি মুসলমানের জন্য উন্মুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে সে কোন ধরনের শর্ত ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার অধিকার রাখে। একজন ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সুদৃঢ় এবং স্থায়ী। এই সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের সাধারণ আইন-কানুন ও প্রথাসমূহ। রাষ্ট্র তার নাগরিককে আইন ও প্রথা মোতাবেক সকল ধরনের অধিকার নিশ্চিত করবে এবং জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করবে। এ ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবন-যাত্রার মান সমুন্নত রাখা ওয়াজিব মনে করে।

জাতীয়তার ভিত্তি:

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকতা বা জাতীয়তা ভিত্তি হচ্ছে দ্বীন বা ধর্ম। অর্থাৎ কারো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের অধিকার

সৃষ্টি হয়; যদিও সে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করছেনা। তবুও যে কোন সময় ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করতঃ বসবাস করার অধিকার রা মুসলমানদের সাদা-কালো, আরব-অনারব, বাঙালী-অবাঙালী ইত্যাদির কোন পার্থক্য নাই। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ কোরআনে স্পষ্ট করে বলেন, "মুমিন মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই" (হুজরত-৯)। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান যে, সকল মুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের অধিকারী। পৃথি যে কোন স্থানে বসবাসকারী মুসলমানকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে গ করা হয় এবং তাদের সকল ধরনের সহযোগিতা করা ও রক্ষণা-বেক্ষণ রাষ্ট্রের উপর ওয়াজিব। কিন্তু বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতীত বিশ্বের অন্যা এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে গণ্য হয় না। কারণ

প্রথমতঃ তারা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করছে এবং সে মর্মে আই কানুনও অনুসরণ করতে পারছে না।

দ্বিতীয়ত:অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রে শরীয়াহ অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিতা হচ্ছে না। পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারনার আলোকে রচিত আইন মোতাবেক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে এবং এর ফলে তাদের মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল নিয়ে পাশ্চাত্য দর্শনের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছে। যার কারণে তারা শীরয়াহ্ পরিপন্থী কাজ পরিলক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ আরব-অনারব, সাদা-কালো, ধনী-গরীব ইত্যাদিতে পার্থক্য করা হচ্ছে। এ কারণে আজকে এক মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিককে অপর মুসলিম রাষ্ট্র স্বীকার করছে না। এখানে উল্লেখ্য যে, শরীয়াহ ব্যবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র একটি হতে হবে এমন কোন কঠোর বিধান নেই: কয়েকটি হতে পারে বা বিভিন্ন প্রদেশ বা ডোমিনিয়ন হতে পারে, তবে প্রতিটি প্রদেশ বা ডোমিনিয়ন শরীয়াহ্ অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে। আল্লাহ পাক বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও গোত্র সৃষ্টি করেছেন একে অপরকে জানার জন্যে। তবে তাঁর কাছে এবং আমাদের পরস্পরের কাছে বড় পরিচয় মুসলমান হিসেবে, অর্থাৎ আমাদের প্রথম পরিচয় মুসলমান, এর পরে আসে বাঙালী-অবাঙালী, আরব-অনারব, ইরানী-মিসরী ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের বাণী হচ্ছে 'হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে

জাতীয়তা পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার (হুজুরাত -১২)।

নাগরিকতা অর্জনের উপায়:

শরীয়াহ্ নাগরিকতা অর্জনের কয়েকটি উপায় বর্ণনা করেছে, যেমন জন্মগত, রাষ্ট্রীয়করন, ও অধীনস্তকরন।

১. জন্মগত(by birth) : একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে জন্মগত অধিকারই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ন অধিকার। স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই এ অধিকার অর্জিত হয়। তাই ইসলামী রাষ্ট্র বসবাসকারী প্রতিটি লোক জন্মগতভাবে নাগরিক।

২. রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা(by naturalisation): রাষ্ট্র তার নিজস্ব আইন বা স্থানীয় আইনের বিধান দ্বারা রাষ্ট্রীয়করণ পদ্ধতির মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জনের সুযোগ দিতে পারে। বিবাহ বন্ধনের দ্বারা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর নাগরিকতা বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর নাগরিকতা এবং কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের দ্বারা নাগরিকত্ব অর্জিত হতে পারে। যেমন যদি কোন মুসলমান অন্য দেশ থেকে এসে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস শুরু করে এবং নাগরিকত্বের আবেদন করে অথবা অন্য দেশের কোন অমুসলমান মুসলমান হয়ে নাগরিকত্বের আবেদন করে সেক্ষেত্রে সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে।

৩. অধীনস্তকরণ দ্বারা (by subjugation): একটি নতুন এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হলে (যুদ্ধ জয়/ চুক্তির মাধ্যমে) সেখানকার অধিবাসীরা নাগরিকতা অর্জনের অধিকার রাখে বা নাগরিক হয়ে যায়।

এই পদ্ধতি সমুহ সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনেও অনুরূপভাবে বিধৃত রয়েছে।

অমুসলমানদের নাগরিকতা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোন:

পূর্বে বলা হয়েছে যে মুসলমানরাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত অধিবাসী, তবে তাদের সাথে জিম্মা বা নিরাপত্তা চুক্তির মাধ্যমে অমুসলমানরা বসবাস করতে পারে কেননা মুসলমানদের সাথে অমুসলমানদের লেনদেন বা সামাজিকভাবে আদান-প্রদান নিষেধ নয় এবং তাদেরকে দারুল ইসলামে অবস্থানের ব্যাপারে কোন আপত্তি করেনা। এ ব্যাপারে রাসুল (সঃ) একটি

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন যার মাধ্যমে দারুল ইস-
মুসলমানদের সাথে অমুসলমানদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসুল (সঃ)
স্বাক্ষরিত চুক্তিতে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে সম্ভাবা সকল ধরনের
বজায় রাখার বিষয় বর্নণা করা হয়েছে। চুক্তির আলোকে অমুসলমানরা তা
নিজ নিজ ধর্ম-বিশ্বাস ও নাগরিকতাসহ বসবাস করার সুযোগ পায়। রাসূল
(সঃ) স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক সনদে বলা হয়েছে যে. ইহুদী সম্প্রদায়ের আও
নাজজার. হারেস. সা'আদা. জেসম. আওস ও সালাবা মুসলিম উম্মাহর স
সম্পৃক্ত তবে তারা তাদের ধর্ম পালন করবে আর মুসলমানদের জন্য ইসলাম ধ
এ প্রসঙ্গে ফকিহ্গণ বলেন যে. জিম্মা চুক্তির মাধ্যমে দরুল ইসলামে বসবাসকা
অমুসলমানদের নাগরিকত্ব অর্জনের অধিকার আছে কেননা নাগরিকত্ব হচ্ছে দে
ও ব্যক্তির মাঝে একটি রাজনৈতিক ও আইনগত যোগসূত্র। এ যোগসূত্র ছা
কোন লোক কোন দেশের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেনা।

অমুসলমানদের নাগরিকত্বার ভিত্তি :

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শরীয়তে নাগরিকতার ভিত্তি- হচ্ছে দ্বী
এবং রাষ্ট্র বা ভূখন্ড। অতএব, মুসলমান অথবা অমুসলমান উভয়ই দারুল
ইসলামের নাগরিক তবে এটা একটি মাত্র হাকুমাতের অধীন হতে পারে অথবা
একাধিক হকুমতের অধীন হতে পারে. যেমন মিসরী. ইরানী বাংলাদেশী ইত্যাদি।
এই পার্থক্য অঞ্চল বা প্রদেশগত: শরীয়তে এমন কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং
শরীয়তে দ্বীনের ভিত্তিতে মুসলমানরা এবং জিম্মা চুক্তির ভিত্তিতে অমুসলমানরা
একই নাগরিকতা ভোগ করে থাকে। এর পরেও মুসলিম মনীষীরা অমুসলমানদের
নাগরিকত্বর ব্যাপারে পৃথক পৃথক ভাবে দুটি ভিত্তির কথা বলেছেন:

১. জিম্মা চুক্তি এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন-কানুন মেনে
চলা।

২. চুক্তি মোতাবেক ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করা।

এ প্রসঙ্গে সারাখসী বলেন. জিম্মা চুক্তির মাধ্যমে অমুসলমানরা ইসলামী
রাষ্ট্রের অধিবাসী হতে পারে। মুসলমানদের মত অমুসলামনরা (পূর্বে উল্লেখিত
পদ্ধতি অনুযায়ী) নাগরিকতা অর্জন করতে পারে। যেমন অমুলমানের ঘরে
জন্ম-গ্রহণকারী শিশু তাঁর পিতাকে অনুসরণ করবে অর্থাৎ উক্ত শিশুটি দারুল
ইসলামের নাগরিক হবে। কেননা তার পিতা উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিক। যদি কোন

অমুসলমান দারুল ইসলামে বসবাস করার অনুমোদন লাভ করে (জিম্মা চুক্তির
আওতায় আসে) তখন তার সন্তানরা ও চুক্তির আওতায় আসে এবং এভাবে উক্ত
অমুসলিম ও তার সন্তানরা নাগরিকতা অর্জন করতে পারে। এব্যাপারে অধিকাংশ
ফকীহ্ ঐক্যমত পোষণ করেন। অনুরূপভাবে স্ত্রী তার স্বামীকে অনুসরণ করবে।
অর্থাৎ কোন জিম্মি পুরুষ কোন জিম্মি নারীকে বা অমুসলিম নারীকে বিবাহ করলে,
সেক্ষেত্রে উক্ত নারী রাষ্ট্রের নাগরিক হবে। আবার স্বামীর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে
নাগরিকতা অর্জিত হলে স্ত্রী ও নাগরিকতা অর্জন করতে পারবে । তবে স্ত্রীর
ইসলাম গহণ করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু যদি
কোন জিম্মি রমনী কোন অমুসলিম পুরুষ অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বাহিরে অন্য
কোন রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম পুরুষকে বিবাহ করে সেক্ষেত্রে উক্ত জিম্মি অথবা
অমুসলিম পুরুষ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারবে না। কারণ কোন পুরুষ
কোন নারীর অনুসরণ করবে না। এ প্রসঙ্গে শায়বানী বলেন. স্ত্রী স্বামীর
অনুসরণকারী কিন্তু স্বামী স্ত্রীর অনুসরণকারী নয়।

সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনেও অনরূপ ধারণা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ
কোন স্ত্রীলোক যদি কোন বিদেশী নাগরিককে বিবাহ করে. সেক্ষেত্রে তার মূল
জাতীয়তা লোপ পাবে এবং স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করবে। এর থেকে
প্রতীয়মান হয় যে. স্ত্রীর কারণে স্বামীর নাগরিকতা অর্জিত হয় না। বরং স্ত্রীর মূল
জাতীয়তা লোপ পেয়ে স্বামীর রাষ্ট্রের জাতীয়তা অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে আব্দুল
কাদের আওদাহ (মিসরীয়) সামান্য ব্যতিক্রম এনে বলেন. অন্য রাষ্ট্রের কোন
অমুসলিম যদি হিজরত (Migration) করে ইসলামী রাষ্ট্রে আসে এবং কোন
জিম্মি রমনীকে বিবাহ করে সেক্ষেত্রে সে উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করতে
পারবে। তবে এটা অর্জিত হবে তার হিজরতের কারণে. বিবাহ বা স্ত্রীর কারণে
নয়।

বর্তমান যুগের কতিপয় মনীষী বলেন: অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের
অধিকার ভোগ করতে পারবে না। কারণ মুসলমানরা যে অধিকার ভোগ করছে
অমুসলমানরা তা পারেনা। মুসলমানদের দায়-দায়িত্ব অমুসলমানদের থেকে
আলাদা। অতএব এ রাজনৈতিক অধিকার শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য। যেমনঃ
জিজিয়া জিম্মিদের জন্য আর মুসলমানদের জন্য যাকাত ব্যবস্থা। যদি তারা এ
অধিকার ভোগ করে. তখন তাদের উপরে মুসলমানদের অনুরূপ দায়-দায়িত্ব

বর্তায়, কিন্তু বাস্তবে ইসলামী রাষ্ট্রে তা হতে পারেনা। বর্তমান যুগের শরীয়া বিবর্জিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুসলিম-অমুসলিমের দায়-দায়িত্ব ও অধিকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

নাগরিকতার বিলুপ্তি:

জাতীয়তা বা নাগরিকতা চিরস্থায়ী নয়। কোন কারণে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাগরিকতা পরিবর্তন হতে বা লোপ পেতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় দারুল ইসলামের নাগরিকতার দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চায় সেক্ষেত্রে প্রশাসন বিবেচনা করে অব্যাহতি দিতে পারে। আবার অনেক সময় রাষ্ট্র মঞ্জুরীকৃত কোন ব্যক্তির নাগরিকতা বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। বিশেষ করে যখন কোন জিম্মি অবাঞ্ছিত কোন কাজ করে; তখন প্রশাসন এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এছাড়া যেমন জিম্মি নারী অন্য দেশের কোন অমুসলিমকে বিবাহ করলে উক্ত নারীর ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকতা বাতিল হবে। সবশেষে শর্তসাপেক্ষে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় জাতীয়তা অর্জন করলে শর্তের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নাগরিকতাও বিলুপ্ত হবে। জিম্মিদের ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটতে পারে।

সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে জাতীয়তা বিলুপ্তির ব্যাপারে অধ্যাপক ওপেনহাম নিম্নরূপ পাঁচটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন।

ক. অব্যাহতি লাভের দ্বারা:
খ. বাতিল করণের দ্বারা:
গ. পরিত্যাগ করণের দ্বারা:
ঘ. বিবাহের দ্বারা:
ঙ. শর্তাবলীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দ্বারা।

ওপেনহামের উল্লিখিত পাঁচটি পদ্ধতির সাথে শরীয়ার বিধি-বিধানের তেমন কোন বড় ধরণের অসামাঞ্জস্যতা নাই।

নবম পরিচ্ছেদ

কূটনীতি

সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ কূটনৈতিকতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুপ্রাচীনকাল থেকেই গোত্র, সম্প্রদায়, জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক প্রথার প্রচলন ছিল। এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের যোগাযোগ, সম্পর্ক স্থাপন, শান্তি প্রতিষ্ঠা ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কূটনৈতিকতার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ার সুযোগ লাভ করে। নিজেদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি ও শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে যে সুক্ষ্ম কূটনৈতিকতার প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে তা বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হচেছ তবে সেক্ষেত্রে নৈতিকতা. সততা ও ন্যায়ানুগের কোন স্পর্শ থাকে না। যুদ্ধ বিজয়ের মত কূটনৈতিক বিজয়কেও বাহ্‌বা দেয়া হয় কিন্তু কোন্ পদ্ধতিতে সাধিত হয়েছে-সেদিকে খুব কম গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে এর পাশাপাশি ভিন্নরূপের আর একটি কূটনীতি রয়েছে যাতে রয়েছে- সততা, আন্তরিকতা ও ন্যায় নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল প্রমাণ যা বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথকে সুগম করে। ইসলাম প্রদর্শিত যে কূটনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে ইনসাফ ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সমূহের শান্তিপূর্ণ উপায় সমাধান করে ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পায়।

ইসলামের আবির্ভাব ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রক্ষার্থে শুরু হয় মুয়ামালাতের (রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদান-প্রদান)-এর বাস্তব প্রক্রিয়া ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম। নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের যোগাযোগ রক্ষা ইসলামের স্বার্থেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। আর এ ক্ষেত্রে রাসুল (সঃ) স্বয়ং কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি বিভিন্ন দেশ ও রাজন্যবর্গের সাথে দূত বা প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তাঁর উত্তরসূরীরা মহানবীর

পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে ইসলামী কূটনীতির সততা ও নি
নিষ্ঠার আকর্ষণে দলে দলে লোক ইসলামের ছায়াতলে আসে এবং একের পর এ
রাষ্ট্র ইসলামী সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। কিন্তু কালের চক্রে মানুষ হয়ে প
বিভ্রান্ত। দেশে দেশে শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর হানাহানি। এক্ষেত্রে মুসলি
রাষ্ট্রগুলো অগ্রগন্য। এর অন্যতম কারণ-ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনে
ইসলামকে বাস্তবায়ন না করা। এরই প্রেক্ষাপটে আজ নতুন করে অনুভূত হচ্ছে
ইসলামী কূটনীতি যা বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক এবং বিরাজমা
সমস্যার সমাধানের রক্ষা কবজ। যদিও আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতির ক্ষেত্রে
ইসলামের অবদান পশ্চিমা পন্ডিতগণ স্বীকার করেননি। তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন যু
বলে কথিত সময়ে ইসলামের অবদানকে গুরুত্ব দেননি। এ ছাড়াও কূটনীতি
কথাটার মধ্যে প্রতচ্ছন্নভাবে একটা নিন্দিতভাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইসলাম যে
কূটনীতির ধারণা দেয় তাতে রয়েছে সততা, নিষ্ঠা, প্রবঞ্চনাহীন, সমস্যা সমা
ধানের সাহসী উদ্যোগ ও বন্ধুত্বের এক আন্তরিকতাপূর্ণ বিষয়। আপন রাষ্ট্রের
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যায়, অসত্য ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়ার কোন সুযোগ
ইসলামে নেই। তাই ইসলামের সত্য, সুন্দর ও প্রবঞ্চনাহীন কূটনীতিকে অনুধাবন
করার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারনা করা হয়েছে। কেননা আন্তর্জাতিক আইনের
উপরে মুসলমানদের কিছু অবদান থাকলেও কূটনীতির ক্ষেত্রে যথাযথ নজর দেয়া
হয়নি বলে আমাদের বিশ্বাস।

কূটনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

সভ্যতার কোন শুভলগ্নে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কূটনীতি
(Diplomacy) শব্দটির উদ্ভব ঘটেছিল সে সম্পর্কে পরিস্কারভাবে কিছু বলা যায়
না। কিন্তু আধুনিককালে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এটা একটা অপরিহার্য্য অংশ হয়ে
দাঁড়িয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাষ্ট্র সৃষ্টির সাথে সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার
জন্য কূটনীতির প্রচলন শুরু হয়।

মূলতঃ আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাস ও কূটনীতি গ্রীক নগর রাষ্ট্র থেকে
শুরু হয়ে রোমান যুগে সম্প্রসারিত হয় বলে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনবিদদের
ধারনা। রোমান ও গ্রীকরাই আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রের কাঠামো উপস্থাপন করে এবং
অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে; বিশেষ করে

রোমান সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালে রোমান সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয় এবং
অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক থুসিডিড-এর
বিবরণ থেকে পাওয়া যায় যে আধুনিক যুগের মত স্থায়ীভাবে দূত বিনিময়ের প্রথা
তখন প্রচলিত ছিলনা বটে কিন্তু বিশেষ কারণে প্রয়োজনে বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের
মধ্যে দূত বিনিময় হতো। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন চীন, মিসর ও ভারতের
বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও দূত বিনিময়ের প্রচলন
বিদ্যমান ছিল। যদিও আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে ইউরোপকে
দেখান হয়। তাদের মতে আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাস ও কূটনীতি গ্রীক নগর
রাষ্ট্র ও রোম সভ্যতা হতে উদ্ভূত এবং এর পরে এক ধাপে আধুনিক যুগের উত্তরণ
ঘটেছে। এর মাঝের প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাসকে এ অজুহাতে বাদ দেয়া
হয়েছে যে, মধ্যযুগে আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতির কোন প্রয়োজন ছিল না।
অথচ প্রকৃত পক্ষে কূটনীতির তথাকথিত অন্ধকারময় যুগ বলে যে সময়কে বাদ
দেয়া হয়েছে তা ছিল ইসলামের আবির্ভাব ও প্রসারের কাল। ঐ সময় সত্যিকারের
বাস্তবধর্মী ও সমস্যা সমাধানে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় দিগ্বিজয়ী কূটনীতি চালু হয় ও
সম্প্রসারণ ঘটে। মক্কায়-এর উৎপত্তি হয়ে একদিকে উত্তর আফ্রিকা হয়ে স্পেন
এবং ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত অপর দিকে এশিয়া মাইনর হয়ে সুদূর চীনের
তুর্কমেনিস্থান পর্যন্ত ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পেনকে সহায়ক দেশ
হিসাবে ব্যবহার করে দক্ষিণ ইটালী ও এমনকি সুইজারল্যান্ডেও ইসলাম প্রচারিত
হয়। স্পেন থেকেই ইসলামের সংস্কৃতি সমগ্র ইউরোপে প্রসার লাভ করে। এ
সময় ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন এবং কূটনীতি বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন
হয়। মুসলিম শাসকদের আন্তরিকতা, মহানুভবতা এবং কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় মুগ্ধ
হয়ে অমুসলমানগণ ইসলামের ছায়াতলে আসে। ইসলাম আবির্ভাবের পর
আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতির ক্ষেত্রে একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছে।
ইসলাম মানুষের সমানাধিকার ঘোষণা করেছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
"হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি
করেছি" (হুজুরাত ১৩)।

সকল মানুষ সমান এই নীতির উপর ভিত্তি করে ইসলাম তার
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রসার ঘটায়। মুসলিম অমুসলিম সকল রাষ্ট্রে ইসলামী
আন্তর্জাতিক আইন প্রতিপালিত হতে পারে। ইউরোপীয় লেখকগণ কর্তৃক লিখিত

"জুরা বেলী" বা যুদ্ধের আইন বস্তুতঃ আরবী ভাষায় লিখিত জিহাদ নীতির প্রতিধ্বনি মাত্র। এ থেকে আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে ইসলামের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক কূটনীতির সূত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের কূটনৈতিক কার্যক্রম অত্যন্ত ফলপ্রসূ ছিল। কূটনীতির কতিপয় মৌল উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক সমস্যা সমূহের শান্তিপূর্ণ সমাধান ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। একটা রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে নবী করীম (সঃ) এসব উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কূটনীতির সর্বজন গ্রাহ্য পদ্ধতি যথা আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা এবং সালিসীর মাধ্যমেই তিনি সফলতা অর্জন করেন। পবিত্র কোরআনপাকে নবী (সঃ) কে কূটনীতির মৌলনীতি সম্পর্কে নিম্নরূপ প্রবহিত করা হয়েছে: পবিত্র কোরআন পাকে বলা হয়েছে, "মানুষের সাথে উত্তম কথা বল" (বাকারাহ- ৮৩)।

ধর্মপ্রবর্তকের ভূমিকা পালন করার বহু পূর্বেই কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরিচয় পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি মক্কায় ঘটে। এ সময় রসুল (সঃ) এর বয়স মাত্র ২০ বছর। কাবা শরীফের পুনঃনির্মাণ শেষে কালো পাথরকে (হজরে আসওয়াদ) যথাস্থানে স্থাপন করাকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ কে বা কোন গোত্র স্থাপন করবে এই নিয়ে ভীষণ গোলযোগ দেখা দেয়। চারদিন পরে আলাপ-আলোচনায় কোন ফলাফল না দেখে পঞ্চম দিনে আবু উমাইয়া বিন আল মুগিরা বিন আব্দুল্লাহ নামক একজন বৃদ্ধ লোকের পরামর্শ অনুযায়ী স্থির হয় যে পরদিন প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম কাবা ঘরে প্রবেশ করবে তাকেই সমস্যা সমাধানের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। পরদিন উষালগ্নে দেখা গেল মুহাম্মদ (সঃ) সর্বপ্রথমে কাবা ঘরে প্রবেশ করছেন। সকলেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে সাদরে গ্রহণ করলেন। তাঁর কাছে বিষয়টি ছিল একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহনে সামান্যতম ত্রুটি হলে সমগ্র মক্কা রক্তের বন্যায় প্লাবিত হত। মুহাম্মদ (সঃ) ব্যতীত অন্য কোন কূটনীতিজ্ঞকে এ ধরনের দায়িত্ব দেয়া হলে তিনি হয়তো তা প্রত্যাখান করতেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তীক্ষ্মবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম কূটনীতির মাধ্যমে এক খন্ড কাপড়ের উপরে পাথরখানাকে নিজ হাতে উঠায়ে প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে প্রতিনিধিকে উক্ত কাপড়খানাকে বহন করতে বলে তা যথাস্থানে স্থাপন করতঃ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান দিলেন।

কূটনীতি

এভাবে ক্রমে ক্রমে মহানবী (সঃ) এর সামনে হাজারো কূটনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে তিনি সেগুলোর একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য সমাধান প্রদান করেন। এসব হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে একজন মহান আদর্শ কূটনীতিকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর পূর্বে ও পরে এমন কূটনৈতিকভাবে সফল কোন ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটে নাই। তাঁর ইন্তেকালের পর মুসলিম শাসকদেরকে মহানবী (সঃ) এর অনুসৃত নীতি অনুযায়ী সকল কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চালাতে দেখা যায়। খোলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তী শাসকদের আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে, তখন বিভিন্ন রাষ্ট্র ও গোত্রের সাথে যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা যুগ যুগ ধরে প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু কালের বিবর্তনে পৃথিবী থেকে ইসলামী শাসনের সংকোচনের ফলে কূটনীতির ক্ষেত্রেও তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। ঠিক এ সময় শূন্যস্থান পূরণ করে আধুনিক ইউরোপীয় কূটনীতি। আধুনিক ইউরোপীয় কূটনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে । আবার অন্যদিকে পক্ষপাতমূলক, প্রবঞ্চনাপূর্ণ ও মিথ্যা কলাকৌশলের কূটনীতি বিশ্বে অফুরন্ত সমস্যার সৃষ্টি করেছে যার ফলে বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে চলছে সংঘাত, হানাহানি ও হত্যাযজ্ঞ। বিশ্ব আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। এ ছাড়াও আধুনিক কূটনীতির নীতি ও সুযোগ সুবিধা এবং কূটনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি ও সুযোগ সুবিধার মধ্যে পার্থক্য আছে যা পরে আলোচনা করা হয়েছে।

কূটনীতির সংজ্ঞা:

'কূটনীতি' শব্দটি গ্রীক ভাষার ক্রিয়া Diploun" অর্থাৎ ভাঁজ করা থেকে এসেছে। সভ্যতার বিবর্তনে পর্যায়ক্রমে গ্রীক Diploun বিবর্তিত হয়ে Diploma এবং এর থেকে diplomacy- তে রূপ নিয়েছে যার অর্থ হচ্ছে The management of relations between nations.

এ ব্যাপারে Oxford English Dictionary- তে বলা হয়েছে যে, " The management of international relations by negotiation, the method by which these relstions are adjusted and maneged by ambassadors and envoys.

এ হচ্ছে কূটনীতির শব্দগতদিক। কিন্তু পরিভাষাগত দিক থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও আইনবিদগণ কূটনীতির নির্ধারিত কোন বিশেষ সংজ্ঞা দেননি, যাকে

সর্বকাল উপযোগী হিসেবে ধরে নেয়া যায়। এরপরেও তাঁরা বিভিন্নভা কূটনীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন। স্যার আর্নেষ্ট স্যাটো (Sir Ernest Satow এ মতে 'কূটনীতি হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সরকারের মধ্যে সরকারী পর্যা সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ'।

অধ্যাপক পাডেল ফোর্ড ও লিংকন বলেন, 'শান্তির সময়ে প্রতিনিধিত্ব এ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার পদ্ধতিই রা কূটনীতি'।

J.G. Starke says- " The institute of diplomatic representati has come to be the principal machinary by which the intercour between states is conducted".

অধ্যাপক নিকলসন বলেন, 'কূটনীতি হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পেশাদার ও অভিজ্ঞ কর্মচারী দ্বারা বৈদেশিক নীতির প্রয়োগ'।

এ ছাড়াও কূটনীতির আর একটি Classical সংজ্ঞা রয়েছে, তা হচ্ছে " The application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the governments of independent states.'

উপরের সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কূটনীতি হ আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার এক বিশেষ মাধ্যম। এক রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্পর্ক সমুন্নত রাখা এবং এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দূত প্রেরণ করে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমকে কূটনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক আইনের উপরে মুসলমানদের কিছু অবদান থাকলেও কূটনীতির ক্ষেত্রে যথাযথ নজর দেয়া হয়নি। কূটনীতি (এই পরিভাষাটি) কি এবং ইসলামের কূটনীতি কি এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের বলতে হয় যে, কূটনীতি পরিভাষাটি রাসুলের (সঃ) যুগে ছিল না। এটা একটি আধুনিক পরিভাষা। তখনকার যুগে পরিভাষাটি না থাকলেও নবী (সঃ) নিজে (পরিভাষার আলোকে যে সব কার্যাদি করা হয়) এর বাস্তবায়ন করেছেন। অপরকে (সাহাবাদের) দিয়ে সম্পাদন করিয়েছেন। পরবর্তী যুগের মুসলিম শাসকবর্গ কূটনীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেছেন, তবে তারা এমনকিছু করেন নাই যা

মুসলমান তথা ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী বা শরিয়ত বিবর্জিত ছিল। এসব কারণে কূটনীতির সঠিক কোন সংজ্ঞা মুসলিম মনীষীরা দেননি। এরপরেও আমরা বলতে পারি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে কূটনীতি হচ্ছে ঐ সব নীতি বা কাজ যেখানে ইসলামী নিয়মনীতি মেনে চলা হয়। প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, শঠতা পরিত্যাগ করে ইসলামী রাষ্ট্র ও এর অধিবাসীদের স্বার্থে অন্যান্য রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। অথবা কূটনৈতিক সম্পর্ক যখন ইসলামী মৌলনীতি অনুসরণ করে মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময় করা হয় তখন তাকে ইসলামী কূটনীতি বলা হয়।

কূটনীতির ক্ষেত্রে রাসুল (সঃ) এর অবদান ও কয়েকটি দৃষ্টান্ত

সমগ্র বিশ্ব যখন নৈতিক অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হতিছল তখন মুহাম্মদ (সঃ) নৈতিক উৎকর্ষতার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি কূটনীতির ক্ষেত্রেও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কূটনীতির ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সঃ) ১৪ শত বছর পূর্বে যে ভূমিকা পালন করেন তা তাঁর কথায় ফুটে উঠেছে। যেমন তিনি বলেন, 'আমরা সবাই অন্যায় পরিত্যাগ করি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় করবো না. কারণ দু'টো অন্যায়ের ফল ভালো হতে পারে না"।

বিদেশী রাজ দরবারে সাময়িকভাবে দূত প্রেরণের দৃষ্টান্ত স্মরণাতীতকাল থেকেই মানব ইতিহাসে আছে। সুতরাং রাষ্ট্র নায়ক হিসাবে নবী করিম (সঃ) ও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে দূত বা কুটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। এক্ষেত্রে আমর ইবনে ওমাইয়া আদ-দামরী নামক একজন অমুসলিম খুব সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম রাষ্ট্রদূত ছিলেন। কুরাইশরা আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানদেরকে তাদের হাতে অর্পণ করার জন্য সেখানকার রাজা নাজ্জাশীকে প্ররোচিত করছিল। তাদের এ দূরভিসন্ধি বানচাল করার উদ্দেশ্যে নবী করিম (সঃ) দ্বিতীয় হিজরীতে আমর বিন ওমাইয়া আদ দামরীকে আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) প্রেরণ করেন।

নবী করিম (সঃ) মদিনা থেকে তাঁর আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার এবং বৈচিত্রপূর্ণ পরস্পর বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্বকে সমন্বয় করার কাজ করতে গিয়ে একজন সফল কূটনীতিকের পরিচয় দেন। তাঁর প্রথম কাজ ছিল মদীনাবাসী ও ইহুদীদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করা। এই প্রথমবারের মত তিনি একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এ গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিকে "মদীনা সনদ" বা পৃথিবীর প্রথম

লিখিত সংবিধান বলে আখ্যায়িত করা হয়। মদিনার সনদে স্পষ্টতঃ স্বীকার
হয় যে, সব রকমের বিবাদ-মিমাংসার জন্য নবী (সঃ) এর শরণাপন্ন হতে হ
এ সম্পর্কে মন্টোগোমারী ওয়াট যথার্থই বলেছেন যে, বিবাদ-মীমাংসার জন্য
(সঃ) এর শরণাপন্ন হওয়ার শর্ত থাকার জন্য তার শক্তি বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু
বিবাদের মীমাংসা তিনি এমন নিখুঁত ও কূটনীতিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাধান করেন
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং এ কারণে তাঁর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পা
মদিনার নিরংকুশ ক্ষমতা সম্পন্ন শাসনকর্তা না হয়েও মুহাম্মদ (সঃ) আলী
আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন এক পদ্ধতি চালু করেন যেখানে প্রা
প্রধান বিষয় সম্পর্কেও তাঁর নেতৃস্থানীয় সাথীরাও তাঁর সাথে ঐক্যমত পো
করতেন।

কোরাইশদের সাথে আলোচনায় নবী (সঃ) সবচেয়ে বেশী কূটনৈতিক
সফলতা অর্জন করেন হুদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে। মক্কা থেকে হিজরত
করার ৬ বছর পরে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে নবী করিম (সঃ) প্রা
চৌদ্দশত মদিনাবাসীদের নিয়ে হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কার পথে যাত্রা করেন।
কারণ মক্কার লোকেরা যে অধিকার ভোগ করত মদিনাবাসীও সে অধিকার ভো
করার অধিকারী ছিল। কিন্তু মক্কাবাসীগণ প্রথা লংঘন করে মদিনাবাসীদের মক্কায়
প্রবেশে বাধা দেয়। এমনকি তারা মদিনাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেয়।
মক্কার খিজা গোত্রের নেতা মাদিলের নিকট নবী (সঃ) তাদের অভিসন্ধির কথ
জানতে পেরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। তার মারফতেই নবী
করিম (সঃ) কোরাইশদের নিকট বলে পাঠান যে, তিনি শুধু হজ্জ পালনের জন
এসেছেন, যুদ্ধের জন্য নয়। এ সময় উরওয়া নামক একজন কোরাইশ দূত
আলোচনার জন্য নবী (সঃ) এর নিকট আসে কিন্তু কোন ফল হয়নি। ফলে
মুহাম্মদ (সঃ) একজন দূত প্রেরণ করলে কোরাইশরা নবীর দূতের উঠকে হত্যা
করে এবং কোরাইশরা মুসলমানদের আক্রমন করার জন্য একদল সৈন্য পাঠায়।
মুসলমানরা তাদেরকে বন্দী করে রাখে। কিন্তু তবুও নবী করিম (সঃ) প্রতিশোধ
না নিয়ে কূটনৈতিকভাবে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে
বন্দী কোরাইশদের মুক্তি দেন। পরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পুনরায় ওসমান (রাঃ)
কে দূত হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করেন। কোরাইশরা তাঁকেও আটক করে রাখে।
এবং কয়েকদিন পরে গুজব রটে যে, ওসমান (রাঃ) কে হত্যা করা হয়েছে। তাই

নবী (সঃ) সাহাবীদের নিয়ে দূতের বদলা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক তখনই শান্তি
আলোচনার জন্য কোরাইশদের দূত সোহায়েল এসে উপস্থিত হয়। বহু
আলোচনার পর বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়, যা হুদায়বিয়ার সন্ধি
নামে পরিচিত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ চুক্তির অধিকাংশ শর্ত মুসলমানদের বিপক্ষে
হওয়াতে মুসলমানরা হতাশ হয়ে পড়ে ও দুঃখে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু
আল্লাহ তাদের শান্তনা দিয়ে বলেন।

"আমিই তো আপনাকে (হে মুহাম্মদ) সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি"
(আল-ফাতহ্- ১)।

হুদায়বিয়ায় নবী (সঃ)কে আমরা একজন স্বচ্ছজ্ঞান সম্পন্ন কূটনীতিজ্ঞ
হিসেবে দেখতে পাই। স্বচ্ছজ্ঞান ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয়
বিষয়ের একজন সার্থক আলোচনাকারী হিসেবও তাঁর পরিচয় আমরা পেয়েছি।
নাজুক অবস্থায় স্বীয় মর্যাদা বজায় রাখার এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে শান্ত ও
ভারসাম্য বজায় রাখার ধৈর্য্য আমরা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি। শান্তির আদর্শের
প্রতি অনুগত এবং মানবের মর্যাদা ক্ষুন্ন না করে সেই আদর্শের বাস্তবায়নে
উৎসর্গীকৃত একজন দূত হিসেবে দেখতে পাই। একজন কূটনীতিজ্ঞ হিসেবে তিনি
জানতেন কখন তাঁকে দৃঢ় হতে হবে কখন নম্র হতে হবে, কখন সময়োচিত
ব্যবহার করতে হবে। দার্শনিক ও বাস্তববাদী ব্যক্তির গুনের এক অপূর্ব সমাবেশ
তাঁর মধ্যে রয়েছে। স্বীয় অনুসারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার
বিশ্লেষণ করে দ্রুত অথচ আড়ম্বরহীন পদ্ধতিতে আলোচনা চালিয়ে তিনি এমন
চুক্তি সম্পাদন করেন যা দুরদৃষ্টি, ধৈর্য্য, বিশ্বাস, কৌশল ও ন্যায় বিচারের আদর্শ
হিসেবে বিবেচ্য।

ইসলামের অগ্রযাত্রার শুরুতেই নবী (সঃ) অধিক বন্ধু সংগ্রহের নীতি
অনুসরণ করেন। এই নীতি অনুসরণের উদ্দেশ্য ছিল মদিনার বাইরে কোন
আক্রমন পরিচালনার সময় বা মদিনাতেই তাঁর অনুসারীরা যেন স্বাধীনভাবে
চলাফেরা করতে সমর্থ হয় এবং জীবন নিশ্চিন্তও শংকামুক্ত হয়। আলোচনার
মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করা বা কোন গোত্রকে স্বীয় মতে আনয়ন করা ইত্যাদি
ব্যাপারে নবী (সঃ) এর যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল
স্বীয় শক্তিকে সংঘবদ্ধ করা এবং বিভিন্ন গোত্র ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ
সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে তিনি শুধু আরবের বিভিন্ন গোত্র ও প্রতিবেশী

দেশের শাসকদের প্রতিনিধি গ্রহণ করেননি, বরং একই সাথে তিনি বহু অনারব শাসক বর্গের নিকট স্বীয় প্রতিনিধি বা দূত প্রেরণ করেন। তিনি প্রতিনিধি দল/দূতদের অভ্যর্থনা জানান-এর মধ্যে নিম্নোক্তগুলো উল্লেখযোগ্য।

১. তায়েফের প্রতিনিধিদল: নবী (সঃ) কে উৎপীড়নের তায়েফবাসীদের স্থান মক্কাবাসীদের পরেই। তায়েফের রাস্তায় তাঁর প্রতি অমা- ষিক অত্যাচার করা হয়। প্রথমদিকে নবী (সঃ) এর নেতৃত্বকে স্বীকার করে কিন্তু পরে অর্থাৎ নবী (সঃ) মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে তারা আত্মসমর্পণ করে একদল প্রতিনিধি মদিনায় আসে। প্রতিনিধি দলের নেতা অমুসলিম হওয়ার নবী (সঃ) স্বয়ং তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং মসজিদের পাশেই তাঁদের তা- ফেলার অনুমতি দেন। এরপরে তায়েফের প্রতিনিধিদল অদ্ভূত ধরনের (ব্যভিচার সুদ প্রথা, মদ পান করা, তাদের বড় খোদা আল'লাতের মূর্তি ভেংগে না ফেলা নামাজ, যাকাৎ ও জিহাদ থেকে অব্যাহতি) শর্ত নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেয় কোন অবস্থায় মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না কিন্তু এরপরেও নবী (সঃ) ধৈর্য্য আলোচনা চালিয়ে যান এবং শেষে উভয় পক্ষের মধ্যে গ্রহণযোগ্য নীতি উদ্ভাবনে সমর্থ হন।

২. নযরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদল: তিনজন শীর্ষস্থানীয় নেতাসহ এ প্রতিনিধিদলের সংখ্যা ছিল ষাটজন। একজন নীতি নির্ধারক, একজন সাধারণ ব্যবস্থাপনার প্রশাসক ও তৃতীয়জন ছিলেন-ধর্মীয় নেতা। ধর্মীয় নেতা আবু হারিস অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। নবী (সঃ) যখন মদিনার মসজিদে বিকালের নামাজে রত ছিলেন, তখন এই প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটে। উপাসনার সময় তারা পূর্ব দিক ফিরে উপাসনা করে। নবী (সঃ) তাদের বলেন- "এখানেই আপনারা উপাসনা করতে পারেন। এ স্থানটি আল্লাহর প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রতিনিধিদলের সকলেই বাইজেন্টাইনের খৃষ্টান ছিলেন। খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কে নবীর (সঃ) কি ধারণা তা নিয়ে আলোচনা হয়। নবী (সঃ) সূরা আল-ইমরানের ৮০ টির বেশী আয়াত পাঠ করে তাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন যে খোদার কর্তৃত্বে কোন সহযোগী নেই। যীশু আদমের (আঃ) মতই আল্লাহর বান্দা।"

৩. বানু সা'দ গোত্রের প্রতিনিধিদল: বানু সা'দ গোত্রের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দিমাম বিন তা'লাবা। মসজিদের গেটের নিকট উট বেঁধে তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন। নবী (সঃ) ও তাঁর সংগীরা তথায় অবস্থান করছিলেন।

...সাথে রাসুলুল্লাহর সৌহার্দপূর্ণ আলোচনার পর দিমাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ...এবং নিজ গোত্রের কাছে এ সত্য বহন করে নিয়ে গিয়ে বলেন যে, আল্লাহ ...নবী প্রেরণ করেছেন এবং একখানা গ্রন্থ নাজিল করেছেন। তোমাদের এই ...সেই গ্রন্থ থেকে উপদেশ নেয়া উচিত।

৪. বানু তা'য়ী গোত্রের প্রতিনিধিদল: বানু তায়ী গোত্র ছিল দানশীলতার ...সুবিদিত। এই গোত্রের নেতা আদিয়া বিন হাতিম ছিলেন নবীর শত্রু। তার প্রতিনিধিদল যখন নবী (সঃ) এর নিকট আসে তখন নবী (সঃ) তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন। পরে আদিয়া মুসলমান হন।

৫. বানু তামীম গোত্রের প্রতিনিধিদল : বানু তামীম গোত্রের প্রতিনিধিদল ...মসজিদে প্রবেশ করে তখন নবী (সঃ) বাড়ীতে ছিলেন। প্রতিনিধিদল ...মসজিদে প্রবেশ করেই চিৎকার করতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরণের অশোভন ও ...বিকৃত শব্দ উচ্চারণ করে। কিন্তু নবী (সঃ) এতে বিরক্তিভাব প্রকাশ না করে ...তাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেন এবং নিজে আপ্যায়ন করতে এগিয়ে আসেন। ...তাদের পছন্দমত পদ্ধতিতে আলোচনা করতে সম্মত হন। তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়ার জন্য তিনি সহজ পদ্ধতির প্রশ্রয় নেন।

৬. বানু হানিফা গোত্রের প্রতিনিধিদল: বানু হানিফা গোত্রের প্রতিনিধিদলের ...মধ্যে ছিল মুসাইলাম বিন হাবিব। মিথ্যা নবীর দাবীদার। মুসাইলামাকে পিছনে ...রেখে প্রতিনিধিদলটি নবীর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

৭. হিমাইয়াহ ও কিনদার প্রতিনিধিদল : নবী (সঃ) হিমাইয়া রাজা কর্তৃক ...ও কিনদার প্রতিনিধিদলকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাদের কাছে তিনি এক ...ইসলামের সুমহান বাণী গ্রহণ করার আহবান জানান।

এ ছাড়াও তিনি যে সব প্রতিনিধিদল বা দূত প্রেরণ করেন তা নিম্নরূপ:

১. নাজ্জাসীর নিকট প্রেরিত প্রতিনিধিদল: হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বপ্রথম ...মান প্রতিনিধি প্রেরণ করেন আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর নিকট। তারা নাজ্জাসীকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন জাফর বিন আবু তালিব। তারা নাজ্জাসীর কাছে রাসূল (সঃ) এর একটি বার্তাও নিয়ে যায়। বার্তায় রাসুল (সঃ) আল্লাহর পবিত্রতা ...প্রশংসা করার পর মরিয়মের পুত্র যীশুর গুণগান করেন আল্লাহর বান্দা হিসেবে। সর্বশেষে তিনি ইসলামের [illegible] বাণীর আহবান জানান।

এ ছাড়াও নবী (সঃ) আল-ইয়ামান, বাহরায়েন, ওমান, দামেস্ক। আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তাদের নিকট দূত পাঠান। রোম সম্রাট সিজা হেরাকিউলাসের নিকট বার্তাসহ একজন দূত পাঠান। বার্তায় নবী (সঃ) বলে আল্লাহ আমাকে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছেন। আমার গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করবেন। আমার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেন না, যেমনভাবে জনগণ মেরীর পুত্র যীশুর প্রতি করেছিল। সিজার বার্তা পে কিছুক্ষণ বার্তার দিকে চেয়ে থাকেন এবং তাঁকে রাসুলের নিকটবর্তী করার জন পুলিশ প্রধানকে আদেশ দেন। (বিস্তারিত জানার জন্য সিরাত ইবনে হিশা দ্রষ্টব্য)।

পারস্যের রাজা খসরুর কাছেও নবী (সঃ) বার্তাসহ দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু খসরু তাঁর বার্তা ছিড়ে ফেলেন। এ সম্পর্কে নবী (সঃ) কে অবহিত করা হলে তিনি মন্তব্য করেন, "তার সাম্রাজ্য ভেংগে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। যা হো কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ ও গ্রহণের ব্যাপারে রসুল (সঃ) যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

নৈতিক কূটনীতি:

নৈতিকতা বা নৈতিকতার বিকাশ ছাড়া যেমন কোন আদর্শ স্থায়ী হতে পারে না তেমনিভাবে কূটনীতিও তার উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হতে পারে না অর্থা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়নে সফল হয়না। এর প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলাম প্রদর্শিত কূটনীতি নৈতিকতার একটি আবেদন রাখে। ইসলাম প্রদর্শিত কূটনীতি এসেছে রাসুল (সঃ) থেকে আর রাসুলের (সঃ) নৈতিক সম্পর্কে সার্বজনীন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর জীবন কথা ও কাজ এক অপূর্ব সমন্বয়ের সমাহার। নবী (সঃ) কাছে কূটনীতি ছিল তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপায় মাত্র। তিনি উপায় ও উদ্দেশ্যকে সমানভাবে গুরুত্ব দিতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ এবং আত্মোৎসর্গের গুনে গুনান্বিত। সুতরাং তা অপবিত্র উপায়ে অর্জন করা সম্ভব ছিলনা। এজন্যই তিনি কূটনীতিতে নৈতিকগুন প্রয়োগ করেন। এ কারণে ইসলামের কূটনীতিতে শঠতা, চালাকী বা প্রতারণার স্থান নেই। ইসলামের কূটনীতি হলো স্বচ্ছ এবং বৃহত্তর জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ইসলাম প্রদর্শিত কূটনীতিতে বা কূটনীতিবিদদের কিছু গুনাবলী থাকা আবশ্যক। অন্যথায় কূটনীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গুণাবলীগুলো নিম্নরূপ:

১. মানবীয় আচরণে ভদ্রতা ও নম্রতা: ভদ্রতা, নম্রতা ও বিনয়ের সাথে কথা বলা ও আচরণ করা সভ্য সমাজে প্রশংশনীয়। এসব গুণের কারণে মানুষ অনেক উর্দ্ধে উঠতে পারে। আর এ গুণটি কূটনীতিকদের থাকলে তার মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে গতিসঞ্চার হয়। সবার সাথে হাসি ও শান্তি সূচক কথা বলা একজন কূটনীতিকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সহসা রাগ করা, ছোট খাট ত্রুটি বিচ্যুতিকে ক্ষমা না করা এবং কারও উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেয়া আদর্শবান কূটনীতিকের বৈশিষ্ট্য নয়। একজন মুসলমান আদর্শের নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। কিন্তু আদর্শ বাস্তবায়নে আপোষহীন হওয়ার সাথে সাথে তাকে অবশ্যই ভদ্র, নম্র, হতে হবে এবং বন্ধু বা শত্রুর সাথে কাজ করার সময় ক্ষমাশীল হতে হবে। পবিত্র কোরআনে বহু জায়গায় এ ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেন, "মানুষের সাথে উত্তম কথা বল" (বাকারাহ্-৮৩)।

আল্লাহ্ আরো বলেন, "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়"(আন-নাহল-২৫)।

আল্লাহপাক আরো বলেন-," আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম সে কথাই বলে"(আল-ইসরা-৫৩)।

আল্লাহ পাক আরো বলেন, "পদচারনায় মধ্যবর্তীতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর"(লোকমান-১৯)।

আলোচ্য আয়াতগুলিতে-আদর্শ কূটনীতিজ্ঞ হিসেবে রাসুল (সঃ) এর মধ্যে প্রতিটি গুনের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি সর্বস্তরের লোকের সাথে মৃদু হাসি ও শান্তি সূচক কথা বলে আপ্যায়ন করতেন। ভদ্র ও নম্রতার সাথে তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন কোন রকম নিন্দা বা অপবাদ প্রকাশ না পায়। প্রতিটি কথা তিনি ধীরে বিশেষভাবে বিবেচনা করে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতেন। যা সত্য ও সঠিক তা তিনি ব্যক্ত করতেন। নিরর্থক আলোচনা তিনি করতেন না। তিনি যা চাইতেন, সুন্দর বাক্য দিয়ে প্রকাশ করতেন।

পবিত্র কোরআনের বর্ণিত ও নবীর আদর্শকে সামনে রেখে কূটনীতিককে চলতে হবে তবেই না কূটনীতি সফল হবে। নবীর আদর্শকে অনুসরণ করার ব্যাপারেও পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসুল (সঃ)

এর মধ্যে উত্তম অনুপম আদর্শ রয়েছে। যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে"(আহ্‌যাব-২১)।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, বিপক্ষের সাথে বিতর্কে, বন্ধুর সাথে আলোচনার সময় বা বিপক্ষের সাথে কোন সম্মেলনে একজন মুসলমানকে সকল অবস্থায় নম্র ভাষায় কথা বলতে হবে, অধৈর্য্য হওয়া যাবে না, অহেতুক কথা বলা যাবে না, সঠিক কথা বলতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেন-, "সঠিক কথা বল"(আহ্‌যাব- ৭০)।

২. সত্য বিশ্বাসীঃ পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসীদের যে সব গুনাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে সত্যবাদিতা তথা কথা ও কাজে সত্যের অনুশীলন করা সর্বোত্তম। সত্যের প্রতি উৎসর্গীকৃত মানুষ সৎ, স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ় এবং বিশ্বাসে অটল। এ ধরনের মানুষ প্রতারনা, চালাকী বা শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। তাঁরা অপরকেও সত্যের পথে অনুপ্রাণিত করেন। ইসলামের কূটনীতিতে শঠতা, চালাকী বা প্রতারণার স্থান নেই। রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত জীবনে প্রতারনাকে পবিত্র কোরআনে ঘৃণা করা হয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যাপারে সত্য এবং আনুগত্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- অংগীকার রক্ষা করা। কারণ অংগীকার ভংগ করা অবিশ্বাসের শামিল। তাই কোন মুসলমান যদি কোন ব্যক্তি বা জাতির কাছে কোন ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তবে তার এই প্রতিশ্রুতি আল্লাহর সাথে চুক্তি করার মতই বিবেচিত হবে। ইসলামে কোন ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকদের উপর বাধ্যতামূলক। উহা যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হলে বিশ্বাস ভংগের অপরাধে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। এ প্রসংগে আল্লাহ পাক বলেন-, "তোমরা নিজেদের ওয়াদা পূরণ কর। নিশ্চয়ই ওয়াদার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে" (আল ইসরা-৩৪)।

আল্লাহ আরো বলেন, " আর যখন তোমরা আল্লাহর সাথে অংগীকার কর, তা পূর্ণ কর এবং চুক্তিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর কখনও ভংগ করো না" (আন-নাহল -৯১)।

পবিত্র কুরআনে তাদেরকেই বিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যারা- "আল্লাহর ওয়াদা সঠিকভাবে পালন করে। আর ওয়াদা মোটেই ভংগ করে না" (আর র'দ- ২০)।

সততা ও সৎ বিশ্বাসের উপর এমনই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে এসব গুন ছাড়া কারো পক্ষে ভালো মানুষ হওয়া অসম্ভব। কূটনীতির ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আরো বেশী। ওয়াদা পালন সম্পর্কীয় পবিত্র কুরআনের নির্দেশ ও অত্যন্ত ব্যাপক। সত্য নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম। এটা একটা শক্তিশালী অস্ত্র। সত্য ও মিথ্যার অভ্যন্তরীন যুদ্ধে নবী (সঃ) সর্বদা সত্যের আশ্রয় নিয়ে জয়ী হয়েছেন।

৩. ধৈর্য্যধারণ: ধৈর্য্যধারণ করা কূটনীতিকের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেক বাধা বিপত্তি আসতে পারে, অনেক কষ্ট সহ্য করতে হতে পারে। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে যে অবিচল থাকে সেই প্রকৃত পক্ষে ধৈর্য ধারণ করেছে বলে মনে করা হয়। আলোচনার মাঝে ধৈর্য হারা হওয়ার অর্থই হল আলোচনার যবনিকা পতন। কূটনীতিতে ক্রোধ বা উত্তেজনার কোন স্থান নেই। যে সব ক্ষেত্রে কূটনীতিবিদরা ক্রোধে ফেটে পড়েছেন সে সব ক্ষেত্রে চরম পরিণতি হয়েছে। কোন মত বা আদর্শ প্রচারে নবী করিম (সঃ) কে যেমন নিগৃহীত ও কঠোর অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখিন হতে হয়েছে তেমন আর কাউকে হতে হয়নি। দেশের সবাই তার প্রতি শত্রুতা করেছে। চতুর্দিকে ছিল শুধু হতাশা। এরপরও আল্লাহ নবী (সঃ) কে সব কিছু ধৈর্য্যের সাথে মোকাবেলা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "তুমি (মুহাম্মদ) ধৈর্য্যের সাথে প্রভূর হুকুমের জন্য অপেক্ষা কর, কারণ তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ"(আত-তূর -৪৮)।

আল্লাহ আরো বলেন,"তুমি (মুহাম্মদ) ধৈর্য ধারন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য"(আর-রূম-৬০)। এ আয়াত দু'টি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুসলমানদের প্রতিটি কাজে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। কেননা চূড়ান্ত ফয়সালা দেয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। সব শক্তি দিয়ে চেষ্টা করাই মুসলমানের জন্য শোভন।

৪. আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হওয়া: যদি কোন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, অনিশ্চয়তা কূটনীতিকের মনের একাগ্রতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, তখন তাকে আল্লাহ ও রাসূলের আশ্রয় নিতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক তাঁর বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বলেন-, "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন"।

এছাড়াও আল্লাহ যাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চান এবং যাদের মাধ্যমে উত্তম ফয়সালা বের করে আনতে চান, তাদেরকে এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল (সঃ) এবং যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বশীল তাদের আনুগত্য কর, আর তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ছেড়ে দাও" (আন্-নিসা-৫৯)।

এ আয়াত দু'টি দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, যখন তাঁর ঈমানদার বান্দা কোন পরিস্থিতিতে শিকার হন তখন আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন। আল্লাহ্ অসীম ক্ষমতা বলে সে সব সমস্যার সহজ সমাধান করে দেন।

কূটনীতিবিদদের অভ্যর্থনা:

নবী (সঃ) এর আমলে যখনই কোন বিদেশী দূত বা প্রতিনিধি দল আসত তিনি তাদেরকে স্থানীয় শিষ্টাচার অনুযায়ী অভ্যর্থনা করার পূর্বে একজন কর্মচারী অতিথিদেরকে অনুষ্ঠান প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞাত করতেন। অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই কূটনীতিকদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে নবী (সঃ) নিজে মসজিদে নববীতে রাষ্ট্রদূতগণকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করতেন। দূতাবাসের স্তম্ভগুলি আজও স্থানটির স্মৃতিবহন করছে। বিদেশী দূতগণকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনার সময় নবী (সঃ) ও তাঁর সংগীগণ সুন্দর পোষাক পরিধান করতেন।

হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট প্রেরিত বাইজেন্টাইন রাষ্ট্রদূত তিনি খলিফাকে পরিষদ বিহীন একাকী মাটিতে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পান এবং বাগদাদে আল-মুনতাসিরের রাজদরবারে একই সাম্রাজ্য কর্তৃক প্রেরিত রাষ্ট্রদূতের মধ্যে প্রাথমিক যুগের সরলতা ও পরবর্তী যুগের আড়ম্বরের তুলনামূলক পার্থক্যের একটি ভাল দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়।

ওমর (রাঃ) এর আমলে বাইজান্টাইনের একজন রাষ্ট্রদূত তার সাথে দেখা করতে আসেন। তখন (রাঃ) সুন্দর পোষাক ব্যতীত তাকে গ্রহণ করেন। তখন ঐ দূত ওমরের (রাঃ) ঐ অবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন যে, ইসলাম অত্যন্ত সহজ সরল অবস্থাকে সমর্থন করে।

অনুরূপভাবে আব্বাসীয় যুগে ঐ বাইজেন্টাইনের অপর একজন দূত খলীফা আল-মুনতাসিরের নিকট আসলে তিনি জাকজমকপূর্ণ পোষাকে তাকে অভ্যর্থনা জানান। যা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন যে, ইসলাম জাঁকজমককেও সমর্থন করে।

এ ছাড়াও হযরত ওমরের (রাঃ) আমলে সিরিয়ার গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) জাঁকজমক পোষাকে মদিনায় আসলে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "হে মুয়াবিয়া তুমি এ কি করেছ ? উত্তরে মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেন ইসলাম তো গরীব অবস্থার জন্য আসেনি। বিধর্মীরা যদি জাঁকজমক করতে পারে তবে মুসলমানরা কেন করতে পারবে না ? হযরত ওমর (রাঃ) তখন চুপ থাকেন। এ ঘটনা প্রমান করে যে, ইসলাম সীমিত জাঁকজমক সমর্থন করে এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের একটু জাঁকজমকের সাথে অভ্যর্থনা করা জায়েজ যেমনটি বর্তমান যুগে হয়ে থাকে।

দূতগণ সাধারণত: তাদেরকে যে রাজদরবারে পাঠান হত সে দেশের শাসকের জন্য তাদের নিজেদের রাজাদের তরফ থেকে উপঢৌকন নিয়ে আসত। এ ধরনের জিনিস সরকারী তহবিলে প্রেরিত হত। দূতগণকে যে রাজাদের কাছে পাঠানো হত সে রাজাদের নিকট থেকেও তারা উপঢৌকন পেত। নবী করিম (সঃ) বিদেশী কূটনীতিকদের মাধ্যমে তাদের রাষ্ট্র প্রধানের নিকট উপঢৌকন পাঠাতেন এবং তারাও তাঁর উপহার সামগ্রী নিয়ে আসতেন। নবী (সঃ) এর জন্য নিয়ে আসা উপহার সামগ্রী রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রাখা হত। মৃত্যু শয্যায় থাকাকালে নবী (সঃ) অসিয়ত করেন যে, তাঁর উত্তরাধিকারীগণ (শাসকগণ) যেন বিদেশী প্রতিনিধিদেরকে উপঢৌকন প্রদান করেন।

ওমান থেকে আগত এক দূতকে নবী (সঃ) পাঁচশত দেরহাম ও অন্য একজন দূতকে সোনা ও রূপার কটিবন্ধ দিয়েছিলেন। এছাড়াও ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী কমবেশী সকল দূতকে উপহার দিতেন।

কূটনীতিবিদদের আপ্যায়ন:

দূতদিগকে সরকারী খরচে আপ্যায়িত করা হয়। নবী (সঃ) এর আমলে বিশেষ করে বিদেশী অতিথিদের জন্য মদিনায় অনেকগুলো বিশাল আকৃতির অতিথিভবন নির্মাণ করা হয়েছিল। আবিসিনিয়ার দূতদেরকে আপ্যায়নের জন্য নবী (সঃ) নিজে বিশেষভাবে যত্ন নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে নবী করিম (সঃ) বলেন যে, আবিসিনিয়ানরা আমাকে যেভাবে অভ্যর্থনা বা আপ্যায়ন করেছে আর কেউ তা করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, আবিসিনিয়ার রাজা সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে মক্কায় চরম বিপদের দিনে প্রকৃত বন্ধুরূপে সাহায্য করেছিলেন এটা সর্বজনবিদিত।

বর্তমানকালে দূতদের বা বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য
অত্যাধুনিক হোটেল বা অতিথিভবন নির্মাণ করে বাছ-বিচার ছাড়াই জাঁকজমকপূর্ণ
আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। তবে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে বাছ-বিচার
সহকারে অর্থাৎ হালাল পদ্ধতিতে এবং মিতব্যয়িতার সাথে মোটামুটি উন্নত ও
রুচিকর আপ্যায়নের অনুমতি রয়েছে।

কূটনীতিবিদদের কার্যাবলী:

কূটনৈতিকদেরকে রাষ্ট্রের বাইরে চক্ষু ও কর্ণ বলে অভিহিত করা হয়।
কূটনীতিবিদদের প্রধান কাজ হল নিজ দেশের বৈদেশিক নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ,
নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে নিজ নিজ রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ এবং অন্যান্য
রাষ্ট্রের খবরাদি জ্ঞাত করান। এ সবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কূটনীতিবিদ বা
কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ সাধারণত: নিম্নরূপ কাজ করে থাকেন:

ক. স্বার্থ সংরক্ষণ: কূটনীতিবিদদের প্রধান কাজ ও দায়িত্ব হচ্ছে তার নিজ
দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। একজন কূটনীতিজ্ঞ তার নিজ দেশের সাথে প্রেরিত
দেশের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন। প্রেরিত দেশে তার দেশের যেসব নাগরিক
বাস করে অথবা ব্যবসা করে, অথবা অধ্যায়ন করে অথবা ভ্রমণের জন্য এসেছে
তাদের প্রতি নজর রাখা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া কূটনীতিবিদদের
দায়িত্ব। বিদেশে নিজ দেশের স্বার্থ বিরোধী তৎপরতাকে প্রতিহত করাও একজন
দায়িত্বশীল কূটনীতিকের গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ।

খ. প্রেরণকারী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব : যখন কোন কূটনীতিক অন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত
হিসেবে যান তখন তিনি প্রেরণকারী রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। তিনি
সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে যাবতীয় কার্যাবলী সমাধা
করেন। তাছাড়া পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উক্ত দেশের সাথে আলোচনা
করে প্রয়োজনীয় বিষয় তার সরকারকে অবহিত করেন। আবার তিনি নিজেও তার
দেশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রেরিত রাষ্ট্রের মন্ত্রী,
সরকারী আমলা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ও প্রেরিত রাষ্ট্রে অন্যান্য দেশের
প্রতিনিধিদেরকে আমন্ত্রণ করে নিজ দেশ সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। কোন
বিশেষ কারণে কোন বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানকে অভিনন্দন জানানো হয় বা শোকবার্তা
প্রেরণ করা হয় তখন সে দেশে নিযুক্ত (যদি থাকে) প্রতিনিধির মাধ্যমে করা হয়।

গ. ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত: রাষ্ট্রদূতগণ বা প্রতিনিধিবর্গ অন্যান্য দেশের সাথে

কূটনীতি
বিভিন্ন বিষয় আদান-প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়েও কাজ করেন। তাই
কূটনীতিকরা তার নিজ দেশের সাথে অন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে বিশেষ
ভূমিকা পালন করেন। যদিও বর্তমানে এ ব্যাপারে আলাদা প্রতিনিধি বাণিজ্যদূত
(Consul) দায়িত্বপালন করে থাকেন।

ঘ. মধ্যস্থতাকারী: কূটনীতিক উভয় দেশের বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মধ্যস্থতাকারী
হিসেবে গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। কূটনৈতিকতার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করা
একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে তাদের সুক্ষ্ম জ্ঞান দ্বারা
মধ্যস্থতা করে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘর্ষ রোধ বা ক্ষতি হওয়া
থেকে বাঁচাতে পারেন। বিরোধীয় বিষয় তৃতীয় কোন দেশের কূটনীতিক
মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং বর্তমানে এ বিষয়টি অহরহ ঘটছে।
যেমন, ফিলিস্থিন-ইসরাইলের মধ্যে শান্তি চুক্তি, বসনিয়া শান্তি চুক্তি ইত্যাদি-
আমেরিকার মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে মধ্যস্থতা
এবং মীমাংসা করণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে আসছে। বর্তমানে একে
(Good Offiec) বা প্রভাব বিস্তার নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ঙ. তথ্য প্রেরণ: কূটনৈতিক প্রতিনিধি অবস্থানকারী রাষ্ট্রের বৈধ তথ্য সংগ্রহ
করবেন এবং প্রেরণকারী রাষ্ট্রকে তা জানাবেন। তিনি ঐ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও
অর্থনৈতিক অবস্থাও প্রেরণকারী রাষ্ট্রকে জানাবেন। কারণ এর উপর ভিত্তি করে
প্রেরণকারী রাষ্ট্র প্রেরিত রাষ্ট্র সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করতে সহজতর পন্থা
অবলম্বন করে থাকে।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক পামার ও পারকিনস বলেন, "কার্যক্ষেত্র থেকে
কূটনীতিবিদদের প্রেরিত তথ্য হচ্ছে বৈদেশিক নীতির মূল উপকরণ"। অধ্যাপক
প্যাডেল ফোর্ড ও লিংকন বলেন বৈদেশিক বিষয়াদিতে যাতে স্বদেশী সরকার বুদ্ধি
মত্তার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং চলতি ঘটনাবলীর মধ্যে এর বন্ধুদের
অবস্থান জানতে পারে এবং কোথায় অসুবিধা নিহিত তা বুঝতে পারে সেই
উদ্দেশ্যে স্বদেশে অনবরত প্রতিবেদন প্রেরণ করা প্রত্যেক বিদেশী মিশনের
অন্যতম কাজ"।

চ. আলাপ-আলোচনা: কূটনীতিবিদগণকে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর সেতুবন্ধ
হিসেবে কাজ করতে হবে। জে.আর চিল্ডস এ সম্পর্কে বলেন যে,
কূটনীতিবিদদের চুক্তি, সম্মেলন প্রভৃতিতে অর্ন্তভুক্ত দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় খসড়া

তৈরী করতে হয়। স্থায়ী অথবা বিশেষ এবং অসাধারণ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে এরূপ কাজ সম্পন্ন হয়। এর মাধ্যমে অসংখ্য আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এভাবে বহু সমস্যার সমাধান হয়।

কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা:

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রদূতদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার নীতি বিশেষভাবে স্বীকৃত। এমনকি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের অস্তিত্ব যখন ছিল না তখনও রাষ্ট্রদূত সর্বত্রই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। তাঁরা সাধারণতঃ যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক. ব্যক্তিগত নিরাপত্তা : রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা দূতগণ তার সহচরবৃন্দসহ ব্যক্তিগত নিরাপত্তার পূর্ণ সুযোগ ভোগ করবেন। তাদের জান মালের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রেরিত রাষ্ট্র বহন করবে। রাষ্ট্রদূত কোন অন্যায় করলে বা প্রেরিত রাষ্ট্রের আইন ভংগ করলে তাকে বিচার না করে স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়ার নিয়ম রয়েছে। রাষ্ট্রদূতদের বিচারের মাধ্যমে বা অন্য উপায়ে হত্যা করা নিষেধ। মুসাইলামার প্রতিনিধি নবী করিম (সঃ) এর সাথে কূটনৈতিক মর্যাদা দিয়ে ব্যবহার করেছেন। নবী করিম (সঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন- তুমি যদি দূত না হতে তাহলে আমি শিরচ্ছেদের আদেশ দিতাম। ওয়াহ্শী নবী (সঃ) এর চাচাকে নির্মমভাবে হত্যা করার পরও তিনি যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে নবী (সঃ) এর নিকট তার পরিচয়পত্র পেশ করেন তখন তার প্রতি কোনরূপ প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা হয়নি বরং তাকে পূর্ণ কূটনৈতিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

খ. ধর্মীয় স্বাধীনতা : বিদেশী রাষ্ট্রের দূতদের বা প্রতিনিধিবর্গের উপাসনা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেন, "ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই"(বাকারাহ্-২৫৬)।

এছাড়াও নবী করিম (সঃ) মসজিদ নববীতে নাজ্জাশীর দূতদের উপাসনা করার অনুমতি দেন।

গ. আটকাদেশ থেকে অব্যাহতি : রাষ্ট্রদূতরা কোন অপরাধ করলে তাদের উপর ইসলামী রাষ্ট্রের আইন প্রয়োজ্য হবে না। তাদেরকে আটক করা যাবে না। তবে তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের আটক রাখে সেক্ষেত্রে ইসলামী

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তাদের দূতকেও আটক রাখা যাবে। যেমন মক্কায় কোরাইশরা নবী (সঃ) এর দূত ওসমান (রাঃ) কে আটক করে রেখেছিল যার ফলে মক্কাবাসীদের প্রেরিত দূত সোহাইলকে নবী (সঃ) এক শর্তে আটক রাখেন যে, যতক্ষণ না মক্কায় আটককৃত মুসলিম রাষ্ট্রদূতকে নিরাপদে ফিরিয়ে দেয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মক্কার প্রতিনিধিকেও মুক্তি দেয়া হবে না। দ্বিতীয় হিজরীতে কোরাইশরা আবু রাফিকে শান্তি স্থাপনের জন্য দূত হিসেবে নবী (সঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন তখন তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কায় ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তখন নবী করিম (সঃ) বলেন-"আমি চুক্তি ভংগ করি না এবং দূতদেরকেও আটকিয়ে রাখি না"। সুতরাং তুমি মক্কায় ফিরে যাও। যদি তোমার মনের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তবে তুমি সাধারণ মুসলমান হিসেবে ফিরে আসতে পার।

ঘ. শুল্ক বা কর প্রদান না করা: কূটনীতিকদের থেকে কোন প্রকার শুল্ক বা ওশর নেয়া যাবে না। অর্থাৎ তারা শুল্ক প্রদান থেকে অব্যাহতি পাবেন। বিদেশী রাষ্ট্রের দূতদের সম্পত্তির উপর আমদানী শুল্ক মুসলিম রাষ্ট্রে আরোপ করা হয়না। তবে শায়বানী বলেন," অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম দূতদের যদি আমদানী শুল্ক হতে অব্যাহতি দেয় তবে মুসলিম রাষ্ট্রও অমুসলিম দূতদের আমদানী শুল্ক হতে অব্যাহতি দিবে"। অন্যথায় মুসলিম রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে তাদের নিকট থেকে বিদেশী আগন্তকদের ন্যায় সাধারণ শুল্ক আদায় করতে পারে। এ ছাড়াও অমুসলিম দূতগণ তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য শুকর, শুকরের মাংশ, মদ ইত্যাদি শালীনভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। তবে তাদেরকে এ গুলো সরবরাহ করা শরীয়তে নিষেধ। কিন্তু আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মুসলিম, অমুসলিম সকলের জন্য বিনা শুল্কে মদসহ অন্যান্য হারাম বস্তু সরবরাহ করার ঘোষণা রয়েছে যা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

ঙ. সাক্ষ্য দেয়া থেকে অব্যাহতি: কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ সকল প্রকার দেওয়ানী, ফৌজদারী, প্রশাসনিক এবং যে কোন আঞ্চলিক বা বিশেষ আদালত সমূহে সাক্ষী হিসেবে হাজির হওয়া থেকে অব্যাহতি পাবেন।

চ. কূটনৈতিক প্রতিনিধি বা তার ভৃত্যগণ বা মিশনের কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রেরিত রাষ্ট্রে কোন মামলা দায়ের করা যাবে না। তবে প্রেরিত রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তির সাথে যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং পরবর্তীতে চুক্তি ভংগ করে

সেক্ষেত্রে অব্যাহতি পাবে না। এছাড়াও কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের তল্লিতল্পা অন্যা
করা আন্তর্জাতিক আইন (ইসলামী ও প্রচলিত) সমর্থন করেনা।

- আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বা প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে
কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন প্রদত্ত অনুরূপ কিছু বি
সুযোগ-সুবিধা. কোন কোন ক্ষেত্রে দায় থেকে অব্যাহতি ও কার্যাবলী করে থাকেন
এবং এগুলো Viena convention-1961 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে একটি বিষয়
লক্ষানীয় যে. ইসলাম সেই দেড় হাজার বছর পূর্বে কূটনীতিকদের আচার
আচরণের নীতিমালা. কার্যপ্রণালী. সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি যা কিছু দিয়েছে তার
থেকে অবশ্য বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন বেশী কিছু দিতে পারে নাই.। যা দিয়েছে
তার সাথে রয়েছে ইসলামের সংঘর্ষ. যেমন এখন প্রতিটি দেশ কূটনীতিকদের
মদসহ অনেক কিছু সরবরাহ করছে-মুসলিম অমুসলিম কোন পার্থকা করছেনা।

কূটনীতির গুরুত্ব:

সমস্যা সংকুল এ পৃথিবীতে কূটনীতির গুরুত্ব অনেক। কূটনীতি শান্তি
রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। দু'টি দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে
যে ভূমিকা রাখে তার চেয়ে কয়েকগুন বেশী ভূমিকা রাখে বিরোধ নিষ্পত্তির
ক্ষেত্রে। অর্থাৎ দু'টি দেশের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে যুদ্ধ অনিবার্য
হয়ে পড়লে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে তা এড়ানো হয়। কারণ শান্তিপূর্ণভাবে
কূটনীতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হলে বিবাদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক
ভালো থাকে। আরো সুদৃঢ় হয় এবং সহযোগিতার পথ সম্প্রসারিত হয়। এ
প্রসংগে একজন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Hans J. Morgenthau বলেন, Diplo-
macy can make peace more secure than it is today and the world
state can make peace more than it would be if nations were to abide
by the rules of diplomacy.

রাজনীতিবিদদের জন্যও কূটনীতির প্রয়োজন রয়েছে। সুক্ষ্ম কূটনীতির
কারণে একজন লোক দক্ষ রাজনীতিবিদ হতে পারে এবং রাজনীতিতে সাফল্য
অর্জন করতে পারে। বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বন্ধুত্ব গড়তে
পারেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে
কূটনীতি প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির উৎস হচ্ছে
কূটনৈতিক দলিল অর্থাৎ অতীতের কূটনৈতিক আদান-প্রদান. রাষ্ট্রদূত ও

কূটনীতিক প্রতিনিধি পর্যায়ের চিঠিপত্র ও চুক্তিসমূহ।

সুতরাং বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে. কূটনীতির
যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্বে সমস্যা যতই জটিল হতেচ্ছ কূটনীতির গুরুত্ব ততোই
বাড়ছে। বিশেষ করে আজকে মুসলমানদের জন্য ইসলাম প্রদর্শিত কূটনীতির
গুরুত্ব অনেক বেশী. কেননা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিজেদের চিরন্তন বিশ্ব ব্যবস্থাকে
পদদলিত করে মানব রচিত বা অমুসলিমদের রচিত আইন কার্যকরকরার ফলে
তাদের উপর চলে আসছে নানা অজুহাতে অর্থনৈতিক. রাজনৈতিক ও সামরিক
আগ্রাসন. চলছে মানবাধীকারের চরম লংঘন। বর্তমানের প্রবঞ্চনাপূর্ণ কূটনীতি ও
আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্বকে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে শান্তির বদলে উপহার
দিয়েছে অরাজকতা. সন্ত্রাস আর যুদ্ধ বিগ্রহ। বিভিন্ন মতবাদের নামে
মুসলমানদেরকে করে রেখেছে দ্বিধা-বিভক্ত। তাই এসব দেশে আজ অনুভূত
হচ্ছে ইসলাম প্রদর্শিত সত্য. প্রবঞ্চনাহীন. উদার ও লোভ-লালসা থেকে উর্দ্ধে
রাজনীতি ও কূটনীতির। এ কূটনীতি মুসলিম বিশ্বকে একত্রিত করে করতে পারে
শক্তিশালী ও উন্নত। এ মর্মে আল্লাহ পাক বলেন-. "তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে
আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (আল-
ইমরান ,১০৩)।

এটা শুধু নীতিকথা নয়। ইসলাম এর আগে উহার বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে
দেখিয়েছে। যদিও কূটনীতির উৎপত্তি হয়েছে ইসলাম পূর্বযুগে এবং পূর্ণতা ও
বিকাশ লাভ করেছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাব ও নবুয়ত প্রাপ্তির পরে।

ইসলাম কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ড. নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠির জন্য
নয়। এটি সার্বজনিন ও চিরন্তন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন-. "আমি আপনাকে
সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি (আল-
ফুরকান-৫৬)।"

এর থেকে বুঝা যায় যে. ইসলামের নীতি শুধু মুসলমানদের জন্য নয়
অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ বর্তমান যুগে ইসলামী ও অনৈসলামী
দেশের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইসলামী প্রদর্শিত কূটনীতির বিশেষ
প্রয়োজন রয়েছে। আর এর গুরুত্বকে প্রস্ফুটিত করেছে নৈতিক ভিত্তি যা পশ্চাত্য
কূটনীতিতে নেই।

দশম পরিচ্ছেদ

ইসলামের যুদ্ধনীতি

ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে মুসলমান ও সাধারণ মানুষকে ফিরিয়ে রাখা ও ইসলামকে ম্লান করে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টারত শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বা সংগ্রাম করে সত্য ও ন্যায়ের পতাকাকে পৃথিবীর বুকে উড্ডিন করার নামই জিহাদ। কিন্তু এই জিহাদ মুসলমানরা কখনো কামনা করেনা কারণ ইসলামে প্রত্যেক মানুষের জান ও মালকে পবিত্র ও সম্মানার্হ বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষের নাগরিক অধিকার সমূহের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান অধিকার হলো বেঁচে থাকার অধিকার, আর অপরকে এই সুযোগ দেয়ার নাম হলো নাগরিক কর্তব্য। তাই কোন বৈধ কারণ ব্যতীত ইসলামে কোন রক্তপাতের অনুমোদন নেই। কিন্তু সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কখনো কখনো বৈধ রক্তপাত অনিবার্য হয়ে পড়ে যা এড়ানো যায় না এবং এ ছাড়াও পৃথিবীতে শান্তিও সম্ভব নয়; ঈমানদাররা ঈমান ও বিবেকের স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না। তাই এ ক্ষেত্রে দরকার একটি সামগ্রীক প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার কথা বললেই জিহাদের কথা এসে পড়ে। বিপর্যয় ও নৈরাজ্য, লোভ ও লালসা, শত্রুতা ও প্রতিহিংসা, গোড়ামি ও কূপমন্ডুকতার এই সর্বাত্মক আগ্রাসনের প্রতিরোধের জন্যই আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে তরবারী উত্তোলনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, যাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাদেরকে প্রতিরোধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার অনুমতি দেয়া যাচ্ছে। কেননা তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন। এরা সেই সব লোক যাদেরকে বিনা অপরাধে তাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা আল্লাহকে নিজেদের একক মনিব ও প্রভু বলে ঘোষণা করেছে। (হজ্জ-৬)

পবিত্র কোরআনে সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে যতগুলো আয়াত আছে তা মধ্যে এ আয়াতটিই প্রথম নাজিল হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে অস্ত্র ধারণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাদের উপর দোষ দেয়া হয়নি যে তাদের কাছে একটি উর্বর ভূখন্ড আছে, কিংবা বড় রকমের বাণিজ্যিক এলাকা আছে। বরং তাদের অপরাধ সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তারা অত্যাচারী এবং ইসলাম

গ্রহণের কারণে মানুষকে নির্যাতন করে।

অত্যাচারী অমুসলমান কিংবা মুসলমান বা ধর্ম নিরপেক্ষবাদী হতে পারে। এরূপ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে (প্রতিরক্ষামূলক) বলা হয়েছে যাতে করে মজলুম ও নিপীড়িত মানুষ তাদের হাত থেকে বাচতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "একদল নির্যাতিত নারী-পুরুষ ও শিশু অনাবরতই কেবল ফরিয়াদ করছে হে প্রভু আমাদেরকে এ জালেমদের হাত থেকে বাচাঁও।" (আন- নিসা-১০)

মোট কথা ইসলামকে সর্বস্তরে বাস্তবায়ন ও জুলুম নিপীড়ন বন্ধের জন্য জিহাদের অবতারণা।

জিহাদের সংজ্ঞা :

জিহাদ শব্দটি আরবী 'জাহদুন' হতে উৎপন্ন যার অর্থ হচ্ছে সাধ্যানুসারে চেষ্টা সাধনা করা, সংগ্রাম করা, কঠোর পরিশ্রম করা, চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করা অথবা কোন কাজে আত্মনিয়োগ করা ইত্যাদি।

মুহাম্মদ (সঃ) এর মক্কায় ইসলাম প্রচারের সময় যে সব আয়াত নাযিল হয় সেখানে জিহাদ শব্দের উল্লেখ থাকলেও কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; সৎকর্ম সাধনে প্রচেষ্টা চালানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সান্নিধ্যলাভ অর্থে জিহাদ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এর বহু নজির রয়েছে যেমন, "যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্ম পরায়নদের সাথে আছে" (আনকাবুত-৬৯)।

"যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শিরক করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই; তবে তাদের আনুগত্য করো না।" (আনকাবুত-৮) কাফির বা শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি বা নির্দেশের ক্ষেত্রে আল্লাহপাক জিহাদের চেয়ে কেতাল শব্দ বেশী ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহপাক বলেন, "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে" (হজ্জ-৩৯) অন্যত্র বলা হয়েছে "সুতরাং তোমরা জিহাদ বা লড়াই করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে" (আন-নিসা-৭৬)। এ রকম বহু আয়াত ও রাসূলের হাদিস রয়েছে যেখানে কেতাল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের উপযোগীতার কারণে 'জিহাদ' শব্দে অস্ত্র যুদ্ধও ক্রমশ শামিল হয়ে যায়। কারণ

যুদ্ধের মধ্যে শ্রম, চেষ্টা এবং পরিনামে চরম ত্যাগের অর্থাৎ আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সব কারণে ফিকাহ্ শাস্ত্রে জিহাদ শব্দটি ইসলাম... বদ্ধপরিকর শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুসলিম মনীষীরা বিভিন্নভাবে জিহাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও বিষয়বস্তু প্রায় অভিন্ন। এদের মধ্য থেকে আল-কাসানীর সংজ্ঞা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, জীবন, ধন, সম্পদ, জিহ্বা ও অন্যান্য উপায়ে আল্লাহর পথে নিজের শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলা হয়।

আল্লামাহ্ মোল্লা আলী ক্বারীও উপরোক্ত সংজ্ঞার সাথে ঐকমত পোষণ করেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সকল মত ও পথের উপর ইসলামকে বিজয়ী মতাদর্শরূপে প্রমাণ করে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা ও সকল প্রকার জুলুম নিপীড়ন বন্ধ করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়।

জিহাদের অবস্থান বা জিহাদ কোন পর্যায়ের হুকুম সে সম্পর্কে মুসলিম মনীষীরা বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন ঈমাম সাওরী ও তাঁর অনুসারীরা বলেন জিহাদ মুস্তাহাব কারণ তাঁরা জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের হুকুম (নির্দেশ) কে মুস্তাহাব (Superogatory) এর নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত ইবন ওমর বলেন যাদের মধ্যে জিহাদ করার ক্ষমতা আছে তাদের উপর জিহাদ ওয়াজিব অন্যথায় মুস্তাহাব। অপরদিকে সাইয়েদ ইবন মুসাইয়্যেব বলেন জিহাদ ফরজে আইন। তিনি জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতগুলোর হুকুমকে আদেশমূলক (Imperative) অর্থে নিয়েছেন। যেমন "আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়" (বাকারাহ-১৯৩)। মোল্লা আলী ক্বারীও এই মতকে সমর্থন করেছেন।

ঈমাম আবু হানিফা ও তার অনুসারীরা বলেন যখন ঈমাম সাধারণভাবে জিহাদের ডাক দেন তখন মহিলা, বৃদ্ধ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক লোক ব্যতীত সকলের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। কারণ ঈমামের আনুগত্য করা ফরজ, যেমন আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের নেতাদের বা ঈমামদের" (আন-নেসা -৫৯)।

ফকিহ্গণের অধিকাংশই বলেন যে, মুসলমানদের উপর ক্ষেত্র বিশেষে জিহাদ ফরজে আইন এবং ক্ষেত্রে বিশেষে ফরজে কিফায়া। ফরজে আইন হলে সবার (সমর্থবান) উপরে বাধ্যতামূলক হয় আর ফরজে কিফায়া হলে

...দের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক যোদ্ধা যুদ্ধ করলে সকলের পক্ষ থেকে ...করা হয়। যেমন আধুনিক যুগের মুসলিম দেশের সেনা বাহিনী। তারা ...পক্ষ থেকে দেশ রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। এক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর ...র জিহাদ ফরজে আইন এবং জনগণের উপর ফরজে কিফায়া। জমহুর ...গণ (অধিকাংশ) পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্ উল্লেখপূর্বক এর স্বপক্ষে ...মত ব্যক্ত করেন। যেমন আল্লাহপাক বলেন, "আর তাদের যুদ্ধ করতে থাক ...ক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র দ্বীন পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়" (...আনফাল-৩৯)।

রাসুল (সঃ) বলেন, "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই একথা না বলা ...র্যন্ত আমাকে জিহাদ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "শেষ ...দিবস পর্যন্ত জিহাদ জারি থাকবে"। উপরোক্ত আয়াত ও হাদিস দুটি বিশ্লেষণ ...রে জমহুর আলেমগন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাস্তব অবস্থা ও সময়ের ...দাবিদায় জিহাদ ফরজে আইন অথবা ফরজে কিফায়া হতে পারে।

মুসলিম মনীষীগণের মতে নবী করিম (সঃ) এর মদীনায় হিজরত করার ...পর জিহাদ ফরজ করা হয়। হিজরতের পূর্বে জিহাদ সম্পর্কিত কোন আয়াত ...নাযিল হয় নাই। মক্কী জীবনে শুধুমাত্র হিকমত ও কৌশলের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ...ও আত্মগঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন, "আপন পালন ...কর্তার পথে আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে তর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়" (আন-নাহল ১২৫)।

হিজরতের পর রাসুলের উপর প্রথমাবস্থায় প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের নির্দেশ ...দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "আর লড়াই করোনা। ...নিশ্চয় আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীকে পছন্দ করেন না" (বাকারাহ্-১৯০)। এভাবে ...সর্বশেষ পর্যায়ে যখন ন্যায় ও সত্যের আলো উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে এবং মুসলিম ...শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে ঐক্য ও সুদৃঢ়তা লাভ করে একটি প্রতিদন্দী জাতি ও রাষ্ট্র ...হিসেবে পরিগণিত হয় তখন আল্লাহর একাত্ববাদ ও দ্বীন ইসলামের প্রচার ও ...প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এখানে ...কোরআনের আয়াত প্রনিধান যোগ্য অর্থাৎ "তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে ...পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি ...তারা নিবৃত্ত হয় তা হলে কারো প্রতি জবরদস্তি নাই কিন্তু যারা জালেম তাদের

ব্যাপার আলাদা" (বাকারাহ্-১৯৩)। জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতগুলো প্রতিরক্ষামূলক হোক বা আদর্শমূলক হোক সবই হিজরতের পর নাজিল হয়েছে। সুতরাং জিহাদ হিজরতের পর ফরজ হয়েছে এবং এ হুকুম বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

জিহাদ পরিচালনায় নেতৃত্বের প্রয়োজন:

জিহাদ সমষ্টিগতভাবে কোন যোগ্য নেতা বা শাসকের নির্দেশে বা সরাসরি আদেশে করা হয়। ফরজে আইন বা ফরজে কিফায়া যাই হোক না কেন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিজেরা উদ্যোগী হয়ে জিহাদ ঘোষণা দিতে পারে না। কেননা সেক্ষেত্রে বিশৃংখলা বা ফাসাদ সৃষ্টি হবে আর ইসলামে ফাসাদ খুবই ঘৃনিত। জিহাদের প্রয়োজন হলে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক জিহাদ করার জন্য প্রথমত নিয়মিত সৈনিকদের নির্দেশ দিবেন এবং প্রয়োজনে সমর্থবান লোকদের আহ্বান করবেন। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসক ব্যক্তিগতভাবে ফাসেক ও অত্যাচারী হলেও জিহাদের জন্য তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়া জনগণের জন্য কর্তব্য বা তার নেতৃত্বে জিহাদ করা বৈধ। আবু ইউসুফ তাঁর খারাজ গ্রন্থে বলেন, খলিফা বা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া কোন সেনাবাহিনী অভিযানে বের হবে না। এ ব্যাপারে আল্লামাহ মাওয়ার্দি বলেন, খলিফার আদেশ ছাড়া কোন যুদ্ধ করা যাবে না। এখানে রসূলের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে অর্থাৎ রাসুল (সঃ) নিজেই জিহাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং কখন কখন বিচক্ষণ সাহাবাদেরকে জিহাদ পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। জিহাদে গিয়েও খলিফার অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করা যাবে না: ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা আক্রোশ জিহাদে প্রতিফলিত হতে পারে না।

জিহাদ হবে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। একবার হযরত খালেদকে বনু জুজাইমার নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠানো হয় সেখানে কোন কারণে তিনি সেনাপতির অনুমতি ছাড়াই কিছু লোককে হত্যা করেন। রাসুল (সঃ) একথা জানতে পেরে রাগের আতিশয্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং তৎক্ষণাৎ আলী (রাঃ) কে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, জাহেলী যুগের সকল কার্যকলাপ পদতলে নিষ্পেষিত করে দাও। কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমনের কারণে যদি এমন অবস্থা হয় যে, প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে যুদ্ধ করতে হলে শত্রু পক্ষ মুসলিম জনতা বা ভুখন্ড দখল করে নিবে সেক্ষেত্রে পূর্ব অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধ করা যাবে তবে কোন রকম বিশৃংখলা বা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা যাবে না। (সিয়ার আল কাবির)।

জিহাদ ঘোষণার বৈধতা:

ফকিহ্‌গণ জিহাদ ঘোষণার জন্য কয়েকটি বৈধ কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা:

ক. মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা: আল্লাহপাক মানুষকে অতি সম্মানীয় করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বাক স্বাধীনতাসহ সকল বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ যে সম্মানীয় সে সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন, "আমি মানুষকে সম্মানসহকারে পাঠিয়েছি।" সুতরাং মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করে গোলামে পরিনত করার জন্য অপর একদল মানুষ যখন চেষ্টা করে তখন তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করা বা শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি রয়েছে। বর্তমান যুগেও খোদাদ্রোহী শক্তি কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, ফিলিপাইনের মিন্দানাও এবং অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের গোলামে পরিণত করার সকল রকম চেষ্টা করছে। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করা মুসলমানদের নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য।

খ. ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা: মুসলিম রাষ্ট্রের উপর যখন অমুসলিম শত্রুরা আগ্রাসন চালায়, সীমান্তে জনগণের উপর জুলুম-নিপীড়ন করে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও জনগণকে রক্ষার জন্য জিহাদ ঘোষণা করা বৈধ। এ পর্যায়ে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে দুটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে জিহাদ ঘোষণা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে: (১) ইসলামী রাষ্ট্র পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাষ্ট্রের দ্বারা হুমকীর সম্মুখীন হলে বা কোন অংশ দখল করে নিলে বা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে:

গ. ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া: এপ্রসঙ্গে কোরআনের বাণী হচ্ছে, "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম" (হজ্ব-৩৯)।

ঘ. দ্বীনের দাওয়াতী কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা ও দ্বীনকে সর্বোচ্চে তুলে ধরা:

মুসলমানরা একটি মিশনারী জাতি। তাদেরকে পাঠানো হয়েছে সারা বিশ্বে ইসলামের সুমহান বাণীকে প্রচার করার জন্যে। এ কাজটি মুসলমানদের ইবাদতের একটি অংশ। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে সমষ্টিগত ভাবে একাজের আনজাম দেয়া যায় তবে কাজটি সহজ নয়। এপথে রয়েছে প্রচুর বাঁধা বিপত্তি। এসব বাঁধা বিপত্তি দুর করার জন্য মুসলমানরা পরিস্থিতি অনুযায়ী জিহাদের পথ বেছে নিতে পারে এবং জিহাদ করে ইসলামকে অন্যান ধর্মের

উপরে বিজয়ী দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আর এটাই আল্লাহর নির্দেশ যেমন তিনি বলেন," তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসুলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে যেন এদ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে" (আত-তাওবাহ্-৩৩)।

মুসলমানদের জন্য বৈধ যুদ্ধঃ

সব যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। যেসব যুদ্ধ বৈধ তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক. চলমান যুদ্ধের জের: অর্থাৎ কোন কারণ বশত: যুদ্ধ বন্ধ হয়ে থাকলে তা পুনরায় শুরু করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে উভয়পক্ষের অবসন্ন হওয়া বা সন্ধি বা বিনা সন্ধিতে কিছু সময়ের জন্য পারস্পরিকভাবে যুদ্ধ বন্ধ রাখা হয়েছিল। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে,"যুদ্ধ রহিত থাকার মাসগুলি (চুক্তিঅনুসারে) অতিবাহিত হয়ে গেলে যেখানে মুশরিকদের দেখতে পাও হত্যা কর এবং বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং তাদের জন্য গোপন স্থান তৈয়ার কর" (আত-তাওবাহ্-৫)।

আল্লামাহ সারাখসী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন -চুক্তির মেয়াদ অপর পক্ষের সাথে শেষ হয়ে যাবার পর যুদ্ধ শুরু করা বৈধ। এপ্রসঙ্গে ঈমাম মালেক বলেন, প্রতিপক্ষকে চুক্তির শর্ত পরিপূর্ণ করার সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে সেক্ষেত্রে তাদের উপর হামলা করা বৈধ।

খ. আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ: খোদাদ্রোহী শক্তি যখন আগ্রাসন চালিয়ে ইসলামী ব্যবস্থাকে নির্মূল ও উৎখাত করে মুসলমানদের ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মতবাদ চাপিয়ে দিতে চায়, তখন তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। এ ধরণের যুদ্ধ দু'অবস্থায় হতে পারে যেমন:(১) কোন শত্রু দেশ মুসলিম সাম্রাজ্যে হামলা করে মুসলমানদের জীবন যাত্রাকে ব্যাহত করলে মুসলমানদের জান ও মাল নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়লে তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নির্দেশ এরূপঃ "যারা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের সঙ্গে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর কিন্তু সীমা লংঘন করো না" (বাকারা-১৯০)

(২) কার্যত মুসলিম রাষ্ট্রের উপর হামলা করেনি কিন্তু অসহনীয় দুর্ব্যবহার ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি হুমকী প্রদর্শন করে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ। এ প্রসঙ্গে

কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে, "তুমি কি ঐ সব ব্যক্তিদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের পবিত্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিল এবং আল্লাহ্র রাসূলকে (সঃ) বহিস্কৃত করতে চেয়েছিল এবং প্রথম তোমাদেরকে হামলা করেছিল" (তওবাহ -১২)।

এ প্রসঙ্গে রাসুল (সঃ) বলেনঃ "যে কেউ তার প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে যুদ্ধ করে এবং নিহত হয় সে শহীদ বলে গণ্য হয়।" (জামেউল জাওয়ামে- ৪র্থ খন্ড)।

গ. সহানুভূতি মূলক যুদ্ধ: শত্রু দেশে বা বিদেশে অবস্থানকারী কোন মুসলমান বা মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ব্যাপারে জুলুম-নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অমুসলিম বা শত্রু দেশের সরকারের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রার্থনা করে তখন তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিবে। এ প্রসঙ্গে কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে "কিন্তু যদি ধর্মের প্রয়োজনে তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থী হয়, তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে এর ব্যতিক্রম হবে যদি ঐ ব্যক্তিগণের সংগে তোমাদের কোন সন্ধি বা চুক্তি থেকে থাকে। আল্লাহ তোমাদের কর্ম দেখে থাকেন" (আনফাল-৭২)। সূরা নেসার ৭৫-৭৬ আয়াতে দূর্বল, নর-নারী ও শিশুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া সংক্রান্ত ফরিয়াদের উল্লেখ আছে।

ঘ. শাস্তিমূলক যুদ্ধ: কয়েকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা যেতে পারে। যেমন:

ধর্মত্যাগী: যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কিন্তু পরে ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে এবং সমাজে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া আইনসঙ্গত। এ ছাড়াও কোন মুসলমান সম্প্রদায় বা গোত্র যাকাত বা শরীয়তের অন্যান্য কর্তব্যের অপরিহার্যতা অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করা যায়। হযরত আবু বকরের (রাঃ) শাসন আমলে অনুরূপ ঘটনা ঘটলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছিল। যা ইতিহাসে রেদ্দার যুদ্ধ নামে খ্যাত।

ঙ. বিদ্রোহ: ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বিরোধীতাকারীদের অর্থাৎ যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী বা যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকে উৎখাত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা বৈধ। প্রথমে তাদেরকে শান্তির দিকে আহ্বান করতে হবে। সাড়া না দিলে যুদ্ধ ঘোষণা বৈধ। এ প্রসঙ্গে কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে "যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপরদলের উপর চড়াও হয় তবে তোমরা আগ্রাসী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে

ফিরে আসে" (হুজরাত-৯)।

ঘ. চুক্তি ভঙ্গ: শত্রু পক্ষের সাথে মুসলমানদের চুক্তি হলে চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা শত্রু পক্ষ চুক্তি পালনে অনিহা প্রকাশ করলে, চুক্তি পালনের ব্যাপারে চাপ প্রয়োগের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা আইন সঙ্গত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে "আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর" (তওবাহ-১২)। সূরা আনফালের ৫৬ নং আয়াতের নির্দেশ হচ্ছে "যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ তাদের মধ্য থেকে অতঃপর প্রতিবার তারা নিজেদের কৃত চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং ভয় করে না।" সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও তবে এমন শাস্তি দাও যেন তাদের উত্তর সূরীরা দেখে পালিয়ে যায় এবং শিক্ষা হয়।

ঙ. আর্দশ ভিত্তিক যুদ্ধ: প্রত্যেক জাতির নিজস্ব আদর্শ থাকে, যার মধ্য থেকে সে সর্বদা প্রেরণা লাভ করে থাকে। যে জাতি যত গভীরভাবে তার আদর্শকে উপলব্ধি করে ততো নিষ্ঠ ও আগ্রহের সাথে তা বাস্তবায়িত করার প্রয়াস পায়। মুসলমানদের আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ ও বসর্বশেষ জীবন ব্যবস্থা যা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট পাঠান হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম" (আল-ইমরান, ১৯)। এর মূল কথা হচ্ছে প্রত্যেক জাতি, দেশ নির্বিশেষে সমস্ত ঈমানদারগণ সমান এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পৃথিবীতে একচ্ছত্রভাবে প্রভাবশালী হবে। এছাড়াও এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত নাস্তিকতা ও তাগুতী শক্তির মূলোৎপাটন করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করা যাকে আল্লাহ্র পথ বলে অভিহিত করা হয় এবং এ পথে যুদ্ধ করাকে আদর্শভিত্তিক যুদ্ধ বলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে "তিনি প্রেরণ করেছেন আপন রাসূল (সঃ) কে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে" (তওবাহ-৩৩)।

ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা ও ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে ইসলামে স্বাধীনতা রয়েছে। তাই কাউকে বল পূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করা আইন সংগত নয়; কিন্তু মুসলিম অধ্যুসিত এলাকায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই শরীয়তের উদ্দেশ্য; তবে সংখ্যালঘু অমুসলিমদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া

...য়েছে। তবে তাদের উপর শরীয়ত চাপিয়ে দেয়া হয় না।

...ফিকহ্ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ যেমন মাবসুত, বাদাই ওয়া সানাই ও আহ্কাম-আস-সুলতানিয়া ইত্যাদিতে উল্লেখ রয়েছে যে মুসলিম রাষ্ট্র অভ্যন্তরীন গোলযোগ ও বিশৃংখলা থেকে মুক্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ইসলাম গ্রহণ বা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য মেনে নেয়ার আহ্বান জানাতে পারে। আহ্বান উপেক্ষিত হলে অথবা উল্টো হুমকীর আশংকা দেখা দিলে ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে ও পার্থিব শক্তি অর্জন করে জয় লাভ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে, হে ঈমানদারগণ তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ আল্লাহ্ মুত্তাকিনদের সাথে রয়েছেন" (তওবাহ-১২৩)।

যুদ্ধে অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ :

যুদ্ধে সব কাজ আইনসম্মত নয়। ইসলামী আইনে কিছু কাজকে আইন সম্মত ও কিছু কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমেই আইন সম্মত কাজগুলির আলোচনা করা হল :

ক. ওৎ পাতা: শত্রুর জন্য ওৎ পেতে থাকা বৈধ। শত্রু হাজির থেকে নাগালের বাইরে থাকলে তাকে অবরোধ করা যেতে পারে, তা শিবিরেও হতে পারে; দূর্গে বা অন্য কোন স্থানে হতে পারে। সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুদের নিহত বা আহত করা ও পশ্চাদ্ধাবন করে বন্দী করা আইন ও নৈতিকতা বিরোধী নয়। লক্ষ্য বস্তুর অবস্থান যদি দূরে হয় বা চেনা যায়না অথবা শত্রুপক্ষ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বেসামরিক লোকদেরকে জিম্মি হিসেবে নিয়ে আসে তাহলে তীর নিক্ষেপ আইন সঙ্গত। তায়েফ অবরোধের সময় রাসূল (সঃ) পাথর নিক্ষেপ করা যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন (শরহ্ সিয়ার আল-কাবির, সারাখসী; সীরাত ইবনে হিশাম)। বর্তমানে যে ক্ষেপনাস্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করাও আইন সম্মত।

খ. কৌশল অবলম্বন: যুদ্ধের ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন বৈধ। মহানবী (সঃ) যুদ্ধে সাধারণ এমন সব বাহ্যতঃ বিভ্রান্তিকর কথা রটিয়ে দিতেন এবং অস্পষ্ট ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গী ব্যবহার করতেন যার ফলে শত্রু পক্ষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়তো। যুদ্ধে গুপ্তচর ব্যবহার করাও বৈধ। মহানবী (সঃ) জীবদ্দশায় গুপ্তচর পাঠানো হতো শত্রু ও তার মিত্রদের দলের ভিতরে অনৈক্য বা বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য এবং শত্রুকে হতাশ

বা ভগ্নোদ্যম করার উদ্দেশ্যে তারা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করতো অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য একাজ করা হতো। (ইবনে হিশাম, তাবারী, সিয়ার আল-কাবির)'

গ. পানি ও রসদ বন্ধ করণ: যুদ্ধে শত্রুদের পানি ও রসদের সরবরাহ বন্ধ করা যেতে পারে, কিংবা অন্য কোন উপায়ে ব্যবহারের অযোগ্য করে দেয়া যেতে পারে। মহানবী (সঃ) বদর ও খায়বার যুদ্ধে শত্রুদের পানি বন্ধ করে দিয়ে দুর্বল করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও শত্রুদেরকে সর্ব প্রকার অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করা যেতে পারে। এই বিষয়ে জাহাজ ও দূর্গগুলোকে একইভাবে গণ্য করা হত। একজন ঐতিহাসিক এস. পি. স্কট উল্লেখ করেছেন যে হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে স্পেনের মুসলমানগণ কামান ব্যবহার করতেন। ক্রুসেডকালে মুসলমানরা এক প্রকার সামুদ্রিক মাইন ব্যবহার করতেন। (History of Moorish Empire in Europe; Principles of International Law-Lawrence.) আইন ও আচরন সংক্রান্ত এইগুলি মাত্র কয়েকটি উদাহরণ। সমস্ত বৈধ কার্যাবলীর বিশদ তালিকা দেওয়া কঠিন। সাধারণ মূলনীতির ভিত্তিতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, যা নিষিদ্ধ নয়; তাই বৈধ। যুদ্ধে নিষিদ্ধ কাজসমূহ:

যুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করা ও তার অনিষ্ট সাধন করা নয় বরং উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র তার থেকে ক্ষতি ও অনিষ্ট রোধ করা। এ জন্য ইসলামের নীতি হলো যুদ্ধে শুধুমাত্র যতটা শক্তি প্রয়োগ না করলে ক্ষতি ও অনিষ্ট রোধ করা সম্ভব নয়, কেবল ততটাই প্রয়োগ করা উচিত। আর সেই সীমিত শক্তির প্রয়োগ ও হওয়া চাই শুধুমাত্র সেই সব লোকদের বিরুদ্ধে যে সব জিনিষের সাথে যুদ্ধের সম্পর্ক নেই তাকেও আক্রমণের আওতায় আনা উচিত নয়। এ জন্যে ইসলামে যুদ্ধে কিছু কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে থেকে কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা হল:

ক. বেসামরিক লোকদের নিরাপত্তা: ইসলাম বেসামরিক লোকদের পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছে। এদের মধ্যে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, তপস্বী, পাদ্রী, সেবক, পর্যটক ইত্যাদি ধরণের লোকদের উপর কোন আক্রমণ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সঃ) বলেন "কোন বৃদ্ধ শিশু ও নারীকে হত্যা করো না" (ফতুহুল বুলদান-৪৭)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কোথাও সৈন্য প্রেরণের সময় উপাসনালয়ের নিরীহ সেবকদের ও আশ্রমের সাধক-সন্নাসীদের

হত্যা করতে নিষেধ করে দিতেন। কিন্তু ফকিহগণ বলেন যে, যদি কোন নারী গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত হয়, শিশু গোপন তথ্য আদান-প্রদান করে এবং ধর্মীয় প্রধান বা উপসানালয়ের লোকেরা তার জাতির মধ্যে যুদ্ধের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তা হলে তাকে হত্যা করা বৈধ। (ফতহুল কাদির ৪ খন্ড, বাদাঈ ওয়া সানাঈ, ৭ম)।

খ. সামরিক লোকদের বিরুদ্ধে শর্ত সাপেক্ষে অস্ত্রধারণ: সামরিক লোকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ বৈধ থাকলেও সে অধিকার সীমাহীন বা শর্তহীন নয়। তাই তাদের উপর অতর্কিত হামলা করা বৈধ নয়, বিশেষ করে রাতে ঘুমের অবস্থায়। তৎকালীন যুগে রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় অতর্কিত হামলা করার প্রথা ছিল। রাসূল (সঃ) তা নিষেধ করে দেন। শত্রুদেরকে আগুনেপুড়িয়ে মারা যাবে না। নবী করিম (সঃ) বলেন 'আগুন আল্লাহর শাস্তি, এর দ্বারা তার বান্দাদের শাস্তি দেয়া উচিত নয়।" এছাড়াও হযরত মুহম্মদ (সঃ) শত্রুকে বেঁধে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

গ. লুটতরাজ ও সম্পদ নষ্ট না করা: লুটের মালা-মাল মৃত প্রাণীর গোশতের মতই অবৈধ। খাইবর যুদ্ধে সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর কিছু মুসলিম সৈন্যের ব্যাপারে এক ইহুদী গোত্রপতি রাসূলের (সঃ) কাছে অভিযোগ করলে রাসূল (সঃ) বলেন "তোমাদের কেউ কি গর্বিত হয়ে এরূপ মনে করছে যে, কোরআনে যা যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা ছাড়া আর কিছু নিষিদ্ধ নয়। আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে যে সব উপদেশ দিয়ে থাকি যা যা আদেশ বা নিষেধ করি তাও কোরআনেরই মত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তোমাদেরকে আহলে কিতাবের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা, তাদের নারীদের মারপিট করা ও তাদের ফল খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা তারা যা যা দেওয়া উচিত তা ইতিমধ্যেই তোমাদেরকে দিয়েছে" (আল-জিহাদ)।

এ ছাড়াও সৈন্যদের অগ্রাভিযান চালানোর সময় ফসল নষ্ট করা যাবেনা, ফলের গাছ কাটা যাবে না, জনপদসমূহে গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ করা যাবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব ফাসাদ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, "সে যখন শাসকের পদে অধিষ্ঠিত হয় তখন পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ানো এবং ফসল নষ্ট করা ও গণহত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু

আল্লাহ অরাজকতাকে পছন্দ করেন না" (বাকারাহ্-২৫)। হযরত আবু বকর সিরিয়া ও ইরাকে সৈন্য পাঠানোর সময় এ বলে নির্দেশ দেন যে, জনপদসমূহকে ধ্বংস করা ও ফসল নষ্ট করা অবৈধ। (বিস্তারিত দেখুন কিতাবুল জিহাদ)

ঘ. উচ্ছৃংখলতা, নৈরাজ্য ও দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি অবৈধ: জিহাদে যাওয়ার পথে বা শিবির স্থাপন করে তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিশৃংখলা ও গোলযোগ সৃষ্টি করা ঘৃনিত ও অবৈধ। রাসূল (সঃ) বলেন "যে ব্যক্তি স্থানীয় বেসামরিক লোকদের উত্যক্ত করবে অথবা পথিকদের লুন্ঠন করবে তাদের জিহাদ হবে না" (আবু জিহাদ)।

ঙ. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অবৈধ: প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, চুক্তি লংঘন, বিশ্বাস ঘাতকতা ও চুক্তিবদ্ধদের সাথে বাড়াবাড়ি করার নিন্দা করে বহু হাদিস বর্নিত হয়েছে। সে দিক থেকে এটা ইসলামে একটা জঘন্য পাপ কাজ। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বর্নিত আছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিককে হত্যা করবে, সে বেহেস্তের ঘ্রানও পাবে না। রাসুল (সঃ) আরো বলেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাস ঘাতক ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর জন্য এক ঝান্ডা থাকবে যা তার বিশ্বাসঘাতকতারই সমপর্যায়ভূক্ত হবে। মনে রেখ যে, জননেতা বিশ্বাস ঘাতক হয় তার চেয়ে বড় বিশ্বাস ঘাতক আর কেউ হতে পারে না।"(সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম কিতাবুল জিহাদ)।

যুদ্ধের নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে সামান্য কয়েকটি আলোচনা করা হল। (বিস্তারিত জানার জন্য বিভিন্ন ফিকহ এর গ্রন্থসমুহ যেমন-হেদায়া, বাদাঈ-ওয়া-সানাঈ, মুগনী, মাহাল্লাহ ও হাদিস গ্রন্থের জিহাদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সামুদ্রিক যুদ্ধ:

মুসলমানরা শুধু স্থল যুদ্ধে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁরা নৌ-যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছে। যেমন অষ্টম হিজরীতে মূতার অভিযানের উদ্দেশ্যে আয়লা নামক স্থানে মহানবী (সঃ) মানুষ ও রসদ নিয়ে সামুদ্রিক অভিযানে বের হন। কারণ সেখানে একজন মুসলিম দূতকে হত্যা করা হয়েছিল। নিগ্রো জলদস্যুদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষাকরার জন্য নবম হিজরীতে আলকামা ইবনে মুজাযযিয এর নেতৃত্বে লোহিত সাগরের এক দ্বীপে এক বাহিনী পাঠানো হয়। মহানবীর জীবদ্দশায় এইরূপ শান্তি ও যুদ্ধ কালে নৌবাহিনীর ব্যবহারের ফলে উষ্ট্রচালকও

...দের সুদক্ষ নাবিকে পরিণত হয়েছিল। তাবারীর মতে আবু বকরের খিলাফতকালে ইরাক অভিযানের সময় নৌবাহিনী ব্যবহৃত হয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এর সময় করাচী (দায়বল)ও বোম্বাই (তার্ণার) এর বিরুদ্ধে নৌবাহিনী প্রেরণ করা হয়। তাঁর নির্দেশে কায়রো (ফুসতাত) থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত একটি খাল খনন করা হয়। পরবর্তীতে এই খালটি লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরকে সংযুক্ত করেছিল যা আধুনিক কালের সুয়েজ খালের কাজ করত। খলিফা ওসমানের সময় নৌ অভিযান চালিয়ে অনেক দ্বীপ ও বন্দর মুসলমানরা দখল করে।

সেকালের নৌযুদ্ধের বিবরণ পাঠে, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোন থেকে স্থল যুদ্ধ ও নৌযুদ্ধের আইন কানুনের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। খলিফা মুয়াবীয়ার রাজত্বকালে প্রতিশোধ স্বরূপ শত্রুদের নৌবাহিনী ধ্বংস করার জন্য মুসলমানরা 'গ্রীক অগ্নি' নামে এক ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেছিল যাকে আধুনিক যুগে ক্ষেপনাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। এভাবেই মুসলমানরা প্রথমে দূর পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করে।

মুসলমান ফকিহ্গণ নৌকা বা জাহাজকে স্থলের উপর দূর্গের মতোই মনে করতেন, তাই নৌ অবরোধ ও ব্লকেড সংক্রান্ত কোন বিশেষ আইন তারা উল্লেখ করেন নাই, তবে আধুনিক যুগের নৌযুদ্ধের আইন -কানুন ও কনভেনশন শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক না হলে মুসলমানদের জনা মেনে চলা দোষনীয় হবে না কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্যাপিরাস রেকর্ড পত্র থেকে মুসলিম বন্দর গুলিতে আত্মরক্ষামুলক ও আক্রমণাত্মক ঘাঁটিগুলির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এমন কি আরবী ভাষায় নৌকা ও জাহাজের জন্য তিন শতাধিক শব্দ প্রচলিত আছে, যার মধ্য থেকে এ্যাডমিরাল ও আর্সেনাল প্রভৃতি শব্দ ইউরোপীয় ভাষায় নেয়া হয়েছে।

আকাশ যুদ্ধ:

আল মাককারী তাঁর 'নাফে আত ত্বিব' পুস্তকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্বাস বিন ফিরনিস (মৃত্যু-৮৮৮ খ্রীঃ) মানুষ দ্বারা চালিত একটি উড়োজাহাজ নির্মাণ করেছিলেন এবং সাফল্যের সাথে উড্ডয়নের পর অবতরণকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর এই গবেষণা বন্ধ হয়ে যায় এবং আকাশে প্রভাব বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই। তথাপিও এতে কোন সংশয় নাই যে, যদি এইরূপ প্রচেষ্টায়

বেশী লোক নিয়োযিত থাকত এবং প্রয়োজনীয় লোক শিক্ষিত ও দক্ষ হত, তা হতে যুদ্ধকালে এদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেত, যা এক হাজার বছর পর ইউরোপীয় খৃষ্টানরা ব্যবহার করছে। স্বাভাবিকভাবে একারণে আকাশযুদ্ধ সংক্রান্ত আইন-কানুন ইসলামী সাহিত্যে নাই। যাহোক সাধারনভাবে মুসলমানরা সব সময় মূলনীতির উপর অটল থাকে। মুসলমানরা চুক্তি ও সন্ধিবদ্ধ থাকলে সে অনুযায়ী কাজ করে। আকাশ যুদ্ধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন-কানুন বা আচরণ বিধি যদিও সাময়িক তবুও ঐগুলি মুসলিম আইনের অংশ বলা যেতে পারে যদি শরীয়ার সাথে কোন বিরোধ না থাকে. কেননা এ যাবত স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ঐগুলি অনুসরন করে চলছে।

জিহাদে মুসলিম নারী:

রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) এর জীবদ্দশায় এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাগণ সেবিকা. পাচিকা পানিবহনকারিনী এবং সাধারণ খাদেম হিসেবে অংশ গ্রহণ করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যিকার যোদ্ধা হিসেবে অংশ গ্রহণ করতেন কাদেসিয়ার যুদ্ধে মহিলাগণ মৃতের কবর খনন করা ছাড়াও মুল্যবান ভূমিকা পালন করেছিল অর্থাৎ তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে কুচকাওয়াজ করে মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করেছিল। তাদের কুচকাওয়াজের মাধ্যমে মুসলিম সেনা বাহিনীর বিশালতা দেখে শত্রুরা ভয় পেয়ে যায়। এই যুদ্ধে সাতশত মহিলা অংশ গ্রহণ করেছেন। তাদেরকে সেনা ছাউনীতে ভান্ডার রক্ষক হিসাবে ও নিয়োগ করা হতো। পরবর্তী কালের ফকিহ্গণ মহিলাদেরকে স্বেচ্ছাসেবিকা ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য বেশী বয়সের হওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। তথাপি আমরা দেখতে পাই যে. রাসূলের যুগে অবিবাহিতা যুবতিগন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে (ইবনে হিশাম)। হযরত আয়েশা (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবিকাদের সঙ্গে আহত যোদ্ধাদের সেবা করেছেন। বুখারী শরীফের উক্তি অনুযায়ী মহানবীর স্ত্রীগণ পর্দা প্রথা নাযিল হওয়ার পরও যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছেন। শায়বানীর মতে সামরিক অভিযানে যুবতি মেয়েরা স্বেচ্ছাসেবিকা ও প্রয়োজনে সৈনিক হিসেবে কাজ করতে পারে যদি তাদের আত্মীয়দের আপত্তি না থাকে: একজন স্বাধীন নারী আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সামরিক অভিযানে যেতে পারে: কিন্তু নিকট আত্মীয়ের বিনা অনুমতিতে যাওয়া উচিত নয়. যে বয়সেরই হোক না কেন। মোটকথা ইসলাম, মুসলিম ও ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার জন্য জিহাদের ডাক আসলে প্রয়োজনে সক্ষম

মুসলিম মহিলাগণ অংশ গ্রহণ করবে এবং তাদের এই অংশ গ্রহণে শরীয়তে কোন বাধা নাই।

জিহাদের মর্যাদা:

জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন ও জাতীয় সত্ত্বাকে কোন অবস্থাতেই অন্যায় ও দুস্কৃতির কাছে পর্যুদস্ত হতে না দেয়া এবং দুস্কৃতি ভেতর বা বাইরে যে দিক থেকেই হোক না কেন তাকে নির্মূল করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা। আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের কাছ থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিতে চান. তার প্রাথমিক প্রয়োজন হলো তাদের সব রকমের জাতীয় ও মানবিক দুর্যোগ থেকে নিরাপদ থাকা এবং জাতীয় ও রাজনৈতিক শক্তি অটুট ও দৃঢ় রাখা। আর এ কাজে যারা অংশ নিচ্ছে তাদের জন্য রয়েছে অশেষ মর্যাদা ও পুরস্কার। যেমন আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বলেন "হে ঈমানদারগণ তোমাদের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে এমন একটা ব্যবসার সুসংবাদ দিব ব্যবসাটি হলো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং জান ও মাল দিয়ে তার পথে জিহাদ করা। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তা হলে এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কাজ। আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তোমাদের গুনাহ্ কে মাফ করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তল দেশে থাকবে প্রবাহিত ঝর্নাধারা এবং সেখানে তোমরা পরম শান্তিতে বসবাস করবে এবং এটাই তোমাদের জন্য মহান বিজয়" (আস্-সফ-৯-১২)। আল্লাহপাক আরো বলেন. "তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং কাবা শরীফের সেবা ও তত্ত্বাবধান করাকে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের কাজের সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে-করেছ আল্লাহর কাছে এ দু'গোষ্ঠি সমান নয়। আল্লাহ জালেমদের সুপথে পরিচালিত করেন না। যারা ঈমান এনেছে সত্যের জন্য বাস্তুভিটা ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে লড়াই করেছে. তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠতর। তারাই প্রকৃত পক্ষে সফলকাম" (তওবাহ-১৯)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন "আল্লাহ্ বেহেস্তের বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এবং তারা এর বিনিময়ে পার্থিব জীবনে আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হবে এবং ইসলামের শত্রুদের হত্যা (জিহাদে) করবে" (আত-তাওবা..১১১)। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন. আল্লাহ সেইসব মুজাহিদকে অত্যধিক ভালবাসেন যারা আল্লাহ্‌র পথে লৌহ প্রাচীরের তারবদ্ধ হয়ে লড়াই করে (আস-সফ-৪)।

বস্তুতঃ একেই বলা হয়েছে সত্যের লড়াই। এ লড়াইয়ে এক রাত জাগা হাজার রাত জেগে ইবাদাত করার চেয়েও উত্তম। এখানে ময়দানে ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে শত্রুর সামনে রুখে দাঁড়ান ঘরে বসে ৬০ বছর নফল নামাজ পড়ার চেয়েও পূণ্যের কাজ। জিহাদের উদ্দেশ্য যখন অন্যরাজ্য ও ধন-সম্পদ হস্তগত করা নয় তাহলে এ রক্তপাতে আল্লাহর কি উদ্দেশ্য তিনি এতবড় মর্যাদা ও পূণ্য কেন বরাদ্দ করলেন এবং কেনই বা বারংবার বলা হচ্ছে তারাই সফলকাম উত্তরে বলা যায় যে, আল্লাহ মানুষকে মানুষ দিয়ে জব্দ না করালে পৃথিবী অরাজকতায় ভরে যেত। (হজ্জ-৪০) এবং "তোমরা প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ না করলে পৃথিবীতে ভয়াবহ নৈরাজ্য ও বিপর্যয় দেখা দিবে (বাকারাহ ২৫১)। বস্তুতঃ আল্লাহ তার পৃথিবীতে অরাজকতা ও বিপর্যয় দেখা দিক তা চান না। তিনি চান না তার বান্দাদের বিনা অপরাধে নির্যাতন করা হোক, ধ্বংস করা হোক তাদের বাড়ী ঘর। সবলের দুর্বলের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জীবনকে বিপর্যয় ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিক এটা তিনি সহ্য করতে রাজী নন। পৃথিবীতে প্রতারণা, জুলুম, হত্যাকান্ড ও লুটতরাজ বিরাজমান থাকুক এটা আল্লাহর কামনা নয়। সুতরাং যে মানব গোষ্ঠি কোন প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ধনদৌলতের আশা ও অভিলাষ ছাড়াই কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পৃথিবী থেকে ঐসব অরাজকতা, জুলুম, নিপীড়ন উচ্ছেদ করে ন্যায় নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয় তারাই আল্লাহর বেশী ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের অধিকারী হবে এটাই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ এখানেই আল্লাহর পথে জিহাদের মর্যাদা ও মহাত্ম নিহীত। এ কারণেই মানুষের যাবতীয় কাজের মধ্যে ঈমানের পর জিহাদকে সর্বাপেক্ষা মহৎ ও পূণ্যময় কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যায় অসত্যকে কোন অবস্থাতেই মেনে না নিয়ে তাকে নির্মূল করার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া মানবীয় মহাত্মের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী। যে ব্যক্তি অন্যদের উপর অন্যায় অবিচার বরদাস্ত করে, নৈতিক দুর্বলতার শেষ পর্যায় পর্যন্ত তাকে তার স্বীয় সত্বার উপর পরিচালিত জুলুম ও অবিচার মেনে নিতে বাধ্য করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্যায়কে নিছক অন্যায় হবার কারণে খারাপ মনে করার চারিত্রিক দৃঢ়তার অধিকারী এবং মানব জাতিকে তা থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য ক্লান্তিহীনভাবে সংগ্রাম করে সে একজন সত্যিকার অর্থে মহৎ মানুষ। তার অস্তিত্ব মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ।

...ব্যক্তিরাই সফলকাম এবং পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে তারাই। এ প্রসঙ্গে ...পাক বলেন, "পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার ন্যায়পরায়ন বান্দাগণ" (...য়া ১০৫)।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধবন্দী

যুদ্ধ বন্দীদেরকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

১. অমুসলমানদের হাতে বন্দী মুসলিম সৈন্য বা সাধারণ নাগরীক:

অমুসলিমদের হাতে বন্দী মুসলিম সেন্য ও সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মুক্তিপন প্রদান পূর্বক তাদের মুক্ত করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন, "যাকাতের অর্থ মুক্তিপন পরিশোধের বায় নির্বাহ বিধি সম্মত" (সূরা ৯ আয়াত নং ৩০)। পবিত্র হাদিসেও বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে ব্যবস্থা করা নির্দেশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, অমুসলমানদের হাতে বন্দী মুসলমানদেরকে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় অর্থ থেকে মুক্ত করা হবে। ইতিহাসে এ বহু নজীর আছে। যেমন, ৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম কনস্টানটাইনের সময় অনেক মুসলিম সৈন্যকে মুক্তিপন দিয়ে মুক্ত করা হয়েছিল। অমুসলিমদের হাতে বন্দী অথচ প্যারোলে মুক্তিপ্রাপ্ত মুসলিম সৈন্য প্যারোল মানতে বাধ্য। প্যারোলে থাকা অবস্থায় তার এমন কোন কাজ করা ঠিক হবে না যার কারণে তার ও মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষতি হতে পারে।

২. মুসলমানদের হাতে বন্দী অমুসলমান সৈন্য ও সাধারণ নাগরিক: ইসলামী আইনানুসারে যুদ্ধ বন্দী যে ধরনের হোক না কেন সবার সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ রয়েছে। অমুসলমান বন্দীরা যখন ইসলামের এই উত্তম আদর্শ বাস্তবে দেখতে পাবে তখন তারা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা না করে বরং দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে যেমনটি পূর্বে করেছে। তাই যুদ্ধ বন্দীদের সাথে সদাচরণ করার জন্য ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে কতগুলো বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামী যুদ্ধ আইনে যুদ্ধ বন্দীদের সাথে মানবিক, সহানুভতিশীল, নম্র, উদারতাপূর্ন ও সর্বোত্তম ভদ্রোচিত ব্যবহার করা হয়। যার নজীর পৃথিবীর যুদ্ধ আইনের ইতিহাসে অক্ষয় ও উজ্জল দেদীপামান। এ রকম আচরণ অন্যান্য যুদ্ধ আইনে বিরল। আধুনিক ইউরোপিয়ান সমাজ যুদ্ধ বন্দীদের সাথে তাদের পূর্বের আচরণের কিছু পরিবর্তন করেছে কিন্তু পক্ষপাতমূলক। অর্থাৎ তারা ধর্ম ও জাতি ভেদে আচরণ করে থাকে। তবে যুদ্ধ বন্দীদের সাথে মুসলমানদের আচরণ সব

[...]মানবিক ছিল এবং থাকবে। পবিত্র কোরআনে যুদ্ধ ও যুদ্ধ বন্দীদের সাথে [...] সংক্রান্ত এই নির্দেশ রয়েছে যে, "অত:পর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে [...] অবতীর্ণ হও, তখন তাদের হত্যা কর, যখন তাদেরকে পূর্ণ ভাবে পরাভূত [...], তখন তাদের বন্দী কর। অতপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর না হয় তদের [...] থেকে মুক্তিপণ লও" (মুহাম্মদ: ৪)। অপর এক স্থানে আল্লাহ্ পাক বলেন, [...] শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে না পারো নবীর পক্ষে বন্দী করা সঙ্গত নয়।" ([...] আনফাল-৬৭)।

আলোচ্য আয়াত দুটির তাফসীরে যুদ্ধ বন্দী সম্পর্কে যে সব হুকুম-[...]আহকাম জানা যায় এবং নবী করিম (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম তদানুযায়ী যে [...] আমল করেছেন এবং ফকিহ্গণ ইজতিহাদ করে যে সব আইন-কানুন [...] প্রণয়ন করেছেন তা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হল।

[...]. দয়া প্রদর্শন: যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি কোরআনের সাধারণ নির্দেশ হলো তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে হবে। এ দয়া প্রদর্শন নিম্নোক্ত চার ভাবে হতে পারে, যথা: (ক) বন্দী অবস্থায় তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, (খ) হত্যা বা যাবজ্জীবন বন্দী না রেখে তাদের দ্বারা মুসলিম নাগরিকদের সেবামূলক কাজ করিয়ে নেয়া, (গ) জিজিয়া প্রদানে বাধ্য করে যিম্মি বানিয়ে বন্দী জীবন থেকে মুক্ত করা এবং (ঘ) রক্তপণ বা মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দেয়া।

[...]. সদাচরণ: ইসলামে যুদ্ধবন্দীদের সাথে উদার, নম্র ও সর্বোত্তম পদ্ধতির মাধ্যমে আচরণ করতে হবে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সব সময় কয়েদী ও বন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন। দীর্ঘ তের বছর ধরে যারা মুহাম্মদ(সঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের নির্যাতন করে মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করেছিল তারা মক্কা বিজয়ের পর বন্দী হয়ে এলে রাসুল (সঃ) তাদের সাথে উদার ও মহানুভব আচরণ করলেন এবং সাহাবাদেরকে তারই মতো আচরন করার নির্দেশ করলেন। সাহাবাগণ তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন, যার নজীর আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জল হয়ে আছে। যেমন:

১. বদর যুদ্ধে বন্দীদেরকে রাসুল (সঃ) বিভিন্ন সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং নির্দেশ দেন যে তারা যেন এসব বন্দীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন।

২. সুহাইল ইবনে আমর নামক জনৈক কয়েদী সম্পর্কে রাসুল (সঃ) এর নিকট বলা হয় যে, সে বড় অনলবর্ষী বক্তা। সে আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছে। তার

দাঁত ভেঙ্গে দিন। নবী (সঃ) জবাবে বললেন, "যদি আমি তার দাঁত ভেঙ্গে দেই তাহলে আল্লাহ্ ও আমার দাঁত ভেঙ্গে দিবেন যদিও আমি নবী" (ইবনে হিশাম)।

৩. ইয়ামামা অঞ্চলের নেতা সুমামা ইবনে উসাল বন্দী হয়ে আসে এবং বন্দী থাকা অবস্থায় নবী (সঃ) এর নির্দেশে তার জন্য উত্তম খাদ্য ও দুধ সরবরাহ করা হতো।

সাহাবাদের যুগেও এই ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতি কার্যকর ছিল। যুদ্ধবন্দীদের সাথে কোনরূপ খারাপ ব্যবহার ও আচরণ ইসলামের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। (তাফহীমুল কোরআন:১৫ শ খন্ড)

গ. যুদ্ধ বন্দীদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা: নবী করিম(সঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের কার্যক্রম হতে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধবন্দী যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারী তত্ত্বাবধানে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার খাদ্য,বস্ত্র ও চিকিৎসার ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে। পবিত্র কোরআনে যুদ্ধবন্দীদের আহার করানোর প্রশংসা করা হয়েছে। "তারা নিঃসন্দেহে ভাল কাজ করে যারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকিন, ইয়াতিম ও বন্দীকে আহার করায়"(আদ-দাহর: ৮)।

এ সম্পর্কে রাসূল (সঃ) বলেন, "বন্দীদের পানাহারের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বন্দীকারীর উপর অর্পিত।" যেমন : বদর যুদ্ধে বন্দীদেরকে সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার পরে নবী (সঃ) তাদেরকে নিজেদের মত ভাল খাদ্য খাওয়ান ও আরামে রাখার নির্দেশ দেন । কোন কোন সাহাবা নিজে খেজুর খেয়ে বন্দীকে তরকারীসহ রুটি আহার করাতেন । কয়েকজন বন্দীর কাপড় ছিল না, রাসূল (সঃ) নিজে তাদের কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেন ।

ঘ. রক্তপন বা বিনা রক্তপণে মুক্তি দেয়া: শরীয়াহ্ ব্যবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের চিরজীবন বন্দী করে রাখার বিধান নাই। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসক যুদ্ধবন্দীদের যুদ্ধপূর্ববর্তী ও যুদ্ধপরবর্তী কার্যক্রম ও আচার-আচরণ বিশ্লেষন করে যুদ্ধবন্দীদের রক্তপণ নিয়ে মুক্তি দিতে পারেন অথবা পরিস্থিতি বিবেচনায় বিনা রক্তপণে ছেড়ে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে কোরআনের নির্দেশ হলো - "যুদ্ধবন্দীদের প্রতি হয় অনুকম্পা দেখিয়ে তাদেরকে বিনা রক্তপণে মুক্তি দাও অথবা রক্তপণ নিয়ে মুক্তি দাও"(মুহাম্মদ:৪)।

উদাহরণ: রাসূল(সঃ) এ আয়াতের আলোকে সাধারণত বন্দীদেরকে রক্তপণ না নিয়ে ছেড়ে দিতেন। জাবালে তানয়ীম নামক স্থানে ৮০ জনের একটি শত্রু বাহিনী মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা করে কিন্তু দূর্ভাগ্য যে তারা সকলে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয় এবং তাদেরকে রাসুলের কাছে উপস্থিত করা হয়। রাসুল(সঃ) তাদের সকলকে ফিদিয়া বা রক্তপণ ছাড়াই মুক্তি দেন । এ ছাড়াও হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াজেন গোত্রের প্রায় ছয় হাজার বন্দীকে রাসূল(সঃ) বিনা রক্তপণে মুক্তি দেন এবং তারা রাসুলের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষনাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

রক্তপণ নিয়ে বন্দীদের মুক্তি করা নজীর ইসলামের ইতিহাসে রয়েছে । যেমন রাসূল(সঃ) বদর ও উহুদ যুদ্ধের বন্দীদের রক্তপণ নিয়ে মুক্তি দেন ।

ঙ. বন্দীদের হত্যা না করা: যুদ্ধবন্দীদের কোন কারণ ছাড়া হত্যা করা যাবে না । মক্কা বিজয়ের পর রাসুল (সঃ) মুসলিম বাহিনীকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, বন্দীদের হত্যা করা যাবে না এবং যে ব্যক্তি ঘরের দরজা বন্ধ করে ভিতরে বসে আছে তাকে কিছু বলা যাবে না। (ফতহুল বুলদান)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর , হাসান বসরী, আতা ও হাম্মাদ ইবনে সুলাইমান আইনের এই সাধারণ মতটি গ্রহণ করেন যে, যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা যাবে না । তারা বলেন কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই মানুষ হত্যা করা যেতে পারে । যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বন্দীদের কোন ভাবে হত্যা করা যাবে না। তবে শান্তি-শৃংখলার জন্য চরম সন্ত্রাসী ও অপরাধীকে হত্যা করা যাবে । কারণ তাদেরকে বিনা বিচারে বা উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিলে আবার সন্ত্রাসী ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। তাই সমাজকে শান্তি-শৃংখলার মধ্যে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এ ধরণের ব্যবস্থা নিতে পারে। বদর যুদ্ধের ৭০ জন বন্দী থেকে উকবা ইবনে আবু মুয়াইত ও নজর ইবনে হারেস ব্যতীত সকলকে মুক্তি দিয়েছেন। এ ছাড়াও মক্কা বিজয়ের পর রাসুল (সঃ) কয়েকজন ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন । এসব ব্যতিক্রম ধর্মী ঘটনাবলী ছাড়া যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। খোলাফায়ে রাশেদার কর্মপদ্ধতি অনুরূপ ছিল । হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের সময় কেবলমাত্র একজন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হয়েছিল ।

চ. কাজের বিনিময় বন্দী মুক্তি: যুদ্ধ বন্দীদেরকে চিরকাল বন্দী করে রাখার বিধান ইসলামে নেই। বন্দীদের মুক্তি দেয়ার অন্য কোন সুযোগ না থাকলে কাজের বিনিময়ে তারা মুক্তি পেতে পারে। যেমন- বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্য হতে যারা

রক্তপণ প্রদানে সমর্থ ছিল না তাদের মুক্তি দেয়ার জন্য রাসূল (সঃ) শর্ত আরোপ করেন যে, তারা আনসারদের প্রতিজনে ১০ (দশ) জন শিশুকে লেখাপড়া শিক্ষা দিবে এবং এর বিনিময়ে তারা মুক্তি পাবে।

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, ইসলামে যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি যে উদার, মানবিক ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা হয় তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন যুদ্ধ আইনে বিরল।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন ও প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনে বর্ণিত যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কিত সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য:

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণবিধি ও ১৯৪৯ সালে জেনেভা সম্মেলনে গৃহীত যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত আচরণবিধির মাঝে নিম্নরূপ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়:

১. মানবিক আচরণের ক্ষেত্রে: ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি অত্যন্ত মানবিক ও সদাচারণ করার যেমন নির্দেশ রয়েছে, তেমনি প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণ সংক্রান্ত চুক্তির ১২ নং অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক সবসময় যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদয় ও মানবিক আচরণ করার কথা বলা হয়েছে।

২. বাসস্থান, খাদ্য ও পোষাকের ক্ষেত্রে: উভয় আইনে যুদ্ধবন্দীদেরকে উত্তম খাদ্য, উপযুক্ত বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় পোষাক সরবরাহ করার বিধান রয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের আচরণ সংক্রান্ত চুক্তির ২৫-২৮ নং অনুচ্ছেদে এ বিধান উল্লেখ করা হয়।

৩. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য: উভয় আইনে বন্দীদের স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখার এবং সুচিকিৎসা প্রদানের বিধান রয়েছে। প্রচলিত আইনের যুদ্ধবন্দীদের আচরণ সংক্রান্ত চুক্তির ২৯নং অনুচ্ছেদে এ বিধান উল্লেখ করা হয়।

৪. যুদ্ধবন্দীদের প্রতিনিধিত্ব: উভয় আইনে যুদ্ধবন্দীদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শত্রুরাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠানের সুযোগ রয়েছে। প্রচলিত আইনের যুদ্ধবন্দীদের আচরণ সংক্রান্ত চুক্তির ৭৯নং অনুচ্ছেদে এ বিধান উল্লেখ করা হয়।

৫. ব্যক্তিগত ব্যবহার্য বস্তুর ক্ষেত্রে: উভয় আইনে যুদ্ধবন্দীদের সামরিক সরঞ্জাম ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য বস্তু সমূহ নিজ দখলে রাখার অনুমতি রয়েছে। জেনেভা চুক্তির ১৭নং অনুচ্ছেদে একথাটি উল্লেখ রয়েছে।

বৈশাদৃশ্য: যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি আচরণ সংক্রান্ত আইন বিষয়ে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন ও সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে উপরোক্ত সাদৃশ্যতা থাকলেও কিছু বৈশাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন: যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা কোরআনের সাধারণ নির্দেশ, যা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে একটি অপরিহার্য আদেশসূচক বিধান। এ দয়া প্রদর্শন বিভিন্নভাবে হতে পারে যেমন, ভাল ব্যবহার করা বা হত্যা বা যাবজ্জীবন বন্দী না রেখে জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করা অথবা বিনা রক্তপণে মুক্তি দেয়া।

কিন্তু সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে এরূপ আদেশমূলক কোন বিধি নেই, সচেতনতার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এবং এরই কারণে বর্তমানে আমেরিকার হাতে আফগানি যুদ্ধবন্দীরা প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপে চরম নির্যাতিত হচ্ছে। সেখানে মানবতার লেশ মাত্র দেখানো হচ্ছে না। এমনকি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে সেখানে প্রবেশের ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করছে। অপর দিকে, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধবন্দীদেরকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে কিন্তু সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত চুক্তি ১৯৪৯ এ ৪৯ ও ৫০ অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক আটককারী রাষ্ট্র বা পক্ষ যুদ্ধবন্দীদের বয়স, পুরুষ বা নারী, দৈহিক বা মানসিক স্বাস্থ্য বিবেচনা করে শ্রমে নিয়োগ করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের তুলনায় ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন অনেক বেশী উদার ও মানবিক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গৃহযুদ্ধ ও বিদ্রোহ

মুসলিম আইন, ইসলামের ঐক্য সংহতির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সে জন্য কোনো বিস্ময়ের বিষয় নয় যে, ইসলামী আইনে এরূপ যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধান দৃষ্টিগোচর হয় না। সমগ্র কোরআন মজীদে এই বিষয় সম্বন্ধে মাত্র একটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ বলেন, "এবং যদি বিশ্বাসীদের (ঈমানদারগণ) দুই দল পারস্পররিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তা হলে তাদের ভিতর সন্ধি স্থাপন কর এবং এক পক্ষ যদি অপর পক্ষের প্রতি অন্যায় আচরণ করে: সেক্ষেত্রে অন্যায়কারীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত তারা আল্লাহর বিধান না মানে: আর যদি প্রত্যাবর্তন করে (আল্লাহর বিধানের দিকে) তবে তাদের ভিতরে ইনসাফের সংগে সন্ধি করে দাও এবং সুবিচারের সংগে কাজ কর। শ্রবণ করো,আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন" (হুজুরাত-৯)। এবং এই একমাত্র নির্দেশের পরেই বলা হয়েছে: "ঈমানদারগণ ভাই ভাই ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং ভাইদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করো এবং আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য পালন করো যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে করুণা লাভ করতে পারো"(হুজুরাত-১০)।

মহানবী (সঃ) হাদীসেও সাধারণভাবে কিছু কথা আছে। বিদ্রোহ সংক্রান্ত মুসলিম আইন যা মুসলিম আইন সংকলনের মধ্যে পাওয়া যায়, তা মোটামুটিভাবে খলিফা আলীর আচার-আচরণের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে, যদিও ইহা অনস্বীকার্য যে, মহানবীর (সঃ) ধর্মপরায়ণ জামাতার ন্যায় আর কোনো পরবর্তী মুসলিম খলিফা আদর্শবাদের সুমহান উচ্চতায় আরোহণ করতে পারেন নাই।

ক. বিভিন্ন প্রকার প্রতিরোধ বা বিরোধিতা:

প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি প্রতিরোধ বা বিরোধিতার প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে নিম্ন লিখিত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

১. ধর্মীয় আন্দোলনে প্রতিবাদ;
২. রাজনৈতিক বা পার্থিব কারণে;
৩. অন্তর্দ্বন্দ্ব;

৪. বিদ্রোহ;
৫. মুক্তিযুদ্ধ;
৬. অভ্যুত্থান এবং
৭. গৃহযুদ্ধ।

১. ধর্মীয় কারণে প্রতিবাদ :

যতদূর জানা যায়, মুসলিম ইতিহাসে ধর্মীয় ব্যাপারে মাত্র একটি গোলযোগ সৃষ্টিকারী বা প্রতিবাদকারী দল ছিল, যারা কিছুকালের জন্য সরকারী বাহিনীর প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল। এরা ছিল খারিজী সম্প্রদায়; যারা অরাজকতায় বিশ্বাসী ছিল এবং সমগ্র মুসলিম কওমকে ধর্মবিরোধিতা, এমন কি কুফর বা অবিশ্বাসের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। যদি তারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের বা প্রতিবাদের চেষ্টা না করে, তাহলে অন্যান্য শিথিল ঈমানের অধিকারী সম্প্রদায়গুলির মতো কমবেশী তাদেরকে সহ্য করা হবে। যদি তারা নিস্ক্রিয় না থাকে এবং সরকারকে উৎখাত করে অন্য সরকার স্থাপনের প্রয়াস পায়, তাহলে তাদের সংগে ঠিক রাজনৈতিক বিদ্রোহীদের মতোই ব্যবহার করা হবে। রাজনৈতিক বিদ্রোহীগণের অপেক্ষা ধর্মীয় বিদ্রোহীগণের সংগে ভিন্নতর কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না।

২. রাজনৈতিক ও জাগতিক কারণে সরকারের বিরোধিতা:

ক. যদি ইহা কোন সরকারী কর্মচারীর কোনো কাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং কোনো বিপ্লবের উদ্দেশ্য এতে না থাকে, তাহলে একে বিক্ষোভ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এর শাস্তি দেশীয় আইন মোতাবেক হবে। আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় তা পড়বে না।

খ. যদি অযথা বা অসংগত কোন কারণে আইন-সম্মত প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে এই প্রচেষ্টাকে অভ্যূত্থান বলা যেতে পারে।

গ. যদি তা কোন বেআইনী সরকারকে কিংবা কোন সরকার যে তার অত্যাচারের দরুন বেআইনী হয়ে পড়েছে, তার বিরুদ্ধে অভ্যূত্থান ঘটলে তাকে মুক্তিযুদ্ধ বলা যেতে পারে, সরকার মুসলিম বা অমুসলিম যাই হোক না কেন।

ঘ. যদি বিদ্রোহীরা এতোই শক্তিশালী হয় যে, তারা কিছু এলাকা দখল করে ফেলে এবং সরকারের পরোয়া না করে তার উপর প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করে, সে

ক্ষেত্রে তাকে বিদ্রোহ বলা হয়। হযরতের (সঃ) ওফাতের পর কিছু গোত্রের তরফ থেকে সরকারী কর বা রাজস্ব দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকে বিদ্রোহ বলে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং খলিফা আবু বকর বলপূর্বক তাদেরকে বশীভূত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই লোকগুলি ইসলাম বর্জন করে নাই, তারা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ও যাকাত দিতে নিজেদেরকে বাধ্য বলে মনে করে নাই।

ঙ. যদি বিদ্রোহ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, পূর্বের সরকারের সমান শক্তি অর্জন করে ফেলে এবং শত্রুতা চলতে থাকে, তাহলে তা গৃহযুদ্ধ নামে আখ্যায়িত হবে। জনৈক বিদ্রোহী যদি শক্তি ও সাফল্য অর্জন করে অথবা রাষ্ট্রের কর্ণধার বা প্রধানের মৃত্যুতে কিংবা ক্ষমতা চ্যুতির পর দুইজনে ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করে এবং জনগণের আনুগত্য উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তথাপি উভয় পক্ষের ভিতর কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করা হয় না। হযরত আলী ও মুআবিয়া (রাঃ) এর মধ্যে যুদ্ধকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা যেতে পারে। নীতির দিক থেকে মুয়াবিয়া আলীর(রঃ) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই, বরং তিনি আলী (রাঃ) এর আনুগত্য স্বীকার করেন নাই, বরং তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের হত্যা বা শাহাদাতের কাল থেকে মুয়াবিয়া আলী (রঃ) এর বিরোধিতা করে আসছিলেন।

৩. বিদ্রোহীদের প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি:

মাওয়াদির মতে মুসলিম আইন অনুসারে বিদ্রোহীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যুদ্ধকালে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে। সাধারণতঃ ইহা সত্য, কিন্তু ইহা কড়াকড়িভাবে ধর্তব্য নয়। কারণ সারাখ্সীর মতে ইহা স্পষ্ট যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে যখন বিদ্রোহ পরিপূর্ণভাবে দমিত না হয়, বিদ্রোহী বন্দিগণকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য যখন বিদ্রোহী স্বীয় উদ্দেশ্যে অটল থাকে এবং অনুশোচনা করে না, তখন উক্ত আইন প্রযোজ্য হবে।

বিদ্রোহীদিগণকে তাদের হঠকারিতার ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হবে এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে যেন নিজে দোষমুক্ত হওয়া চাই। মাওয়ার্দির মতে মুসলমানদের রক্তপাত হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিনা বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদে রাত্রিকালে অতর্কিত আক্রমণ না করা উচিত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অমুসলমান প্রতিপক্ষের মতোই বিদ্রোহীদেরকে বিবেচনা করা হয়। এমন কি যে কোনোভাবে জনৈক অনুগত প্রজা যদি বিদ্রোহীদের শামিল হয়ে পড়ে এবং মুসলিম

বিদ্রোহ সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়ে যায়, তবু তাদেরকে দায়ী করা যাবে না।

বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধের লক্ষ্য হল তাদেরকে শান্তি-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করতে না দেওয়া। প্রয়োজন না হলে তাদেরকে হত্যা ও নির্যতন করা যাবে না। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে ও হত্যা করা যাবে যখন তাদের আশ্রয় নেওয়ার মতো ঘাঁটি থাকবে এবং তারা পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে।

ধর্মত্যাগীকে আশ্রয় দেওয়া যায় না, কিন্তু বিদ্রোহীকে দেওয়া যায়।

যদি কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজা বন্দী, ব্যবসায়ী বা যে কেউই হোক বিদ্রোহী এলাকায় কোন অপরাধ বা পাপ করে সে ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রের আদালতে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না, এমন কি যে এলাকায় অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় সে এলাকায় মুসলিম রাষ্ট্রের করায়ত্ত বা বশীকৃত হলেও। কারণ অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় ঐ এলাকা আইনসম্মত রাষ্ট্রীয় আদালতের শক্তি বা আওতাভুক্ত এলাকার বাইরে ছিল। বিদ্রোহী রাষ্ট্রের বিচারালয়ের রায় ন্যায্য ও আইনত গ্রাহ্য জ্ঞান করা হবে এবং যদি সেই দেশ [ব]শ্যতা স্বীকার করে এবং যদি প্রমাণিত হয় যে কোন রায় মুসলিম আইনের বিরোধী হয়েছে এবং কোন ফকিহ্ বা আলেমের সমর্থন লাভ করে নাই তাহলে পূর্বোক্ত মত গ্রহণ যোগ্য হবে না।

গ. বিদ্রোহীদের যুদ্ধ সংক্রান্ত অধিকারসমূহ :

মুসলিম আইন বিদ্রোহীগণকে পরিপূর্ণভাবে যুদ্ধ সংক্রান্ত অধিকারসমূহ দান করে থাকে। আমরা কিছু পুর্বে দেখেছি যে, তাদের আদালতের রায় পেশ করার পর সাধারণত নাকচ হয় না। অনুরূপভাবে যদি তারা রাজস্ব বা অন্যান্য কর আদায় করে, লোকেরা তাদের বাধাবাধকতা থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং সেই দেশের পুনর্বিজয়ের পর মুসলিম রাষ্ট্র পুনর্বার সেই রাজস্ব আদায় করবে না। অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যবসায়ী বিদ্রোহী এলাকায় প্রবেশ করে এবং বাণিজ্য শুল্ক প্রদান করে তাকে পুনরায় অনুগত বা বাধ্য মুসলিম এলাকার সীমান্তে একই শুল্ক দিতে হবে, যেন বিদ্রোহী বিদেশী রাষ্ট্রভুক্ত। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে তারা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে একথা পুর্বে বলা হয়েছে এবং তার ফলাফলও বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু বিদ্রোহী অঞ্চলে অন্যায় করার জন্য অন্যায়কারীকে অনুগত বা আইনসঙ্গত রাষ্ট্রের আদালতে বিচার করা যাবে না।

সংঘর্ষকালে পারস্পরিক জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না এবং এমন কি অপরাধিগণকে শনাক্ত করা হলেও কোনো প্রতিশোধ বা ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে না। এই নিষ্কৃতি বা রেহাই তারা পায় এই কারণে যে, তারা বাস্তব একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিল; অন্যথায় যদি একদল দস্যু কোন শহর হামলা করে লুণ্ঠন করে, তবে তাদের অপরাধ বিনা বিচারে ক্ষমা করা হয় না, অর্থাৎ বিচারে দন্ডনীয় হয়ে থাকে। যদিও কোন কোন আইনবিদের বিরুদ্ধ মতবাদের কথা আবু ইউসুফ উল্লেখ করেছেন, তথাপি তিনি নিশ্চিত যে কেবল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম যা বিদ্রোহীদের কাজ থেকে পাওয়া যায় তাকেই গনিমত হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং বিদ্রোহীগণের আত্মীয়-স্বজনের নিকট তা ফেরত দেওয়া চলবে না। খলিফা আলীর অভ্যাস অনুযায়ী অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী তাদের আইনসম্মত মালিক বা উত্তরাধিকারীগণের নিকট ফেরত দেওয়া বিধেয়।

যাহোক, বশীভূত বিদ্রোহীগণকে মুসলিম আইন অনুগত মুসলিম প্রজাগণের নিকট থেকে অর্জিত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ প্রত্যার্পণ করবার বিধান দান করেছে।

ঘ. বিদ্রোহীদের বিশেষ সুবিধাসমূহ:

যদি কোনো কারণে মুসলিম রাষ্ট্র তাদের সঙ্গে সন্ধি বা আপোস করতে চায় তবে অমুসলিম রাষ্ট্রের ন্যায় বিদ্রোহীদের নিকট থেকে কোনো কর আদায় করা যাবে না, এবং যদি কোনো কিছু লওয়া হয়, ইহা জানতে হবে যে, তা বিদ্রোহীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, না রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ছিল, যা তাদের করায়ত্ত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হলে মুসলিম রাষ্ট্র বিধিমতো রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে পারে; কিন্তু বিদ্রোহীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলে মুসলিম রাষ্ট্র তার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং দ্রুত বা বিলম্বে আইনসম্মত মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করবে। আত্মরক্ষা ব্যতীত অনাবশ্যকভাবে মারাত্মক অস্ত্রসমূহ বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করাই উচিত।

বিদ্রোহী বাহিনী সম্বন্ধে হযরত আলী (রাঃ) যা বলেন, 'যখন তোমরা তাদেরকে পরাজিত করবে, তাদের মধ্যে আহতদের হত্যা কর না, বন্দীদের শিরচ্ছেদ কর না, যারা দলত্যাগ করেও ফিরে আসে তাদের পশ্চাদ্ধাবন কর না, তাদের স্ত্রীলোকদের দাসীতে পরিণত করো না, তাদের মৃতগণের অঙ্গচ্ছেদ ক না, যা আবৃত্ত রাখা দরকার তা অনাবৃত কর না। শিবিরে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র, প্রাণী

...ব্যতীত তাদের অন্যান্য সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করো না। অন্যান্য সব ...র বিধান অনুসারে তাদের উত্তরাধিকারিগণ লাভ করবে'।

...জনৈক সেনাপতি খলিফা আলীর (রাঃ) এর নিকট এক পত্রে ...লিখলেন, 'আল্লাহর বান্দা আলী আমিরুল-মোমেনীনদের নিকটে মা'সুফিল বিন ...থেকে সালাম ও আল্লাহ্ পাকের সানা ও সিফাত বাদ। মুশরিকগণ যারা ...র বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিল তাদের মোকাবেলা ...করলাম। আমালেকীদের মতো তাদেরকে হত্যা করলাম। তথাপি আপনার ...দের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই : আমরা পশ্চাদাসারণকারী বিদ্রোহীগণকে কিংবা ...দীগণকে হত্যা করি নাই, অথবা আহতগণকেও হত্যা করি নাই। আল্লাহ ...গণকেও মুসলমানকে বিজয় দান করেছেন। সমগ্র বিশ্বচরাচরের প্রভু আল্লাহর ...প্রশংসা করি।

পরাজিত বাহিনীর মৃতদের সমাহিত করা উচিত। তাদের বন্দীদের ...সাধারণত: শিরচ্ছেদ করা উচিত নয় এবং যদি তারা ভবিষ্যতে অনুগত ও ...আইনমান্যকারী প্রজাগণের মতো ব্যবহার করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে ...তাদেরকে তৎক্ষণাৎ আযাদও করা যেতে পারে। সেই বন্দীদের বিনিময়ে ...মুক্তিপণও চাওয়া চলবে না। বিদ্রোহী বন্দীগণকে, মুসলিম বা অমুসলিম, কখনও ...দাসে পরিণত করা চলবে না। আলীর সেনাবাহিনী তাদের নিকট ধৃত বন্দীগণকে ...দাসে পরিণত করার দাবী জানাল এবং আলী (রাঃ) দৃঢ়ভাবে তাদেরকে স্মরণ ...করিয়ে দিলেন, বেশ, তাহলে নবীর (সঃ) স্ত্রী এবং মুসলমানদের জননীকে কে ...নেবে?" তিনি আলীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তৎকালে ...হয়রাধীন ছিলেন। তাদের শিবিরের ভৃত্যগণ ও অনুসারীগণকে যুদ্ধে হত্যা করা ...যেতে পারে যদি তারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকে। যেমন ধর্মের দিক ...থেকে অমুসলমানের হাতে মুসলমানের মৃত্যু নিষিদ্ধ, তেমনই মুসলিম ...বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে অমুসলিমদের তালিকাভুক্ত করা সমর্থনযোগ্য ...নয়। আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে একজন বিদ্রোহী স্ত্রীলোককে হত্যা করা যেতে পারে। ...অর্থাৎ যদি স্ত্রী লোকেরা যুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে।

এছাড়াও অন্যান্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : বিদ্রোহীগণ যদি মুসলিম রাষ্ট্রের ...শত্রু কোনো দেশকে আক্রমণ করে এবং গনিমত লাভ করে এবং পরে সেই দেশকে যদি বিদ্রোহীদের কবল থেকে অনুগত সেনাবাহিনী উদ্ধার করে, তাহলে

সেই দেশ প্রাক্তন অধিকারীর নিকট অবশ্যই প্রত্যর্পণ করা হবে। বিদ্রোহী এলাকায় মুসলিম রাষ্ট্রের অনুগত প্রজাগণ বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে অমুসলিম বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ করতে পারে। যদি বিদ্রোহীগণ উভয়ের শত্রুর বিরুদ্ধে অনুগত সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে, তাহলে তারা সকলেই গণিমতের মালের অংশ পাবে। যদিও মুসলিম বাহিনীর অন্তর্গত অমুসলিম সৈনারা মুসলিম সৈনাদের সঙ্গে গণিমতের অংশ সাধারণত পায় না, বরং তাদেরকে তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী কিছু পুরস্কার দেওয়া হয়, তবু শায়বানী কোনো এক স্থানে মন্তব্য করেছেন যে যদি অমুসলিম বাহিনীর সংখ্যা অধিক হওয়ার দরুন তারা স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে অথবা মুসলিম বাহিনী যদি তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে তেমন শক্তিশালী না হয়ে থাকে, তাহলে তারা সকলেই গণিমতের অংশ পাবে। যদি পরস্পারের মধ্যে জামিনের আদান-প্রদান হয় এবং বিদ্রোহীরা অনুগত যামিনে রাখা ব্যক্তিদের হত্যা করে বসে তবে বিদ্রোহীদের পক্ষে জামিনে রাখা ব্যক্তিগণকে শাস্তি দেওয়া চলবে না যদিও সেরূপ মর্মে চুক্তি হয়ে থাকে, কারণ দোষ ব্যক্তিগতভাবে তাদের নয়, দোষ তাদের সরকারের। বিদ্রোহীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি গণিমত হিসাবে গণ্য হবে না, তবে তা সুবিধার্থে বিক্রয় করা যেতে পারে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ যুদ্ধ বা শত্রুতা অবসানের পর প্রকৃত অধিকারীগণকে ফেরত দেওয়া হবে।

ছ. অমুসলিম বিদ্রোহীগণ:

এতক্ষণ মুসলমান বিদ্রোহীদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল। এখন অমুসলিম বিদ্রোহী প্রজাদের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যেতে পারে। কেবল অমুসলিম প্রজাদের বিদ্রোহ, বিদ্রোহ হিসাবে গণ্য হতে পারে যদি তাদের এলাকা মুসলিম রাষ্ট্র দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত থাকে। কোন অমুসলিম এলাকার সম্মুখীন প্রদেশের অমুসলিম বিদ্রোহীগণকে মুসলমান আইনবিদগণ সাধারণ অমুসলিম যুদ্ধরত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কারণ হল, মুসলমান আইনবিদগণের দৃষ্টিতে অমুসলমানরা সকলেই এক শ্রেণীভূক্ত, যদিও রাজনৈতিক কারণে তারা এক বা একাধিক দলভূক্ত হয়ে থাকে। সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহীগণের ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় যে পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকতে পারে।

এ রূপ ক্ষেত্রে সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও অমুসলিম প্রজাগণ সাধারণ বিদ্রোহীদের মতো সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে, যদি তারা বিদ্রোহীর নেতা না হয়ে স্থানীয় মুসলিম বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শত্রু সম্পত্তি

সম্পত্তি স্থাবর ও অস্থাবর হতে পারে। ইহা ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হতে পারে। এমন কি যদিও এতে কারো মালিকানা না থাকে, তবে ইহা কোন রাষ্ট্রের এলাকাধীন হলে সেই রাষ্ট্রেরই সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে কোনো রাষ্ট্রের এলাকাভূক্ত সমস্ত জমি, তা নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হোক বা সরকারের অধীনস্থ হোক, সবই সরকারী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে। কারণ কোন রাষ্ট্রের ভিতর কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর বিদেশী বা বহিরাগত হামলা রাষ্ট্রের অবমাননার নামান্তর, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির উপর হামলা বলে গণ্য হবে। এ কথা একটি ভাবের বা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা হল এই যে, গোটা পৃথিবী এবং তার ভিতর যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সম্পত্তি এবং তিনি যাকে খুশী দান করেন। এবং কোনো দেশের শাসক পৃথিবীর ঐ অঞ্চলে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। অতএব আইনের বিধান হল এই যে, মুসলিম এলাকার সমগ্র অংশ মুসলমান শাসকের কর্তৃত্বাধীন। মহানবীর এক হাদীসে আছে, "আদি জমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পত্তি।" এবং তৎপর তোমার. সুতরাং যে কেউ পতিত উপনিবেশ স্থাপন করে, ইহা তারই হবে। তথাপি তিন বছর পর একে কেউই বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে পারবে না (যদি একে সে উন্নত না করে থাকে)।"

এই প্রসঙ্গ পুনরুত্থান করলে বলতে হয় , যা কিছু মুসলমান বা বিদেশী মিত্র কারও মালিকানাধীন না থাকে, তা শাসকের এখতিয়ারে চলে যাবে। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারবেন।

ইহা লক্ষণীয় যে, কোনো রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পত্তি কখন স্বীয় এলাকাভূক্ত থাকে না এবং বেশ কিছু সম্পত্তি অন্য দেশে থাকতে পারে। দূতাবাসের সম্পত্তি, বিদেশী নাগরিকগণ যারা, সাময়িকভাবে বাস করে কিংবা ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাস করে তাদের সম্পত্তি, এবং ঋণ ও ওয়াক্ফ ইত্যাদি ইহার (আলোচ্য বিষয়ের) দৃষ্টান্ত। মুসলিম আইনে শত্রুদের সম্পত্তি সম্পর্কে সাধারণ নীতি এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ

নীতি হল, যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত করা যেতে পারে তা গণিমত হিসাবে গণ্য পারে, অন্য কিছু হবে না। কারণ দখলে আসার ফলে যে অধিকার সৃষ্টি তা অন্যান্য উপায়ে অর্জিত অধিকারের ন্যায়, যা মালিকানায় রদবদল। এ রূপে যা-ই অন্যান্য পদ্ধতিতে অধিকার করা যায় তা দখল বলেও করা। পূর্ব বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তি নিম্নবর্ণিত নানা উপায়ে ব্যবহৃত হতো ।

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি:

ইহা স্থাবর ও অস্থাবর দুই-ই হতে পারে এবং হয় বায়তুল-মালের কর্তৃত্বাধীনে নয় রাজ-পরিবারের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। ইহার বিশেষ গুরুত্বের কারণে শত্রু রাষ্ট্রের ভূ-খন্ড বা এলাকা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা হ'ল ঃ

ক. ভূ-খন্ড বা এলাকা: কোনো ভূ-খন্ডের জয় ও অধিকার দ্বারা, তার সার্বভৌমত্ব এবং সেই সঙ্গে রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব ও প্রজাগণের আনুগত্যসহ সব কিছু বিজয়ীর উপর বর্তায়। অধিকার বা দখল, স্থায়ী বা কূটনৈতিক এবং সাময়িক যাই হোক না কেন, অধিকারকে কর আদায় করার, শাসন করার এবং সেই বিজিত দেশ বা অঞ্চলকে তার রাজ্যভূক্ত অংশ বলে গণ্য করার অধিকার দান করে।

ইসলামের ইতিহাসে গোড়ার দিকে বিজিত এলাকার দায়িত্ব নিয়ে বহু আলোচনা ও বিতর্ক হয়ে গেছে। মহানবীর দৃষ্টান্ত খুঁজলে দেখা যায়, বিষয়টি সম্পর্কে তেমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। কারণ তিনি কখনও কখনও গণিমত হিসাবে বিজয়ী বাহিনীকে বিজিত এলাকা বন্টন করে দেন এবং অন্য সময় বিজিতদের স্বাধীনতার উপরই শুধু ছেড়ে দেন নাই, বরং তা স্পর্শও করতেন না। খলিফা উমারের সময়ে এই বিতর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা লিপিবদ্ধ করার পূর্বে বিষয়টির সূক্ষ্ম পরীক্ষা আবশ্যক।

যতোদুর সম্ভব জানা যায় যে, মহানবী কর্তৃক প্রেরিত বাহিনীর ভিতর বিজয়ী ভূমির বন্টন কেবল বনু নাজির ও বনু কায়নুকা গোত্রের বেলায় ঘটেছিল। মদিনার এই উভয় গোত্রেই মহানবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অবরোধের পর আত্মসমর্পণ করেছিল। কোরআনে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি ব্যক্তিগত আইন প্রয়োগের নির্দেশ আছে।

যখন তোমরা কোনো নগরীর কাছাকাছি যাবে যুদ্ধের জন্য, তখন তাদের নিকট শান্তির প্রস্তাব করবে এবং যদি তারা শান্তির প্রস্তাবে সাড়া দেয় এবং তাদের

নগর-দ্বার খুলে দেয়, তাহলে এমনও হতে পারে যে, তারা তোমাদের অধীনতা স্বীকার করবে এবং তোমাদের সেবা করবে। কিন্তু যদি তারা শান্তি কামনা না করে এবং যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে সেই নগর তোমরা অবরোধ করবে। এবং যখন তোমাদের প্রভু আল্লাহ্ তোমাদের হাতে ইহা সমর্পণ করবেন তখন তথাকার প্রত্যেকটি পুরুষকে তোমরা হত্যা করবে। 'কিন্তু স্ত্রীলোকগণকে, শিশু ও প্রাণীদিগকে এবং সমস্ত ধন-সম্পত্তিকে তোমরা গ্রহণ করবে: আর তোমরা তোমাদের শত্রুদের গণিমত ভক্ষণ করবে যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন।

বনু নাযিরের বেলায় মহানবী তাদেরকে নির্বাসিত করে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং প্রত্যেকটি মানুষকে এক উটের বোঝা ধন-দৌলত সঙ্গে নেয়ার অনুমতি দান করেন। বনু কুরায়যার বেলায় তাদেরই পছন্দ মতো সালিসের শর্তানুসারে, যা ছিল 'deutronomy' র মতের অনুকূলে ছিল, এবং শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। সালিসের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে মহানবী কেবল এই মন্তব্য করলেন যে, সপ্ত নভোমণ্ডলের উপর থেকে ইহা আল্লাহ্ই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। যদি ইহুদীরা মহানবীর নিকট দয়া ভিক্ষা চাইত, তাহলে তারা আরও লঘু দন্ড পেতে পারত, কিন্তু তারা তাদের প্রাক্তন মিত্র এক সাধারণ মুসলমানকে পছন্দ করল: এবং ইহুদীদের উপর তখন মুসলমানদের ক্রোধের কারণ ছিল: তারা বনু নাজির ইহুদীদের সাথে কোমল ব্যবহার করেছিল, অথচ তারা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে খন্দকের অবরোধের ব্যবস্থা করেছিল এবং ঠিক অবরোধের পূর্বে ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মদিনা হতে দুই সপ্তাহের পথ দুমাতুল জান্দালে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মহানবী (সঃ) ষড়যন্ত্রের জাল থেকে রক্ষা পেয়ে অবরোধকারীগণের কবল থেকে আত্মরক্ষা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবার জন্য মদিনা প্রত্যাবর্তন করেন, এবং খন্দকের তীব্র অবরোধের সময় মদিনার বনু কুরায়যা গোত্রের এই ইহুদীরা মুসলমানদের পশ্চাতে আঘাত হানতে প্রয়াস পেয়েছিল। এমনকি ওয়েনসিঙ্ক (Wensinck) যিনি মহানবীর প্রতি মোটামুটি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, তিনিও স্বীকার করেছেন। পূর্বে বনু নাযির গোত্রের প্রতি যে কোমল ব্যবহার করা হয়েছিল তার ফল হয়েছিল অপ্রত্যাশিত এবং কোনো রাজনীতিবিদই পুনর্বার কোমল ব্যবহার করার মতো ভুল করতে পারত না।

খয়বরের ইহুদীরাও নির্বাসিত হয়েছিল যখন তারা যুদ্ধ করে অবশেষে আত্মসমর্পণ করেছিল: কিন্তু পরে মহানবী তাদেরকে রাখতে সম্মত হয়েছিলেন

...র সম্পত্তি ...এবং পুনর্বার আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ইজারা হিসাবে কাজ করতে ...নির্দেশ দেন। এই আদেশগুলি খলিফা উমরের পূর্বে দেওয়া হয়। উমর মহানবীর ...মৃত্যুকালীন ইচ্ছানুযায়ী আরব থেকে মেসোপটেমিয়ায় অন্যান্য সন্দেহভাজন ...ব্যক্তিদের সঙ্গে নির্বাসিত করেন।

যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণের বেলায় যারা ইহুদী নয় তাদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ...সরকারী দলিল কৌতুহলজনক: আল্লাহ্ রাহ্মানুর রহীমের নামে। ইহা আল্লাহ্র ...রসূল হযরত মুহম্মদের নির্দেশ-ইসলাম কবুল করার সময় উকায়েদীরের জন্য ...এবং আল্লাহ্র তরবারী, সেনাপতি খালিদ ইবনে ওলিদের সম্মুখে মিথ্যা দেব-দেবী ...ও পুতুলগুলো বর্জন কর এবং দুমাতুল জান্দাল ও তার চারিদিকের সম্পত্তি ...তোমাদের জন্য যার পানি-সম্পদ নাই এবং যার আবেষ্টনী নাই, কর্ষণ অযোগ্য ও ...অবহেলিত। এবং তোমাদের জন্য প্রাচীরবেষ্টিত তালগাছের বাগান-এ কর্ষিত ...জমির পানি বরাদ্দ থাকবে। তোমাদের পশু-প্রাণীকে অবাধ চারণের অধিকার দেয়া ...হবে। কর দানের ব্যাপারে ভগ্নাংশ সংখ্যা হিসাবে ধরা হবে না। চারণভূমি ...তোমাদের জন্য বন্ধ হবে না। তোমরা প্রত্যহ উপাসনা করবে এবং যাকাত প্রদান ...করবে।

তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের জামিন হিসাবে রাখ। বিনিময়ে তোমাদের ...জন্য সদিচ্ছা পোষণ করা হবে এবং রীতিমতো সব কিছু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ...করা হবে। রাষ্ট্রের পক্ষে সমস্ত মালিকহীন জমি ও দুর্গ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং ...ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরিচালনার ব্যয়ভার বিজিতদের উপর ন্যস্ত হবে, যাদের ...নির্বাসন অভিপ্রেত ছিল না।

যুদ্ধবিহীন সমর্পণের বেলাতেও সমস্ত এলাকা সম্বন্ধে একই নিয়মাবলী ...প্রযোজ্য হত। কারণ আমরা মহানবীর জীবনে আরব ও ফিলিস্তিনের বিভিন্ন জমি ...সম্পর্কে অনেক সংবাদ পাই, যা ঐ সব ব্যক্তিকে দেওয়া হত যারা মুসলিম রাষ্ট্রের ...উপকার করত, যদিও ঐ স্থানগুলি শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের অধিকারে এসেছিল। ...ঐরূপ জমির দান সম্পর্কে সে সব দলিলপত্রে আমরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি উক্তি ...পাই- 'যদি এই জমি কোনো মুসলিম নাগরিকের অধিকারে না থাকে।'

মহানবীর পরেই অল্প দিনের মধ্যে যখন ইরাক ও সিরিয়ার উর্বর জমি ...মুসলিম বাহিনী দখল করে নেয়, সৈনারা গণিমতের বন্টনের জন্য, (যার মধ্যে ...তারা মুসলিম আইন অনুসারে জমিও অন্তর্ভূক্ত করেছিল) দাবী করতে লাগল।

বিষয়টি রাজধানী মদিনাতে জানানো হল এবং সেখানে দীর্ঘ আলোচনা চলে... গৃহীত সিদ্ধান্ত সমস্ত বাহিনীর সেনাপতিদের নিকট প্রেরিত হল। আবু ইউসুফ ... বিষয়ে বিস্তারিতভাবে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেছেন এবং ইরাকী ও সিরীয় বাহিনীর নিকট প্রেরিত ফরমান লিপিবদ্ধ করেছেন। ফরমানের অনুবাদ নিম্নরূপ :

আবু উবায়দা খলিফা ওমরকে সংবাদ দিলেন: অমুসলমানদের পরাজয়ের... আর যে গণিমত আল্লাহ্ তাদেরকে দান করেছিলেন তার কথা এবং ঐ সকল সন্ধির শর্তাবলীর কথা যা বিজিত দেশের জনগণ স্বীকার করেছিল এবং গণিমত হিসাবে নগরী ও তার অধিবাসীরা, জমি, গাছপালা, ফসলের অংশ নেওয়ার জন্য মুসলমানদের অনুরোধের কথা এবং সেই সঙ্গে তিনি (আবু উবায়দা) আরও জানিয়েছেন যে, সে অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাঁর (খলিফার) মতামত এ বিষয়ে তিনি চেয়ে পাঠান।

ওমর প্রত্যুত্তরে লিখে পাঠান: পাঠ করুন, আপনি আল্লাহ্ প্রদত্ত যে গণিমত ও শহর-নগরের অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধির কথা লিখেছেন। আমি মদিনায় সাহাবার সঙ্গে আলাপ করেছি, তাঁরা এ বিষয়ে একমত হন নাই। আমার অভিমত আল্লাহ্র কিতাবের অনুসরণের ভিত্তিতে আপনাকে জানাচ্ছি: এবং যা আল্লাহ্ তাদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে দেন, তোমরা তার জন্য কোনো অশ্ব বা উট দাবী করো না, কিন্তু আল্লাহ্ রাসূলকে প্রভুত্ব দেন ঐ সব বিষয়ের উপর যা তিনি ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ সকল ক্ষমতার অধিকারী। যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে শহরের অধিবাসীবৃন্দের নিকট থেকে দান করেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের জন্য, ... নিকট আত্মীয় ও এতিমদের জন্য এবং অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরদের জন্য তা ... তোমাদের ভিতর ধনীদের মধ্যে বিতরণ করো না, এবং রাসুল (সঃ) যা তোমাদেরকে দেন তাই গ্রহণ করো এবং যা তিনি নিষেধ করেন তা থেকে দূরে থাক এবং আল্লাহর প্রতি কর্তব্য কর। জেনে রাখ, আল্লাহ্ কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

এবং এই গণিমত ঐ গরীব পলাতক ব্যক্তিদের জন্য, যারা গৃহ ও আসবাবপত্র থেকে বঞ্চিত হয়ে বিতাড়িত হয়েছে এবং যারা আল্লাহ্র নিকট থেকে ঐশ্বর্য চায় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারা অনুগত। ... গোড়ার দিকের মক্কার মুহাজিরদের বেলায় প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে :

"এবং যারা গৃহে অবস্থান করে, ঈমানকে বজায় রাখে, আর যারা তাদের নিকট পালিয়ে আশ্রয় নেয়-তাদেরকে ভালোবাসে এবং যা তাদেরকে দান করা হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে কোনো কামনা পোষণ করে না, বরং তাদের উপর মুহাজিরদের স্থান দেয়, যদিও তার ফলে তারা দারিদ্র হয়ে যায়। এবং যারা লোভ-লালসা থেকে নিস্কৃতি পায় তারাই সাফল্য অর্জন করে।"

নিশ্চয়ই এরাই আনসার (অর্থাৎ মদিনার সাহায্যকারী)। এ ছাড়াও আরো বলা হয়েছে যে, "এবং যারা ইহাদের উপরে ঈমান আনে। ইহারা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ আমাদের সন্তান; এবং আল্লাহ্ কিয়ামত বা শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত গণিমতের অংশীদার হিসাবে নির্ধারিত করেছেন।"

সুতরাং আল্লাহ্ যা তোমাদেরকে গণিমত হিসাবে দিয়েছেন তা প্রাক্তন মালিকের অধীনস্থ থাকতে দাও, তথাপি তাদের অবস্থা অনুযায়ী তাদের উপর জিযিয়া নির্ধারিত করো, যা মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করবে এবং যা দেশের সমৃদ্ধির একটা উপায় হতে পারবে। কারণ তারা এ সম্বন্ধে তোমাদের অপেক্ষা ভাল জানে এবং শ্রেষ্ঠতরভাবে এর সদ্ব্যবহার করতে পারবে। কোনোক্রমেই তোমরা অথবা তোমাদের সঙ্গের মুসলমানরা তোমাদের গণিমতের অংশ বলে গণ্য করো না এবং বন্টন করো না, যেহেতু তোমরা তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছ এবং তাদের অবস্থানুযায়ী জিযিয়া আদায় করেছ। এবং বস্তুতঃ আল্লাহ্ আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

"তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহ্কে ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। এবং আল্লাহ ও তার রসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষেধ করো এবং সত্য ধর্মের অনুসরণ কর না যতোক্ষণ তারা নত হয়ে অবস্থানুযায়ী জিযিয়া আদায় না করে।

যেমনই তাদের নিকট থেকে জিযিয়া নেবে, তেমনই তাদের বিরুদ্ধে কোনো উপায় বা পথ থাকবে না। আমাকে বলো দেখি আমরা যদি তাদের লোকজন বন্দী করি ও বন্টন করি, তাহলে মুসলমানদের জন্যে কি থাকবে যারা আমাদের পরে আসবে? আল্লাহ্র কসম, তারা কারও সঙ্গে কথা বলবার মতো লোক পাবে না, অথবা কারও নিকট থেকে কোনো সুযোগ-সুবিধা পাবে না। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজিত জাতিকে দাস-দাসীতে পরিণত না করি, তারা আমরণ মুসলমানদের আহার যোগাবে; এবং যখন আমরা এবং তারাও মরে যাবে,

আমরণ আমাদের পুত্রগণ তাদের পুত্রগণের নিকট থেকে আহার পাবে। যতোদিন ইসলাম জয়যুক্ত হবে তারা ইসলামের অনুসারী সমস্ত মানুষেরই দাস বলে বিবেচিত হবে।

অতএব তাদের উপর জিযিয়া নির্ধারণ করো। তাদেরকে দাসে পরিণত করো না এবং তাদেরকে নির্যাতন ও অনিষ্ট করার ব্যাপারে মুসলমানদেরকে বিরত রাখো। ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে তাদের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করো না এবং যে সন্ধির শর্তাবলী তাদেরকে প্রদান করেছ সেগুলো পুরোপুরি কার্যকরী করো। উৎসব কালে খৃষ্টানদের ক্রুশের মিছিলের ব্যাপারে বছরে একবার হলে আর যদি তা বিনা পতাকায় অনুষ্ঠিত হয়, এবং নগরের বাইরে তা ঘটলে তাদেরকে বাধা দিও না, কেননা তারা এর জন্য তোমাদের নিকট অনুরোধ জানিয়েছে। নগরের অভ্যন্তরে মুসলমানদের ও তাদের মসজিদের ব্যাঘাত ঘটলে কোনো ক্রুশকে আসতে দেওয়া হবে না।

তখন থেকে ইহার বিপরীত কোনো দৃষ্টান্ত বস্তুতঃ পাওয়া যায় না, যদিও মুসলমান ফকিহগণ তত্ত্বের দিক থেকে মত পোষণ করেন যে, নূতন দেশ বিজয়ের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকের স্বাধীনতা আছে: উহাকে (জিম্মীর ধনসম্পদকে) গণিমত হিসাবে বন্টন করা, কিংবা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে রক্ষা করা এবং সেক্ষেত্রে উহার আয় থেকে গোটা জাতির ব্যয় নির্বাহ করা যায়। যাহোক, এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈততা নাই যে, যখনই মুসলমানরা কোনো শর্তাবলী গ্রহণ করবে সেগুলোকে অবশ্যই সদুদ্দেশ্যে পালন করতে হবে।

ক. পবিত্র দেশ-বিজিত দেশের প্রতি বা ভূখন্ডের প্রতি ব্যবহারের বেলায় আর একটি বৈশিষ্ট আছে। অমুসলমানদেরকে আরব থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে, কেননা তারা তথায় বসাবাস করতে পারে না।

খ. খাস জমি-মুসলমান ফকিহ ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, খলিফা উমর রোমের দশ প্রকার জমিকে খাস জমি হিসেবে গণ্য করেন, যথা- প্রাক্তন শাসকের অথবা তার পরিবারবর্গের জমি পরাজিত ও নিহত ব্যক্তিদের জমি, যা মালিকহীন হয়ে পড়ত। ঐসব ব্যক্তিদের জমি যারা পলায়ণ করে আর প্রত্যাবর্তন করে নাই এবং ডাকঘর, বনজঙ্গল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট জমিসমূহ।

গ. কনডোমিনিয়াম- কিছু জটিলতার উদ্ভব হতে পারে ঐসব জমির ক্ষেত্রে যা দুই রাষ্ট্রের মালিকানাধীন থাকে এবং তন্মধ্যে একটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকে।

...র সম্পত্তি

তথাপি কোন যুদ্ধরত শক্তি জমিকে নিরপেক্ষ গণ্য করবে না, যদি উহা সামরিক ক্ষেত্রের দিক থেকে যুদ্ধমান দুই শক্তির কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়, যেমন সৈন্যের চলাচল, যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত ও মেরামতকরণ ইত্যাদি। কেবল নিরপেক্ষতার ঘোষণা নিষ্ফল হবে-যদি যুদ্ধমান শক্তির কোনটি অলিখিত বাধাকে স্বীকার না করে।

ঘ. সেনা বাহিনীর সাজসজ্জা-যুদ্ধ এলাকায় যুদ্ধের উপকরণের বেলায় ব্যক্তিগত ও সরকারী জমির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। মানুষ ও যুদ্ধাস্ত্র উভয়কেই ধৃত, বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যুদ্ধের আঘাত সামলাতে হত। আমরা পূর্বেই যুদ্ধবন্দীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। পরবর্তী অধ্যায়ে গণিমত বন্টনের বিষয় আলোচিত হবে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি:

যুদ্ধ এলাকায় শত্রুর অধীনস্ত জমি এবং ব্যক্তিগত জমির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যদি কোন নগর বা দূর্গ আক্রান্ত হয় তবে অনেক কিছু নির্ভর করে আত্মসমর্পণের শর্তাবলীর উপর। খয়বরে মহানবী শর্ত নির্ধারণ করেন যে, পরাজিত শত্রুগণ একমাত্র পরিহিত বস্ত্রাদি ব্যতীত অন্যান্য সব কিছুই সমর্পণ করবে, যদিও পরবর্তীকালে উদারতার নিদর্শন স্বরূপ তিনি এই দাবী ত্যাগ করেছিলেন। শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন কব বশীভূত করা হয়ে থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ বিজিত শহরগুলোর নির্বিচারে লুন্ঠনের উল্লেখ প্রাচীন কালের ইতিহাসে কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

গণিমতের বন্টন:

এই বিষয়ে মুসলিম আইনের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। যখন মুসলমানরা তাদের দেশ মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে মদিনায় আশ্রয় নিয়ে তথায় একটি নগর-রাষ্ট্র গঠন করেছিল তখন গণিমত সম্বন্ধে তাদের কোন আইন-কানুন ছিল না। সাধারণত এ ক্ষেত্রে মহানবী আহলে কিতাবদের অনুসরণ করেন। সুতরাং যখন ইবনে জাহাশ্ বদর যুদ্ধের পূর্বে এক অভিযানে বহির্গত হন, তিনি রাষ্ট্রকে এক-পঞ্চমাংশ বন্টন করে দেন। মহানবী (সঃ) গণিমত গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁর বিনানুমতিতে যুদ্ধ করার জন্য তিরস্কার করেন। তিনমাস পরে বদর যুদ্ধের পরে অনেক বন্দী দেখা গেল। মহানবীর মজলিসে-শুরার সভ্যগণের ভিতর মতানৈক্য ঘটল, একদল তাদের মৃত্যুদন্ড, অপরদল মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের

মুক্তির প্রস্তাব দিলেন। মহানবী দয়ার্দচিত্তে শেষ প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। এবং সাধারণভাবে গণিমত সংক্রান্ত ব্যাপারে মহানবী স্বীয় পূর্ব ইচ্ছার প্রয়োগ করেছেন। আরও কিয়ৎকাল পরে কুরআনে এক আইন পাওয়া গেল যে, যুদ্ধের পরে লব্ধ গণিমত এমনভাবে বন্টন করতে হবে যে, যাতে সেনা বাহিনী অংশ ও রাষ্ট্র অংশ পায়। অশ্রারোহী পাবে পদাতিকের তুলনায় দ্বিগুণ এবং সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিকের মধ্যে কোনো বৈষম্য করা হবে না। বিনা যুদ্ধে লব্ধ গণিমতের ক্ষেত্রে সমস্তটা বায়তুলমালে জমা হত এবং রাষ্ট্রপ্রধানের ইচ্ছাধীন থাকতো। এই প্রকার গণিমতকে 'ফায়' নামে আখ্যায়িত করা হতো এবং ইহা গণিমাহ্ বা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা প্রাপ্ত ধন হতে পৃথক ছিল।

যদি কোন দেশ আক্রান্ত না হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করত, যা কিছু সন্ধি অনুযায়ী মুসলিম সরকার লাভ করত তা 'ফায়' এর অন্তর্ভূক্ত হত। বার বার দেয়া কর, সন্ধি অনুযায়ী সাময়িকভাবে দেয়া অর্থ শত্রুর দেশ-প্রাপ্ত, যুদ্ধ-প্রাপ্ত নয়, এরূপ মালিকহীন সম্পত্তি উপরোক্ত বিষয়টির দৃষ্টান্ত। ফিদাকের অধিবাসীরা খায়বরের ভাগ্য দেখে ভীত হয়েছিল এবং খয়বরের বিজিত অধিবাসীদেরকে যে শর্তাবলী প্রদান করা হয়েছিল, সেই শর্তাবলীর ভিত্তিতে মহানবীর নিকট শান্তির জন্য অনুরোধ জানাল। খায়বরের ধন-সম্পদকৈ গণিমা হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল, কিন্তু ফিদাকের ধনসম্পদকে 'ফায়' হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল, এবং একই কারণে মহানবী স্বেচ্ছায় বিলি-ব্যবস্থা করেছিলেন।

গণিমা ও ফায় উভয়ই গবাদি পশু বা অস্থাবর বস্তুই শুধু নয়, স্থাবর ও ক্রীতদাসও হতে পারে। যদি কোন ক্রীতদাস বন্দী হয় এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে কিংবা অদল-বদল করে, অথবা বিনা অর্থে নিস্কৃতি না পায়, তাহলে সাধারণভাবে তার সাধরণ নিয়ম ব্যবহার করা হয়। ভগ্নাংশের দরুন অসুবিধা দূরীকরণার্থে ক্রীতদাসদের নীলামে বিক্রয় করা হয় এবং প্রাপ্ত অর্থ বিজয়ী বাহিনী ও মুসলিম রাষ্ট্রের পর্যায়ক্রমে সাধারণ নিয়মে চার ভাগের ও এক ভাগে বন্টন করা হয়।

গণিমত ইসলামী এলাকায় বন্টন করা হয়, যার মধ্যে সদ্য বিজিত দেশও অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যদি তা মুসলিম এলাকাভূক্ত করে নেয়া হয়-এমনকি যুদ্ধ চলাকালেও। মুসলিম ফকীহ্গণ বদরকে কেবল একটা স্থান হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যেথায় শত্রুর উপর বিজয় লাভ করা হয়েছিল, কিন্তু স্থানটি এলাকাভূক্ত করা হয় নাই। পক্ষান্তরে খায়বর ও বনু মুসতালিক গোত্রের দেশটি অন্তর্ভূক্ত করে

নেয়া হয়েছিল, যেমনই মহানবী সেগুলো জয় করে নিয়েছিলেন। এই কারণে বদর, হুনায়েন ও অন্যান্য স্থানের গণিমাত-যেগুলো ইসলামী এলাকাভূক্ত ছিল না, বন্টন করা হয় নাই; এবং খায়বরের ক্ষেত্রে উহা সেখানেই বন্টন করা হয়েছিল।

বলা হয়েছে, চার-পঞ্চমাংশ গণিমত বিজয়ী সেনাবাহিনীকে পুরস্কার স্বরূপ দান করা হয়। স্বেচ্ছাসেবক ও নিয়মিত বেতনভোগী সৈনিক অথবা বেসরকারী ও অফিসারের মধ্যে, এমন কি প্রধান সেনাপতির ক্ষেত্রেও কোন তারতম্য করা হয় না। সকলেই সমান অংশ পেয়ে থাকে। তবে অশ্বারোহী সৈনিকের অর্ধেক এবং কারো কারো মতে এক-তৃতীয়াংশ পায় পদাতিক সৈনিক। যাহোক বাহিনীর অনুসারী, যারা সচরাচর যুদ্ধ করে না, যেমন ঠিকাদার ব্যবসায়ী ইত্যাদি, গণিমতের অংশ পায় না, ব্যতিক্রম হয় যখন তারা যুদ্ধ করে। যারা প্রকৃতই যুদ্ধ করত ও যাদের যুদ্ধ করার দরকার হয় নাহ তাদের কোন পার্থক্য করা হয় নাই। আবশ্যক হলে তারাও যুদ্ধ করতে পারত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যারা অবস্থান করত এবং রক্ষীবাহিনী বা যারা প্রহরায় রত থাকত। বদরের যুদ্ধে মহানবী আটজন ব্যক্তিকে যুদ্ধে যোগদান না করা সত্বেও গণিমাতের অংশ গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁরা সেনাপতি কর্তৃক স্কাউটিং-এর মতো বিশেষ কর্তব্যে নিয়োজিত ছিলেন। স্ত্রীলোক, ক্রীতদাস, নাবালক, অমুসলমান, যদিও তাদের মুল্যবান কার্যের জন্য পুরস্কৃত হত তথাপি তারা পূর্ণ বয়স্ক মুসলমান সৈনিকের মতো সমান অংশ পেত না। যাহোক, একটি ব্যতিক্রম করা হতো অমুসলমান সৈনিকদের ক্ষেত্রে, যদি তারা নিজেরা প্রচন্ড শক্তি হিসাবে কাজ করত, কিংবা তাদের বাদ দিলে মুসলমান বাহিনী বিশেষ শক্তিশালী হতে পারত না; সে ক্ষেত্রে তারাও মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে সমান অংশ লাভ করত।

গণিমতের চার-পঞ্চমাংশ পাওয়া সত্বেও সেনাবাহিনী তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে আরও দুই প্রকার পুরস্কার পেত, যা তানফিল ও সালাব নামে অভিহিত হত।

তানফিল:

ক. মুসলিম আইন তানফিলের অর্থে কোন সৈনিক বা সৈনিকগণকে জীবন বিপন্ন করে যে সকল কাজ করা হয়ে থাকে তজ্জন্য যে উপহার বা উপঢৌকন দেয়া হতে পারে তাকে বুঝায়। ইহা রাষ্ট্রের অংশ থেকে দেয়া হয়। পূর্বাহ্নে পুরস্কার

ঘোষণা সম্পর্কে সারাখশী দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

রাসুলের অনেক হাদীস আছে যাতে জানতে পারা যায় যে, তিনি অগ্রাভিযানের সময়ে বাহিনীর বিজয়ের জন্যে অংশ থেকে অংশ এবং প্রত্যাবর্তন করার সময়ে অংশ দান করতেন। কারণ স্বরূপ, বলা যায় যে, অগ্রাভিযান ও অগ্রগতি অপেক্ষা বিজয়হীন প্রত্যাবর্তন কিংবা পশ্চাদপসরণ সব সময়ই অনেক বেশী শোচনীয় হয়ে থাকে।

সালাব:

সালাব অর্থে বুঝায়- নিহতদের নিকট থেকে বিজয়ী সৈনিক যে গণিমত পেয়ে থাকে। হানাফী মযহাবের মতে তখন এই রীতি কার্যকরী হবে যখন প্রধান সেনাপতি পূর্ব থেকে ঐ রূপ কোনো ঘোষণা করে থাকেন। সালাবের সবটাই বিজয়ী সৈনিক পেয়ে থাকে। কেবল মালেকী মাযহাব ভিন্নমত পোষন করে বলে, সরকার এক পঞ্চমাংশ পায়। যাহোক, একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যখন খলিফা উমর সালাবের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য রেখেছিলেন। কথিত আছে, আলবারা ইবনে মালিক মল্লযুদ্ধে জনৈক পারসিক শাসনকর্তাকে হত্যা করেছিল এবং তাঁর অংশ গণিমতের মূল্য ছিল পঞ্চাশ সহস্র দ্রাকমা এবং খলিফা বলেছিলেন বলে জানা যায়, "যদিও আমরা সচরাচর অংশ সালাব থেকে নিই না, ইহা বিরাট একটি টাকার অঙ্ক" এবং এইবারই প্রথম রাষ্ট্র সালাব থেকে ইহার অংশ গ্রহণ করেছিল। ইহা প্রমাণ করে যে, সালাবের মতো পুরস্কার রাষ্ট্রেরই একটা অনুগ্রহের ব্যাপার।

ইবনে জুম'আ বিস্তারিতভাবে ঐ সব অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন যখন কোনো ব্যক্তি যাদেরকে সে হত্যা করেছে, তাদের ভূসম্পত্তি ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবী করতে পারে। তিনি বলেন:

ক. জীবন বিপন্ন করে যদি দুর্গ থেকে কিংবা পশ্চাদদিক থেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে সালাব প্রাপ্তির অধিকার জন্মাবে।

খ. যুদ্ধকালে হত্যা করা: যখন শত্রু পরাজিত বাহিনীর সঙ্গে পশ্চাদাপসরণ করছে না।

গ. প্রতিরোধকালে হত্যা করা : দৃষ্টান্ত স্বরূপ যখন শত্রু তার অস্ত্র ত্যাগ করে নাই, কিংবা বন্দী হয় নাই।

ঘ. শত্রুকে হত্যা করা, অন্ততঃপক্ষে তার হস্তপদ উভয়ই . কিংবা একই ...র হস্ত এবং পদ কর্তন করে অথবা তাকে অন্ধ করে অকর্মন্য করে ফেলা।

ঙ. কারও মতে যারা পূর্ণ অংশ পায় না, যেমন ক্রীতদাসেরা. তারা সালাবও ...বে না। অস্ত্রসস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ. অশ্ব ইত্যাদিও সালাবের অন্তর্ভুক্ত।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে. প্রাক-ইসলামী আরবে রাযিয়ার (Razzia) সেনাপতিদের অংশ গণিমতের উপর. অবিভাজ্য ভগ্নাংশ সংখ্যার ...পর, শত্রুর পরাজয়ের পূর্বে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর উপর. সাধারণ লুন্ঠন এবং বাছাই ...রা জিনিসপত্রের উপর দাবী ছিল. সেই সব জিনিসপত্র হল তরবারি. ক্রীতদাসী. ...শ্ব ইত্যাদি- যা সে বিজয়ী বাহিনীর মধ্যে বিতরণের পূর্বেই নিজের জন্য বেছে ...নিত। এর থেকে বুঝা যায় যে এইগুলোর মধ্যে অংশকে মহানবী (সঃ) অগ্রে ...গ্রাস করতেন এবং তাও সমস্ত লোকের প্রাপ্য কিন্তু তা সেনাপতির ব্যক্তিগত ...তহবিলে বা রাষ্ট্র প্রধানের ব্যক্তিগত তহবিলে জমা হত না। পছন্দ বা সাফী নামে ...যাকে অভিহিত করা হয়. তা মহানবীর এখতিয়ার ছিল এবং ইহা অধিকাংশ ...ফকিহগণের অভিমত যে. ইহা মহানবীর বিশেষ ক্ষমতাভুক্ত. ইহার একমাত্র ...ব্যতিক্রম আবু সওর. যিনি অভিমত পোষণ করতেন যে. এই বিশেষ ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় ...পর্যায়ে মহানবীর উত্তরাধিকারীরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অন্যান্য অবশিষ্ট ...রীতিনীতিগুলো ইসলাম রহিত করে দেয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক আশ্রয় ও অপরাধীর বহিঃসমর্পন

১. রাজনৈতিক আশ্রয়:

শত্রু পক্ষীয় কোন রাষ্ট্রের বা অন্য কোন রাষ্ট্রের কোন নাগরিক যদি ইসলামী রাষ্ট্রের আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ন্যায় সঙ্গত বিবেচিত হলে উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং আশ্রিত ব্যক্তি যখনই নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তাকে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "মুশরিকদের কেউ যদি তোমাদের কাছে আশ্রয় চায় তাহলে তাকে আশ্রয় দাও: সে যাতে আল্লাহর বাণী শুনতে পায় । অতঃপর তাকে তার নিরাপদ গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দাও। এটা এ জন্য যে, তারা অজ্ঞ ও মূর্খ"(তওবা-৬)। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাপকতা ও গভীরতার দিকে লক্ষ্য করে ইমামগণ এ আয়াত থেকে ইশারাতুন্নাস এর ভিত্তিতে এই আইন তৈরী করেছেন, যে অমুসলিম দেশ থেকে যারা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের আশ্রয় চায় বা যারা ব্যবসা, পর্যটন, উচ্চতর শিক্ষালাভ কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রে আসতে চায় এবং বসবাস করতে চায় সে ক্ষেত্রে প্রশাসন তাদের আশ্রয় দিবে, নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করার অনুমতি দিবে: তবে শর্ত হল তাদেরকে নিরাপত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করে প্রবেশ করতে হবে, অন্যথায় তাদেরকে গোয়েন্দা বলে বিবেচনা করা হবে। উল্লেখ্য যে, ইসলামী আইনে গোয়েন্দাদের জন্য কঠোর দন্ডের বিধান রয়েছে। হানাফী ফকীহগণের মতে এধরনের আশ্রয় গ্রহণের সর্বোচ্চ মেয়াদ এক বছর। মেয়াদ শেষে উক্ত বহিরাগত আশ্রয় গ্রহণকারীকে নোটিশ দিতে হবে যে, নিজ দেশে ফিরে যাও অথবা জাতীয়তা পরিবর্তন করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হও।

হিদায়া নামক গ্রন্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্কীত বিধি ও নিরাপত্তা প্রার্থী প্রসঙ্গে বিধৃত হয়েছে যে, কতিপয় ফকিহগণেরমতে নোটিশ দেয়া হোক বা না হোক এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পূর্ববর্তী জাতীয়তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে। মাবসূত গ্রন্থেও একই মত পোষণ করা হয়েছে । ইসলামী রাষ্ট্রে বহিরাগত

...গ্রহণকারীর জন্য শরীয়াহ্ ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে । আশ্রিত ব্যক্তির ...থেকে জিযিয়াও আদায় করা হবে না । অপরাধী হলেও আশ্রয় বাতিল করা ...বে না। কিন্তু ইসলামী প্রশাসন তার বিচার করতে পারবে এবং তা হবে ইসলামী ...ষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকের মত। তবে উক্ত আশ্রিত ব্যক্তি যদি কোন মুসলমানকে ...থবা কোন জিম্মিকে হত্যা করে সে ক্ষেত্রে তাকে কিসাসের শাস্তি দেয়া হবে না, ...শুধুমাত্র দিয়াত(রক্তপণ) দিতে হবে। কারণ সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক নয়। ...এছাড়াও তার নিজ দেশের আইনানুযায়ী বিচার হতে পারে যদি সে কখনও ফিরে ...যায় অথবা দু'দেশের মধ্যে চুক্তি মোতাবেক তাকে ফেরত পাঠানো হয়। উপরোক্ত ...আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের মত ইসলামী ...আন্তর্জাতিক আইনে ও রাজনৈতিক আশ্রয়কে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা ...য়.।

২. অপরাধীর বহি:সমর্পন:

অপরাধীর বহি:সমর্পন বলতে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ...বা পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক রাষ্ট্রের পলাতক ব্যক্তিকে (আসামী বা অপরাধী) অপর রাষ্ট্র কর্তৃক তার নিজ রাষ্ট্রের কাছে সমর্পন বা হস্তান্তর করাকে ...বুঝায়। অন্য কথায় বলা যায় যে, কোন রাষ্ট্রের পলাতক ব্যক্তিকে তার নিজ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পন করাই হলো অপরাধীর বহি:সমর্পন। প্রাথমিক যুগে মুসলিম মনীষীরা অপরাধীর বহি:সমর্পন শব্দটির কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেন নাই, কারণ এটি আধুনিক যুগের একটি পরিভাষা। শরীয়তে এর কোন সংজ্ঞা না থাকলেও বাস্তবে এর কার্যকারীতা পরিলক্ষিত হয়। তবু আলোচনার সুবিধার্থে আধুনিক যুগের কয়েকজন ইউরোপীয় আইনবিদদের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো।

যেমন : Oppenham বলেন, "Extrdition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have been Convicted of a crime by the state on whose territory the Convicted individual happens to be for time being."

Lawrence বলেন, "Extradition is a surrender by one state to another of an individual who is found within the territory of the former, and is accused of the latter, or who having committed a crime outside the territory of the latter is one of its subjects and such by

its law a amenable to its jurisdiction."

উপরোক্ত সংজ্ঞা দুটি বিশ্লেষণ করলে পরিলক্ষিত হয় যে, বহিঃসমর্পন বা 'Extradition' হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা কোন চুক্তি বা পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক দেশের অনুরোধে অন্য দেশ কোন ব্যক্তিকে সমর্পন করে যে ব্যক্তি ঐ অনুরোধ কারী দেশের আইন ভঙ্গ করেছে বা কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছে বা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে । ইউরোপীয় আইনবিদদের দেয়া এ সংজ্ঞা দুটির সাথে শরীয়তের কোন সংঘাত নেই. কারণ বহিঃসমর্পনের যে উদ্দেশ্য তা ইসলামী রাষ্ট্র সহ সকল সভ্য রাষ্ট্র কামনা করে । আর যে কারণে কামনা করে হয় তা আইনবিদ Stark এর ভাষায় হচ্ছে :

ক. সভ্য জগতের রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যাশা হচ্ছে যে, কোন অপরাধীকে শাস্তি বিহীন অবস্থায় যেতে না দেয়া । কারণ শাস্তি বিহীন অবস্থায় যেতে দেয়া হলে আশ্রিত রাষ্ট্র ও যে রাষ্ট্র থেকে পলায়ন করে উভয় রাষ্ট্রেরই শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকে ।

খ. যে দেশে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে সে দেশই হবে অপরাধীর বিচার করার জন্য প্রকৃত স্থান । কেননা অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমানের সুবিধা সে দেশেই সহজে পাওয়া যাবে ।

বহিঃসমর্পনের বিষয়টি রাসূলের (সঃ) স্বাক্ষরিত হুদায়বিয়ার সন্ধিতে পরিদৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ হিজরিতে স্বাক্ষরিত এই সন্ধির ৫নং ধারায় বলা হয়েছে যে, "মদীনা থেকে যদি কোন মুসলমান মক্কায় আসে তখন কুরাইশরা তাকে মদীনায় ফেরত পাঠাবে না । কিন্তু মক্কা থেকে কোন মুসলমান বা অন্য কোন লোক মদীনায় গমন করে সে ক্ষেত্রে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে ।"

এ ধারাটির মাধ্যমে অপরাধীর বহিঃসমর্পনের দিকটি পরিলক্ষিত হয়। যদিও এ ধারাটি অনেক মনীষীর কাছে একতরফা বলে বিবেচিত হয় এবং এমনকি অনেক সাহাবা এ ধরণের শর্তের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিলেন কিন্তু রাসুল (স:) তাদেরকে বলেছিলেন এতেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। রাসুল (স:) সব সময় এ শর্ত পালন করে গেছেন ।

এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ যোগ্য যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পরপরই মক্কা হতে সোহাইল এর পুত্র আবু জন্দল শৃংখলা বেষ্টিত অবস্থায় মুহাম্মদ (স:) এর কাছে উপস্থিত করা হলো। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে আবু

জন্দলের উপর দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চলছিল এবং ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করার জন্য কুরাইশগণ তাঁর উপর খুবই চাপ দিতেছিল, কিন্তু আবু জন্দল কিছুতেই রাজী হয় নাই। এ জন্য সোহাইল ও তার আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় সুযোগ বুঝে তিনি পালিয়ে হযরত মুহাম্মদ(স:) এর শরনাপন্ন হলেন। আবু জন্দলকে দেখে সোহাইল বলে উঠল : মুহাম্মদ! এবার তোমার আন্তরিকতার পরীক্ষা উপস্থিত। সন্ধির শর্ত অনুসারে তুমি এখন আবু জন্দলকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য।" সন্ধির শর্ত অনুসারে মুহাম্মদ (স:) আবু জন্দল কে মক্কার কুরাইশদের হাতে সমর্পন করলেন।

এ ছাড়াও সন্ধির পর হযরত ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনায় ফিরে আসার পর মক্কা হতে 'ওৎবা' নামের একজন নব দিক্ষিত মুসলমান মদীনায় চলে আসে। সঙ্গে সঙ্গে মক্কা হতে দু'জন কুরাইশ দূতও মদীনায় উপস্থিত হয়ে সন্ধির শর্ত মোতাবেক 'ওৎবা'কে তাদের কাছে ফিরায়ে দেয়ার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স:) এর নিকট দাবী জানায়। মুহাম্মদ (স:) সন্ধি মোতাবেক 'ওৎবা' কে মক্কার প্রতিনিধিদের হাতে সমর্পন করেছিলেন। এ হচ্ছে বহিঃসমর্পন সংক্রান্ত ইসলামী নীতি।

অপরাধীর বহিঃসমর্পনের শর্তাবলী:

যখন কোন রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্রের কাছে কোন অপরাধীর সমর্পন করার জন্য অনুরোধ জানায় তখন উভয় রাষ্ট্রের কতগুলি শর্ত পালন করা প্রয়োজন যেমন:

১. **সমর্পন যোগ্য ব্যক্তি:** যে ব্যক্তির সমর্পন চাওয়া হয় তাকে অবশ্যই সমর্পিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে। কারণ কোন রাষ্ট্রই তার নিজ নাগরিককে অন্য রাষ্ট্রের কাছে সমর্পন করবে না। শুধুমাত্র অনুরোধকারী রাষ্ট্র তার নিজের নাগরিককে সমর্পনের অনুরোধ জানাতে পারে।

২. **সন্ধি বা পারস্পরিক সম্পর্ক:** অপরাধীর বহিঃসমর্পন জন্য দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধি অথবা পারস্পরিক সম্পর্ক থাকতে হবে।

৩. **রাজনৈতিক সামরিক ও ধর্মীয় অপরাধসহ বড় ধরনের অপরাধের জন্য সমর্পন চাওয়া:** এ ক্ষেত্রে সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়।

অর্থাৎ সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও সামরিক অপরাধের জন্য বহি:সমর্পন চাওয়া হয়, ধর্মীয় অপরাধের জন্য বহি:সমর্পন করা হয় না অপরদিকে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে এ তিনটি অপরাধকে রাষ্ট্র ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য করা হয় এবং এ ধরনের অপরাধীদের বিচারবিহীন অবসথায় ছেড়ে দেয়া যায় না।

এ ছাড়াও আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে আরো কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে যা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে গ্রহণীয় হতে পারে, কারণ ইজতিহাদি দৃষ্টিকোন থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, এ গুলির সাথে শরীয়তের বড় ধরণের কোন বিরোধ নেই। যেমন:

ক. দ্বৈত অপরাধ নীতি: যে অপরাধের জন্য অপরাধীর শাস্তি দাবী করা হয় উক্ত অপরাধ অবশ্যই দাবীদার রাষ্ট্র ও সমর্পনীয় রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী হতে হবে।

খ. প্রাইমা ফেসী মামলা: কোন পলাতক ব্যক্তিকে সাধরনত: দাবীদার রাষ্ট্রের কাছে সমর্পন করা উচিত নয়, যতক্ষন পর্যন্ত না সমর্পনীয় রাষ্ট্রের কাছে তার বিরুদ্ধে প্রার্থমিক ভাবে একটি মামলার প্রমাণ তুলে ধরা হয়।

গ. বিশেষত্ব নীতি: সার্বজনীন ভাবে এ নীতি স্বীকৃত যে শুধু মাত্র সমর্পনীয় অপরাধের জন্য ছাড়া তার সমর্পনের পূর্বে সংঘটিত কোন অপরাধের কোন বিচার হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তাকে সমর্পনকারী রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, একটি রাষ্ট্র সব সময় পলাতক ব্যক্তিকে অনুরোধকারী রাষ্ট্রের কাছে সমর্পন করবে এন কোন বাধ্যতামূলক আইন নেই। রাষ্ট্র বিশেষ কোন কারণে পলাতক ব্যক্তিকে সমর্পন নও করতে পারে। বহি:সমর্পনের বিষয়টি নির্ভর করছে রাষ্ট্রের নিজস্ব ইচ্ছা ও আইনের উপর।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শান্তি চুক্তি

শান্তি চুক্তি ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে রাজনীতির মূল কথাই হল শান্তি এবং চুক্তির মাধ্যমে শান্তিপূর্ন সহাবস্থান ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

শান্তি চুক্তি বলতে অমুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা এবং শান্তিপূর্ন সহাবস্থানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তিকে শান্তিচুক্তি বা অনাক্রমণ চুক্তি বুঝায়। শান্তি চুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপাদান দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য শরীয়াহ্‌র মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী কোন শর্ত মেনে নেয়া বৈধ নয়।

ইসলামী যুদ্ধ আইনে শান্তিচুক্তির পথ সব সময় উন্মুক্ত কারণ ইসলাম যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করে না বরং সমাজকে সংস্কার করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,সত্য-ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে। সন্ধি, সমঝোতা ও আপোষ-মীমাংসা দ্বারা যখনই এসকল মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় সে ক্ষেত্রে যুদ্ধের আদৌ প্রয়োজন নেই।

রাসুল (সঃ) ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কার কাফিরদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেন তা ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত। এই চুক্তির ফলে মদীনার মুসলমানদের সাথে মক্কার কাফিরদের দীর্ঘদিন যাবৎ যুদ্ধ বিরতি ছিল। এই চুক্তি ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের শান্তি চুক্তির উজ্জল দৃষ্টান্ত।

শান্তিচুক্তি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে -" তারা (কাফিররা) যদি সন্ধির দিকে ঝোকে তবে তুমি ও সেদিকে ঝোঁক এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর " (আনফাল-৬১)।

ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে শান্তি, আপোষ ও সহাবস্থান কামনাকারী এবং নিজেদের কার্যকলাপ ও বাহ্যিক আচার-আচরণ দ্বারা শান্তির প্রতি আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশকারীদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলমানদের কি রকম আচরণ করতে হবে তা এই আয়াতে বিধৃত হয়েছে। আয়াতে কারিমায় 'জুনহ্' শব্দটি দ্বারা এক

ধরনের কোমল সম্প্রীতির ভাব প্রকাশ পায়। (তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন: সাইয়েদ কুতুব শহীদ)।

উদ্ধৃত আয়াতে বর্ণিত 'সিলমুন' শব্দটি সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে, "যদি কাফিররা কোন সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয় তবে হে নবী, আপনাকেও সেই সন্ধির প্রতি স্বাগত জানান উচিত" (আনফাল-৬১)। উল্লেখ্য আয়াতাংশে 'ফাজনাহ্' আদেশসূচক ক্রিয়া উত্তমতা বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে; যার মর্মার্থ হল কাফিররা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয় তবে সেক্ষেত্রে আপনার ও অধিকার রয়েছে যে, আপনি যদি সন্ধি করার মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন তাহলে সন্ধি করতে পারেন। তবে যদি এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মুসলমানরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না সেক্ষেত্রে ইসলামী আইনবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা জায়েজ।

আর যদি শত্রু পক্ষ থেকে সন্ধির ব্যাপারে এমন আগ্রহ প্রকাশ হয় যেখানে মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করার সন্দেহ প্রতীয়মান হয় সেক্ষেত্রেও মুসলমানদের আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সন্ধির ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত। কেননা আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "তোমরা আল্লাহর উপরে ভরসা কর।" (তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন,৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৪-৩১৫)।

আল্লাহ পাক শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের প্রতি উৎসাহিত করে এরশাদ করেন: "তারা যদি তোমাদের দিক থেকে হাত গুটিয়ে নেয় অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ করে এবং সন্ধির ইচ্ছা ব্যক্ত করে তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর হাত তোলার কোন অবকাশ রাখেন নি" (নিসা: ৯০)।

আল্লাহ পাক অন্যত্র এরশাদ করেন: "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে সন্ধি"(নিসাঃ১২৮)।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, ইসলামে যুদ্ধ নীতির প্রারম্ভিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের সর্বাত্মক ও সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো এবং একান্ত নিরুপায় হলেই কেবল যুদ্ধ ঘোষণার অনুমতি রয়েছে। কোন অবস্থাতেই শান্তি চুক্তি সম্পাদনের

প্রয়াস না চালিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।

চুক্তির পরিবর্তন ও অবসান: যে কোন সময় উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সম্পাদিত সন্ধির আংশিক অথবা গোটা সন্ধিটার সংশোধন বা পরিবর্তন করে নিতে পারে। এখানে শরীয়তের কোন বিধি-নিষেধ নেই। অপর দিকে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সন্ধির কিছু শর্ত কার্যকরী করা যায় না এবং পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে শর্তগুলোর পরিবর্তন হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে মুসলিম ফকিহ্গণ বলেন, যদি মুসলিম শাসক পূর্বেকার সন্ধি প্রত্যাখান করেন, তিনি তা করতে পারেন না যতক্ষণ তিনি অপর পক্ষকে অবহিত না করেন এবং তিনি চুক্তি বিরোধী কোন কাজ করতে পারেন না যতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তিসংগত সময় উত্তীর্ন না হয়, এবং যে সময়ের মধ্যে আশা করা যায় যে, সংবাদ অপর পক্ষের কাছে পৌছে থাকবে। অর্থাৎ একতরফা ভাবে কোন্ চুক্তির অবসান হতে পারে না। চুক্তি অবসানের জন্য উভয় পক্ষের সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে। অন্য দিকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে বা চুক্তির শর্তাবলী পালন হলে চুক্তিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে।

শান্তি চুক্তির ফলাফল :

১. যে বিষয় নিয়ে শত্রুতা ঘটেছিল তার মীমাংসা হয়ে যায়।

২. যুদ্ধকালীন অধিকারগুলো যথা হত্যা, বন্দীকরণ, লুন্ঠন, দখল ইত্যাদি যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে সে সব কার্যের অবসান হয়ে যায়।

৩. সন্ধিতে যদি বিপরীত কিছু না থাকে তাহলে সন্ধির পূর্বে যে অবস্থা ছিল, তাই স্থির থাকে।

৪. যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় হয় কিংবা মুক্তি দেওয়া হয়,যার জন্য সাধারনত: স্পষ্ট বিধান থাকে। তার গনিমত, স্পষ্ট নির্দেশ ব্যতিরেকে বিনিময় হয় না।

৫. যে মুহূর্তে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়,যে চুক্তি যুদ্ধকালে স্থগিত থাকে এবং যার পুনঃবিবেচনার আবশ্যক হয় না, স্বাভাবিকভাবে কার্যকরী হয় : এবং যুদ্ধকালে আচরণ সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়ে থাকে তা বাতিল হয়ে যায়।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

অমুসলিমদের অধিকারসমূহ

১. ধর্মীয় স্বাধীনতা:

ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে কোন ব্যক্তির যে, কোন একটি ধর্ম পালন করা এবং একই সাথে দুই বা ততোধিক ধর্ম পালন করা থেকে বিরত থাকাকে বুঝায়। ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিটি লোকের নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী একটি মৌলিক মানবিক ও নাগরিক অধিকার। ইসলামী বা মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে জিম্মি চুক্তি বা (আক্দ-আজ্জিম্মা) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই জিম্মি চুক্তির মাধ্যমে অমুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে বিরোধীতা বা হস্তক্ষেপ করা হয় না এবং তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করা থেকে বিরত থাকা হয়। এতদ্বসত্ত্বেও বিধর্মী বা অমুসলানদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সুযোগ বন্ধ হয় না। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে কেননা ইসলামের আগমন হয়েছে সবার জন্য অর্থাৎ ইসলামের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। যে গ্রহণ করল (স্বেচ্ছায়) সে মুসলমান আর যে গ্রহণ করল না সে কাফের বা অমুসলমান। ইসলাম যে সবার জন্য সে ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন, "বলে দাও হে মানবমন্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল।" অমুসলমান বা বিধর্মীদের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী পৌছানোর পন্থা হচ্ছে উত্তম কথা, কাজ, কৌশল ও উত্তম চরিত্র। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উত্তমরূপে উপদেশ শুনিয়ে...।" অর্থাৎ ইসলাম অন্য ধর্মের মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে জোর জবর দস্তিকে পছন্দ করে না বা অনুমতি দেয় নাই। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা হচ্ছে, "দ্বীন বা ধর্মের ব্যাপারে কোন জবর দস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই।"

এই আয়াত দুটির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলাম অমুসলমানদেরকে নিজ নিজ ধর্মে থাকার সুযোগ দিয়েছে। অতএব, তাদের ধর্মে অথবা বিশ্বাসে কোন প্রকার বিরোধিতা (বৈধ কারণ ব্যতীত) বা হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। রাসূল (সাঃ) অমুসলমানদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্মে থাকার ব্যাপারে নাজরানবাসীর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে যেমনটি উল্লেখ করেছেন যে, নাজরানবাসী

...এর আশেপাশের লোকেরা আল্লাহর প্রতিবেশী, তাদের বংশধর, ইবাদতগাহ ...ং তাদের অধীনস্থ সমস্ত কিছু তাদের ... এর কোন পরিবর্তন করা যাবে না ... ...ং তাদের উপর কোন রকম জোর জবরদস্তি করা যাবে না।

অমুসলামানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে সাধারণত তাদের উপাসনালায় ... তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি পালন জড়িত। আলোচনার ...বিধার্থে একে দুটি অংশে বিভক্ত করা হলো।

...থম অংশ: অমুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বা হস্তক্ষেপ না করা ...র্থাৎ অমুসলমানদেরকে নিজ ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মে বিশেষ ইসলাম ধর্মে ...ক্ষিত করার ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করা যাবে না। মুসলিম মনীষীরা সর্ব ...সম্মতিক্রমে ঐক্যমত পোষন করেছেন যে, জিম্মি চুক্তির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রে ...বসবাসকারী অমুসলমানরা নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারবে। তাদের ধর্ম ...ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত করার ব্যাপার জোর করা বৈধ নয়। কেননা তাদের ধর্মে থাকার জন্য জিযিয়া প্রদান সাপেক্ষ তারা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অমুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা জিম্মা চুক্তি দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত। জোর করে তাদের উপর ইসলাম ধর্ম চাপিয়ে দেয়া বৈধ নয় এবং তাদের উপর ইসলামের হুকুম-আহ্কামও অর্পিত হয়না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মে প্রবেশ না করে। উদাহরনস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তিকে জোর করে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করানো হয় এবং পরবর্তীতে সে এটা মেনে নেয় (স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে) তার উপর ইসলামী হুকুম-আহ্কাম অর্পিত হবে কিন্তু সে যদি তার ধর্মে ফিরে যায় তবে তাকে হত্যা করা যাবে না এবং জোর করে পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করানো বৈধ হবে না।

এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাব, অমুসলমানদেরকে পরিস্থিতি অনুযায়ী জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাকে ইসতিহসানের ভিত্তিতে বৈধ বলে রায় দিয়েছে। তবে তাদের কাছে এটা কিয়াসের ভিত্তিতে বৈধ নয়। বলা হয়েছে যদি তারা কুফরীর দিকে ফিরে যায় সেক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ নয় তবে ইসলামে থাকার জন্য ও জোর করা যাবে।

অমুসলমানদেরকে জোর করে ইসলামে প্রবেশ না করানো এবং তাদেরকে নিজ নিজ ধর্মে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ ও

ইজমা স্পষ্ট বিধিমালা বর্ণনা করেছে । নিম্নে পর্যায়ক্রমে এ গুলি আলোচনা করা হলো।

ক. আল-কোরআন:

আল্লাহ্ পাক বলেন, "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবর দস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে"(বাকারাহ্: ২৫৬)। মুসলিম মনীষীরা এ আয়াত নিয়ে মত পার্থক্য করেছেন। এদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, আয়াতটি কেতালের (হত্যা বা জিহাদের) আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রহিত হয়ে যায়। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন, "হে নবী, কাফের ও মুনাফেকদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন।" ইবনে মা'সুদ ও অনেক মুফাসসির এই মত পোষন করেন। আবার কাতাদাহ্, হাসান ও শা'বীসহ কতিপয় মুফাসসির বলেন, এই আয়াতটি শুধুমাত্র আহলে কিতাব বিশেষকরে জিযিয়া প্রদান কারীদের জন্য নির্দিষ্ট। এ ছাড়া আরো অনেকে বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি রহিত হয় নাই এবং বিশেষ কোন কারণে নাযিলও হয় নাই। তাঁরা বলেন যে, আল্লাহ্ পাক কাউকে জবরদস্তি বা চুক্তির মাধ্যমে ঈমান আনতে বলেন নাই বরং। আল্লাহ্ কারো ঈমান গ্রহণ করার ব্যাপারটি সম্পূর্নরূপে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ক্ষমতার উপর ছেড়ে দিয়েছে। তাঁরা বলেন, আল্লাহ্ পাক যখন তাওহীদের বাণীকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এ বর্ণনার পরও যদি কেহ ইমান গ্রহণ না করে তবে সে সম্পূর্নরূপে কাফের বা অবিশ্বাসীরূপে গন্য হবে। তাকে ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে জোর করা বৈধ হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাক বলেন, "বলুন! সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি জালেম বা কাফেরদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি...।" কাজেই কোন অবস্থায় জিম্মি বা অমুসলমানদের জোর করে ইসলামে প্রবেশ করানো বৈধ নয়। কেননা যারা বলেন যে, উপরোক্ত আয়াতটি মানসুখ বা রহিত হয়েছে তাদের মতটি ঠিক নয় কারণ কেতাল বা হত্যার আয়াতটি সত্যিকার অর্থে রহিত হয়েছে এবং ইসলামীরাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানদেরকে বিনা কারণে হত্যা করা বৈধ নয়। সর্বশেষ দলের মতটি হচ্ছে, জিম্মি চুক্তির অধীনে অমুসলমানরা জিযিয়া প্রদান সাপেক্ষে শরীয়তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাক বলেন, "তোমরা যুদ্ধ

কর আহলে কিতাবের ঐ সব লোকদের সাথে যারা আল্লাহ্ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্ ও তার রাসুল (স:) যা হারাম করে দিয়েছেন তা হরাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে"(তওবাহ্ -২৯)।

এই আয়াত প্রমান করে যে, অমুসলমানদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে জোর করা বৈধ নয় এবং জিম্মা চুক্তিভুক্ত লোকদের হত্যা করাও নিষেধ। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ সাপেক্ষে তাদের কাছ থেকে আল্লাহ্পাক জিযিয়া নেয়ার ও তাদের ধর্মে বা বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ দিয়েছেন।

খ. সুন্নাহ্:

সুলাইমান তার পিতা বুরাইদাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল(স:) যখন কোন নেতা বা সেনাপতিকে জিহাদে প্রেরণ করতেন, তখন রাসুল (স:) তাকে এই মর্মে নছিহত করতেন যে, তোমরা আল্লহ্কে ভয় করবে এবং তোমাদের সাথে যারা আছেন তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করবে। অত:পর তিনি বলেন, যদি তুমি তোমার কোন মুশরিক বা অমুসলিম শত্রুর সাথে মোলাকাত কর তখন তাকে বা তাদেরকে তুমি তিনটি বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটির দিকে আহ্বান করবে: তাকে ইসলামের দাওয়াত দাও যদি তার জওয়াব দেয় তা গ্রহণ কর এবং তাকে বা তাদেরকে হত্যা কর না। যদি প্রত্যাখ্যান করে তখন তাকে বা তাদেরকে জিযিয়া প্রদানের আহ্বান কর যদি ইতিবাচক জওয়াব দেয় তা গ্রহণ কর এবং তাকে বা তাদেরকে হত্যা কর না আর যদি জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় তখন তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা কর এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা কর।" আলোচ্য হাদিসে চুক্তিবদ্ধ অমুসলমানদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্মে থাকার ও তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্য পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতিও রয়েছে।

গ. ইজমা: ✓

ফকিহ্গণ সর্ব সম্মতিক্রমে ঐকামত পোষন করেছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থানকারী জিম্মিদের ধর্মীয় বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ বা বিরোধীতা করা যাবে না এবং তাদেরকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করা ও বিনা কারণে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে তারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার ও রাষ্ট্রীয় হুকুম-আহ্কাম পালনে বাধা

থাকবে।

উপরোক্ত আলোচনা ছিল অমুসলমানদের স্ব স্ব ধর্মে অবস্থানের ব্যাপার নিয়ে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঐ সব অমুসলমান যদি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে কি হুকুম ? যদি তারা ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে বাঁধা দেয়া যাবে না কারণ ইসলামে দিক্ষীত হওয়া প্রতিটি সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় অধিকার এবং ইসলাম গ্রহণ করা তার জন্য ফরয। এ পথে কেহ বাঁধার সৃষ্টি করলে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অভিসম্পাৎ।

ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অমুসলমানদের নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম অবলম্বন করা সম্পর্কে আলেমগণ পৃথক পৃথক দু'টি মত প্রকাশ করেছেন:

প্রথমত: মালেকী, হনাফী, শাফেঈ ও যায়েদী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, অমুসলমানরা নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মেদীক্ষিত হতে পারে এবং সেখানে মুসলমানদের হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। যেমন কোন ইহুদী-খৃষ্টান বা বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে পারে আইনগত কোন বাঁধা নাই কেননা সমস্ত কুফর জাতি এক। তবে ইসলামে 'মুরতাদের' স্থান অন্যান্য কুফর জাতি থেকে আলাদা। শরীয়তে তার জন্য রয়েছে বিশেষ হুকুম। তার জন্য দু'টি পথ খোলা রয়েছে হয় তাকে ইসলামে পুনরায় ফিরে আসতে হবে তনুবা মৃত্যুদন্ডকে মাথা পেতে নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত: শাফী, হাম্বলী, ও জাহেরী মাযহাবের ওলামাগণ বলেন, যদি কোন জিম্মী (অমুসলমান) তার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ তার স্বীকৃতি দিবে না। এখানে আলেমগণ তিনটি মত পোষণ করেছেন।

ক. কোন অমুসলামন তার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে ইসলামী রাষ্ট্রে তার স্বীকৃতি দিবে না। যেমন আহলে কিতাবে কোন লোক মূর্তিপূজা বা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলে তা স্বীকৃতি পায় না। কেননা মূর্তি পূজা বা বৌদ্ধ আসল নয়। যদি তারা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে যেতে চায়, সেখানে তাদের জন্য ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না।

খ. ইসলাম বা সে পূর্বে যে ধর্মে ছিল নাই গ্রহণীয় হতে পারে অন্য কোন ধর্ম নয় কেননা এই উভয় ধর্মের উপর ভিত্তি করে তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

গ. তার কাছ থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণীয় হতে পারে
...র কেননা এই ধর্মই আল্লাহর কাছে একমাত্র সত্য ধর্ম। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক
...লেন, "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ
...রা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ।"

জাহেরী মাযহাবের আলেমগণ আর একটু বাড়িয়ে বলেন, কোন জিম্মী বা
...মুসলমানকে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম করতে দেয়া যাবে না। তাকে ইসলামের
...উপর অথবা তার নিজ ধর্মে বহাল থাকার জন্য বাধ্য করা হবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, অধিকাংশ আলেমদের
...মতটি গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ অমুসলমানরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে অন্য যে
...কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। তাদের কাছে সকল ধর্মই সমান এবং আল্লাহর
...কাছেও সকল কুফর জাতি এক হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাকী মতগুলো এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, সেখানে অমুসলমানদের
...ইসলাম ধর্ম বা তাদের পূর্ব ধর্মে থাকার ব্যাপারে বাধ্য করা হয় যা কোরআনের
...আয়াতের পরিপন্থী। যেমন আল্লাহ বলেন, "ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই"
(বাকারাহ্ ২৫৬)। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম মতটি সব সময়
...বাস্তবায়ন হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ: ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা, ইহাকে আমরা দুইটি
...ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন:

ক. ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি পালনের স্বাধীনতা :

মুসলিম মনীষী বা আলেমগণ সর্ব সম্মতিক্রমে (ইজমা) ঐকামত পোষণ
...করেন যে, মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি
...পালন ও উপাসনালয়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে একমাত্র ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া
...কোন রকম হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয় কেননা জিম্মী চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানরা এসব
...ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছে। যে সব ধর্ম-কর্ম বা আচার অনুষ্ঠান মুসলমানদের
...জন্য ক্ষতিকর তা অমুসলমানদেরকে প্রকাশ্যে ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব গন্ডির
...মধ্যে পালন না করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করার হুকুম আছে। সে সব
...বিষয়ে মুসলিম মনীষীগণ কতগুলো শর্ত আরোপ করেছেন:

১. ক্রশ বা এই জাতীয় চিহ্ন প্রকাশ্যে ব্যবহার করা যাবে না কেননা ইহা
...কুফরী ধর্মকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নেয়াকে বুঝায়। ইহা পরোক্ষভাবে মূর্তীপূজার

শামিল। আর মূর্তি পূজা উচ্ছেদের জন্যই ইসলামের আগমন। কাজেই কোন গীর্জা বা অন্য কোন উপাসনালয়ের উপর ক্রশ বা এই জাতীয় কোন প্রতীক রাখা যাবে না। এর পিছনে অন্য আর একটি কারণ হচ্ছে এই জাতীয় প্রতীক টানিয়ে রাখার ফলে মুসলমানরা ও ইসলাম ধর্ম হেয় পতিপন্ন হয়।

২. তাদের বাতিলকৃত কিতাব মুসলিম সমাজে প্রকাশ্যে তিলাওয়াত করা, বা আওয়াজ তুলে (মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর) শিঙ্গা ফুকানো যাবে না।

৩. উজায়ের (আঃ) ও ইসা (আঃ) আলাহর পুত্র বা আল্লাহ তিনজন বা এই রকম কিছু প্রকাশ করে মুসলিম সমাজে প্রচার করা যাবে না। অবশ্য তাদের নিজেদের গন্ডির মধ্যে পারবে।

৪. মুসলমান সমাজে বা হাটবাজারে প্রকাশ্যে মদ ও শুকরের গোস্ত বিক্রি করা যাবে না। তারা এসব তাদের নিজেদের মধ্যে করতে পারবে। মুসলমানদের চরিত্র ও আকিদা খারাপ বা বিকৃত হয়ে যাওয়ার আশংকা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এসব নিষেধাজ্ঞা করা হয়।

যদি অমুসলমানরা কোন মহল্লা, গ্রাম বা শহরে এককভাবে বাস করে সেখানে তারা তাদের ধর্ম কর্ম প্রকাশ্যে পালন করতে পারবে, যেমনটি তারা তাদের গীর্জা বা মন্দির চত্বরের মধ্যে পালন করে থাকে। হাম্বলী মাযহাব, বিজিত দেশ বা মুসলমানদের আবাদকৃত (প্রকৃত মুসলিম দেশ) দেশ ও চুক্তিবদ্ধ দেশ বা এলাকার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে বলেছে যে বিজিত বা প্রকৃত মুসলিম দেশে অমুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে বিশেষভাবে তাদের ধর্মের প্রকাশ্য প্রচার নিষেধ। আর চুক্তিবদ্ধ এলাকায় চুক্তির শর্তানুযায়ী ধর্মীয় রীতি-নতি পালন করার অনুমতি রয়েছে। মালেকী মাযহাব কোন পার্থক্য না করেই অমুসলমানদের ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন, বিশেষ করে প্রচার মূলক কাজ প্রকাশ্যে নিষেধ করেছে, তবে তারা নিজেদের মধ্যে এ কাজ করতে পারবে।

খ. উপাসনালয়ের নিরাপত্তা:

ওলামাগণ ইজমার ভিত্তিতে একমত হয়েছেন যে, অমুসলমানদের উপাসনালয়ের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না। কেননা উপাসনালয়সমূহ তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার একটি অংশ। ইবনুল কাইয়্যেম পবিত্র কোরআন থেকে একটি আয়াতে উল্লেখ করে এর প্রমাণ দেন। আল্লাহ পাক বলেন, " আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে (খৃষ্টানদের)

...গীর্জা এবাদতখানা ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে ... সেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয় "(হজ্জ-৪০)।

এই আয়াতে শুধুমাত্র মসজিদসমূহের কথা বলা হয় নাই। অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ের কথাও উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যদি এক জাতির ...সহযোগিতা দ্বারা অপর জাতিকে রক্ষা বা প্রতিহত না করতেন তবে ...মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয়সমূহ ধ্বংস হয়ে যেত। ইবনুল কাইয়্যেম ...বলেন, ইসলাম আসার পূর্বে ঐসব ইবাদত গাহ আল্লাহর কাছে প্রিয় ছিল এবং সেখানে আল্লাহর স্মরণ করা হত। আল্লাহ সেগুলো স্বীকার করে নিয়েছেন যেমনটি জিম্মিদেরকে (অমুসলিম) স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের দ্বারা তাদের প্রতিরক্ষা ও রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে তাদের ইবাদতসমূহকেও মুসলমানদের দ্বারা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এর থেকে সহজেই অনুমেয় যে, অমুসলমানদের ধর্মীয় উপাসনালয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয় নাই বরং এ সবের রক্ষার দায়িত্বও মুসলমানদের উপর অর্পিত। এমনকি বিনা অনুমতিতে তাদের উপাসনালয় প্রবেশ করা ঠিক নয়। যদি এই সব উপাসনালয় যুদ্ধ সন্ত্রাসীকাজের জন্য ব্যবহার হয় তখন অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করা যাবে।

এখানে ফকিহ্গণ আরো বলেনে যে, যে সব এলাকা বা দেশ মুসলমানরা আবাদ করেছে বা মুসলিম অধ্যুষিত সেখানে নতুন করে কোন গীর্জা, বা মন্দির বা অন্য কোন উপাসনালয় নির্মাণ করার সুযোগ নেই এবং পুরাতন থাকলে বা নির্মাণ করা হচ্ছে এরকম উপাসনালয়ও ধ্বংস করার অনুমতি শরিয়তে নেই। তবে ইমাম (ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ) পরিস্থিতি মোতাবেক ইচ্ছা করলে ঐসব এলাকায় অমুসলিমদের থাকার অনুমতি দিতে পারেন কিন্তু নতুন কোন উপাসনালয় নির্মাণের অনুমতি দিবেন না।

যে সব এলাকা কাফের বা অমুসলমানরা আবাদ করেছে কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানরা জয় করেছে বা চুক্তির মাধ্যমে হস্তগত করেছে সে সব এলাকায় ইমাম (ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ) অমুসলিমদের জিম্মি করে জিযিয়ার আরোপ ও খারাজ ধার্য করবেন, কিন্তু তাদের উপাসনালয় নির্মাণসহ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে নিষেধ করবেন না, যদিও সেখানে মুসলমানরা (সংখ্যালঘু) ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করছে।

শাফেঈ মাযহাবের আলেমগণ এর বিরুদ্ধে মত দিয়ে বলেন, ঐসব এলাকায় বিধর্মীদের কোন উপাসনালয় (নতুন) নির্মাণ করা যাবে না। কেননা, উক্ত ভূখন্ড মুসলমানদের করতলগত হয়েছে এবং সেখানে মুসলমানদের ধর্মীয়সহ সকল ক্ষেত্রে আধিপত্য থাকবে। তবে উক্ত ভূখন্ডের উপর পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত উপাসনালয়সমূহ বহাল থাকবে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত উপাসনালয়: যে সব উপাসনালয় সময়ের ব্যবধানের ফলে বা প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে বা অন্য কোন কারণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সে সব উপাসনালয়কে মেরামত বা পুন:নির্মাণ করে দেয়ার ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে।

ক. অধিকাংশ মুসলিম মনীষী মেরামত বা পুনঃনির্মাণ করে দেয়ার ব্যাপারে মত দিয়েছেন। তারা বলেন বিধর্মীদের ধর্মীয় উপাসনালয়সমূহকে স্বীকার করে নেয়ার অর্থ হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ উপাসনালয়গুলোকে প্রয়োজনবোধে পুনঃনির্মাণ বা মেরামত করে দেয়া।

খ. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ এর বিপরীতে মত দিয়ে বলেন ঐসব উপাসনালয়সমূহকে চিরস্থায়ীভাবে স্বীকার করে নেয়া হয় নাই। বরং এর স্থায়ীত্ব ততদিন, যতদিন এটা ধ্বংস না হয়। কাজেই ধ্বংস হয়ে গেলে নতুন করে বানিয়ে দেয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। এ ছাড়াও ঐসব এলাকা মুসলমানরা জয় করে হস্তগত করেছে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলবে সেখানে তাদের কোন অধিকার সৃষ্টি হয় না। আলোচ্য বিষয় ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে শরিয়ত বা ইসলামের সুস্পষ্ট নীতিমালার অধীনে শুরু থেকেই অমুসলমানরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা করে আসছে। খুলাফা-ই-রাশেদার যুগ থেকে ১৯২২ সালে তুরস্কের আতাতুর্ক কামাল পাশার হাতে ওসমানিয়া খেলাফতের পতন পর্যন্ত ইসলামী শাসনের অধীনে অমুসলমানরা ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ সব বিষয় পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করেছে। উপমহাদেশের মুঘল শাসকরা অমুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে শুধু স্বাধীনতা নয় বরং পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। পরবর্তীতে মুসলমান শাসকরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন দিকে ক্ষতিসাধন করেও অমুসলমানদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। মুসলিম শাসকরা অমুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত উপাসনালয়েরও মেরামত বা পুন:নির্মাণ করে দিয়েছেন। মুসলিম শাসকরা অমুসলমানদের উপরে কোন ব্যাপারে চাঁপ সৃষ্টি

...করেছেন এমন নজির ইতিহাসে নেই।

...নিরাপত্তার অধিকার:

নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারের অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, সম্মান ও ...তিপত্তির নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তা বিধান করা এবং তার শরীর, মাল-সম্পদ ও ...সম্মানকে যে কোন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যাতে করে সে সমাজে শান্তির ...সাথে বসবাস করতে পারে। সমাজে বসবাসকারী কোন ব্যক্তির উপর জুলুম-নিপীড়ন, তার সম্মান ও সম্পদের ক্ষতি না করার জন্য শরীয়াহ্ কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এর বিপরীতকে শরীয়াহ্ পৃথিবীতে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি বলে বর্ণনা করেছে। এ জন্য শরীয়াহ্ রাষ্ট্রকে সকল প্রকার অন্যায়, নিপীড়ন ও অনিষ্ট হতে ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য সকল প্রকার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করত: অন্যায়কারীকে উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা দিয়েছে। আর এভাবে ইসলাম মানুষকে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনের সকল স্তরে নিরাপত্তা বিধান করে। অন্য কথায় বলা যায় যে, ইসলাম সকল মানুষের যাবতীয় নিরাপত্তার জিম্মাদারী নিয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্র মুসলমানদের জন্য যেভাবে নিরাপত্তার জিম্মাদারী নিয়েছে অমুসলমানদের জন্যও অনুরূপ জিম্মাদারী গ্রহণ করবে কারণ তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরীক। নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বেশ কয়েকটি আয়াত রয়েছে। যেমন, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন, "আল্লাহ্ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না" (ফুরকান-৬৮)। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে বা যারা বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে পছন্দ করেন না" (বাকারাহ-১৯০)।

আলোচ্য আয়াত দুটিতে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন আত্মাকে হত্যা করা ও জুলুম-নিপীড়ন করাকে হারাম করা হয়েছে। এই হারাম বা নিষেধাজ্ঞার অর্থ হচ্ছে ইসলামী সমাজে বসবাসকারী সকলের জন্য নিরাপত্তার বিধান রয়েছে। আয়াতের 'নফস' শব্দটি একটি সাধারণ শব্দ যার মধ্যে মুসলিম অমুসলিম সবাই শামিল রয়েছে।

আলেমগণ 'তাদের জিম্মাদারী আমাদের উপর এবং তারাও আমাদের মত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে' এই নীতির উপর ভিত্তি করে অমুসলমানদের নিরাপত্তার বিধান নির্ধারন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসুল (স:) এর বাণী হচ্ছে, " যে

ব্যক্তি কোন জিম্মিকে কষ্ট দেয় আমি তার জন্য বাদী হব এবং আমি যার জন্য বাদী হব কিয়ামতের দিন তার অধিকার আদায় করে নিব।"

অমুসলমানদের ব্যাপারে রাসুল (স:) এর অছিয়তের আলোকে ফকিহ্গণ তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান ও অন্যান্য বিপদ বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীনভাষায় কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন, কোন খারাপ কথা না গিবত যা সম্মানের ক্ষতি করে এমন কোন কথা বা কাজ দ্বারা অমুসলমানদের কষ্ট দেয়া যাবে না। ইসলাম মানুষের সম্মান ও মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করেছে। হযরত ওমর (রা:) তাঁর গভর্ণরদেরকে ন্যায় বিচারকের বিচার ছাড়া কোন লোককে প্রহার বা ভৎসনা না করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরূপভাবে তিনি যে ভাবে গভর্ণর প্রজাদের সাথে আচরণ করেন প্রজাদেরকেও গভর্ণরদের সাথে অনুরূপ আচরণ করার নির্দেশ দেন। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি শাসকদেরকে বিনা কারণে প্রজাদের সাথে অন্যায় আচরণ না করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর জন্য তিনি শাস্তিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কথিত আছে যে মিসরের গভর্ণর আমর ইবন আ'স একজন মুসলমানের উপর মুনাফিকির অপবাদ দেন; অত:পর ঐ ব্যক্তি হযরত ওমর(রা:) এর নিকট অপবাদের অভিযোগ আনেন। ওমর (রা:) ভিত্তিহীন অভিযোগের কারণে আমর ইবন আ'সকে শাস্তি প্রদানের আদেশ করেন বলেন কিন্তু ঐ ব্যক্তি একজন শাসককে শাস্তি দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না বিধায় তাকে ক্ষমা করে দেন। ফকিহ্গণ তাদের এই অধিকারকে মুসলমানদের উপর কর্তব্য (ওয়াজিব) বলে বর্ণনা করেছেন যা ইসলামী প্রশাসন বাস্তবায়ন করে থাকে। জিম্মা চুক্তির কারণেই মুসলমানদের উপর এসব অধিকার বাস্তবায়ন ওয়াজিব হয়ে পড়ে কেননা চুক্তি সম্পাদনের পর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের জান-মাল ও সম্মান পবিত্র হয়ে যায়। শরহ্ সিয়ার আল কাবির গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, আহলে জিম্মা আমাদের অধিবাসী এবং তারা ইসলামী হুকুম-আহকামের অধীন, কাজেই মুসলমানদের ন্যায় তাদেরকেও সাহায্য সহযোগিতা করা ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এ প্রসঙ্গে আল্লামাহ্ সারাখসী তাঁর মাবসুত গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের রক্ষণা-বেক্ষণের ন্যায় অমুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষনা-বেক্ষণের দায়িত্ব মুসলমানদের উপর।

ইমাম শা'ফেই তাঁর আল-উম্মু গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রে

আমাদের সাথে যখন আহলে জিম্মা বসবাস করে তখন তাদেরকে ও তাদের জান-মালের হেফাজত আমাদের জান-মালের অনুরূপ হেফাজত করতে হবে।

ইবন কুদামাহ্ বলেন, যখন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন জিম্মা চুক্তি সম্পাদন করে তখন সে চুক্তি অনুযায়ী তাদেরকে মুসলমান বা কাফেরদের হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তায়।

শিয়া সম্প্রদায়ও উপরোক্ত মতের সাথে ঐকামত পোষণ করে। এ প্রসঙ্গে জাওয়াহির আল যিথার' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানদের জান-মাল রক্ষার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর। ফকিহ্গণ ঐকামত পোষণ করেছেন যে, জিম্মা চুক্তির মাধ্যমে অমুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান করা ইসলামী প্রশাসনের উপর বর্তায়। কিন্তু যদি কোন জিম্মি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতিত অন্য কোন রাষ্ট্রে বসবাস করে সেক্ষেত্রে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব কার উপর? এ প্রসঙ্গে শা'ফেই মাজহাব ও যায়েদীয়া সম্প্রদায় বলে যে, ইসলামী রাষ্ট্র তাদের কোন নিরাপত্তা দিবে না যদি না ঐ ব্যাপারে চুক্তিতে কোন শর্ত উল্লেখ থাকে। কিন্তু অন্যান্য মাজহাব ভিন্নমত প্রকাশ করে বলে যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করুক বা না-ই করুক সর্ব অবস্থায় তাদের হেফাজত করতে হবে কেননা তারা চুক্তির মাধ্যমেই হেফাজত পাওয়ার অধিকার দাবী করতে পারে। তাদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে এমন নয়; আলাপ-আলোচনা ও কূটনৈতিক উপায় রক্ষা করা যায় যা বর্তমান যুগে খুবই সহজ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা:

এর অর্থ হচ্ছে কোন লোক তার চিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন; অন্য কারো অধীন বা আজ্ঞাবহ নহে এবং তার ঐ চিন্তাকে প্রকাশ (মত প্রকাশ বলা হয় যাকে) করার ব্যাপারে নিজস্ব স্বাধীনতা আছে। এ ব্যাপারে রাসুল (সঃ) বলেন, "তোমার মধ্যে এমন কেহ নাই যার নিজস্ব কোন চিন্তা ও মতামত নাই। অতঃপর তিনি বলেন মানুষ যা কল্যাণকর মনে করে তা ভালো যা অকল্যাণকর মনে করে তা খারাপ কিন্তু তোমার মানুষের ভালোগুলো আকঁড়ে ধর ও খারাপ থেকে দূরে থাক (বিরত থাক)।"

আলোচ্য হাদীসটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলেছে অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব মতামত ও চিন্তা ধারা থাকতে পারে যদি ও তার মতামত ও

চিন্তাধারা সংখ্যাগুরু জনগণ থেকে আলাদা হয়। এছাড়া বলা হয়েছে যে, মানুষ যেন সত্য ও সুন্দরকে আকঁড়ে ধরে এবং ধর্ম ও সামাজিক কল্যাণ বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক চিন্তা ধারা থেকে দূরে থাকে। ইসলামের এই স্বাধীনতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মত বা চিন্তাধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীবের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এখানে সাহাবী সালমান ফারসী (রাঃ) এর কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি রাসুলে (সঃ) কে মদীনাকে রক্ষার জন্য মদীনার উপকণ্ঠে আহযাবের যুদ্ধে পরিখা খননের ব্যাপারে তার মতামতকে ব্যক্ত করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার মতামতকে প্রশংসার সাথে গ্রহণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেছেন। এ ছাড়াও ইসলামে স্বাধীনভাবে মতামত ও চিন্তাধারা প্রকাশের প্রমাণ রয়েছে। যেমন রসুল (সঃ) এর ওফাতের পরে খলিফা (প্রতিনিধি) নির্বাচনের ব্যাপারে আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যে স্বাধীনভাবে আলাপ আলোচনা ও মতামত বিনিময় হত।

মুসলমানদের জন্য ইসলাম এইরূপ স্বাধীনতা প্রদান করে যা তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য করতে পারে এবং অমুসলমানদের ও অনুরূপ স্বাধীনতা রয়েছে তবে শর্ত যে, অমুসলমানদের মতামত ও চিন্তার স্বাধীনতাকে প্রকাশের ব্যাপারে শরীয়তে স্পষ্টভাবে কোন নিষেধবাণী নাই। কাজেই তারা তাদের বিষয়াদি নিয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে তবে, শরীয়ত সম্পর্কিত ও ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ আইন কানুনের ব্যাপারে কোন বিরূপ মতামত প্রকাশ করতে পারবে না। উদাহরণ স্বরূপ-মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন কথা বলার অধিকার তাদের নাই।

বর্তমান যুগে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশে অমুসলমানরা চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করছে। মুসলিম দেশগুলো বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮) চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ১৯নং অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজ নিজ দেশের সংবিধানে এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার সংবিধানের (১৯৭২) ৩৯নং অনুচ্ছেদে মতপ্রকাশের ব্যাপারে নিম্নরূপ বিধান সংযোজন করেছে। যেমন :

1. "Freedom of any thought and conse[illegible]ce is guaranteed."
2. Subject to any reasonable restrictions imposed by law in the

interests of the security of the state friendly relations with foreign states, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation, or incitement to an offence: the right of every citizen to freedon of speech and expression and ...
Freedom of the press are guaranteed.

...বিধানের উপরোক্ত ধারাটি সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য।

...প্রকাশের সীমাবদ্ধতা :

ইসলাম কিছু সীমাবদ্ধতা (Restriction) রেখে চিন্তা ও মতামত ...শের স্বাধীনতা দিয়েছে অন্যথায় ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন ফেতনা ও ...ংখলার সৃষ্টি হয়। অতএব ইসলাম সমাজে ফেতনা, ফসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি ...র এমন কোন বিকৃত মতামত বা চিন্তাধারাকে কখনো স্বীকৃতি দেয় নাই। শুধু ...লাম নয় মানব রচিত বিভিন্ন আইনেও চিন্তা ও মতপ্রকাশে নিরংকুশভাবে ...ধীনতা দেয়া হয় নাই। প্রতিটি দেশের জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের ধর্মীয় ...র-অনুষ্ঠান ও প্রথার দিকে লক্ষ্য রেখে ও সামাজিক কল্যাণের জন্য মত ...শের স্বাধীনতার ব্যাপারে নিম্নোক্তরূপ কতিপয় নীতিমালা রয়েছে।

১. যদি কোন চিন্তাধারা বা মতামত চরিত্র ও নৈতিকতা বিবর্জিত হয়, ...শের প্রচলিত (ইসলামী আইন হোক অথবা মানব রচিত আইন হোক) আইন ...রোধী হয় অথবা কোন কল্যাণমুখী কাজের বিপরীত হয় তা প্রকাশ করা যাবে ...। এভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে কেহ যদি কোন ফেতনা ও সন্ত্রাসী ...জের কারণ সৃষ্টি করে তা শুরুতেই বন্ধ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে গাজ্জালী বলেন, ...চিন্তা বা মতামত সমাজে শত্রুতা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং নৈতিকতা পরিপন্থী ...র তা প্রকাশ করা নিষেধ করা এবং এ সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। এ প্রসঙ্গে ...রত ওসমান (রাঃ) এর সাথে আবু জার গিফারীর ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

২. চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে ভিত্তিহীন কোন কথা বলা ...প্রকাশ করা যাবে, না যা মানুষকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ইমাম ...যেঈ বলেন, যদি মানুষ জানত তার ভিত্তিহীন কথাবার্তায় কি ভয়াবহ পরিনাম ...র তবে মানুষ সিংহ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য যেভাবে পলায়নপর হয় তার ...চেয়েও বেশী হত।

৩. ইসলাম মানুষের সুখ্যাতি ও সম্মানকে রক্ষার জন্য কঠোরভাবে বলেছে। প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা সম্মান রয়েছে। কাজেই কারো সম্মানে আঘাত দিয়ে কোন কথা বলা বা লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না। যদি এরূপ কেহ করে তবে তার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাস্তি রয়েছে এবং পরকালেও শাস্তি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'যারা পছন্দ করে যে ঈমানদারদের মধ্যে অপকর্ম প্রসার লাভ করুক তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে' (সূরা আননূর-১৯)। এ ব্যাপারে দেশের 'মানহানী' শিরোনাম আইনে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

৪. চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে অহেতুক ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক করা নিষেধ। এ ছাড়া সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যদিও তাতে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে (৩৯ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪. সভা-সমাবেশ করার অধিকার :

সভা-সমাবেশ করার অধিকার বলতে জনগণকে বা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা সংগঠনের লোককে বা কোন সম্প্রদায়কে সাধারণ স্থানে (Public place) একত্রিত হয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেয়াকে বুঝায়। শরীয়াহ কোন মহৎ কাজ বা নির্দিষ্ট কোন ব্যাপারে একত্রিত হয়ে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছে। যেমন রাসুল (সঃ) এর ওফাতের পর মুসলমানদের খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে আনছার ও মুহাজিররা বনী সাআদার সাকিফাতে একত্রিত হয়ে নিজেদের মতামতকে প্রকাশ করেছিলেন।

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সভা-সমাবেশ করার যেরূপ স্বাধীনতা বা অধিকার রয়েছে অনুরূপভাবে অমুসলমানদের জন্য তাদের নিজ ধর্ম বা নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে জড়িত বিষয়াদির ব্যাপারে সভা-সমাবেশ করার অধিকার বা স্বাধীনতা রয়েছে কেননা তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী। অমুসলমানদের উপরোক্ত বিষয় সভা-সমাবেশ করার ব্যাপারে শরীয়তে এমন কোন বাধা নিষেধ নাই তবে নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া ইসলাম ধর্ম বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বা ইসলামী রাষ্ট্রের আইন কানুন ও প্রশাসন (Public Administration) বিরোধী কোন সভা-সমাবেশ করতে পারবে না।

বর্তমান যুগে অমুসলমানরা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশে ...অধিকার ভোগ করছে। বাংলাদেশের সংবিধানের (১৯৭৩) ৩৭নং অনুচ্ছেদে ...রয়েছে যে, Every citizen shall have the right to assemble and to ...icipate in public meetings and processions peacefully and with... arms, subject to any reasonable restricitions imposed by law in ...e interest of public order or public health.

বাংলাদেশের সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের সাথে জাতিসংঘের ...মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮) এর ২০নং অনুচ্ছেদের সামঞ্জস্য রয়েছে। ...যেমনঃ

(1) Every one has the right to fredom of peaceful assembly and association

(2) No one may be compelled to belong to an association.

বিশ্ব মুসলমান, অমুসলমান সকলের জন্য প্রযোজ্য তবে এক ধর্ম বা ...প্রদায়ের লোক অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সমাবেশ করতে পারবে না। ...রণ এর মাধ্যমে ধর্মীয় বা গোত্রগত সম্প্রীতি থাকে না যার ফলে সমাজে ...শৃংখলা দেখা দেয়।

...ভা-সমাবেশ করার সীমাবদ্ধতা :

ইসলাম সকলের জন্য সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দিয়েছে ঠিক তবে ...কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছে অর্থাৎ সমাজের স্বার্থে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দেয়া ...য় নাই। সভা-সমাবেশ যদি জনগণের শান্তিশৃংখলা (Public Tranquility) ...বিনষ্ট করে অথবা ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে অথবা ন্যায়ানুগ কোন সরকারকে ...উৎখাত করার চেষ্টা করে, তবে তার উপরে বিধি নিষেধ আরোপ করা যাবে। ...প্রয়োজনবোধে শক্তি প্রয়োগ করে দমন করার অনুমোদন রয়েছে।

...দ্বিতীয়ত: শান্তি শৃংখলা নষ্ট হয় এমন কোন অস্ত্র শস্ত্র জন সমাবেশে বহন করা ...যাবে না। অস্ত্র সজ্জিত জন সমাবেশকে নিরস্ত্র বা ভঙ্গ করে দেয়ার অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে।

তৃতীয়ত: ধর্মীয় বিশ্বাস বা কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রথাক বা আচার-অনুষ্ঠানের

বিরুদ্ধে জন সমাবেশ করা যাবে না।

চতুর্থত: প্রশাসনিক কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বা দেশের ভিতরে কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় অথবা পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে অহেতুক যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় এমন কোন জন সমাবেশ করা যাবে না।

শরীয়তের এই বিধি-নিষেধের সাথে অধিকাংশ মুসলিম দেশের সাংবিধানিক আইনের সামঞ্জস্য রয়েছে।

৫. শিক্ষার অধিকার :

শিক্ষার অধিকারের অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তির পছন্দ মত বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করা বা জ্ঞান অর্জনের স্বাধীনতা। এই অধিকার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কেননা চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করার জন্য শিক্ষা বা জ্ঞান হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন (Manifestation)।

শিক্ষা অর্জনের অধিকারের অর্থ যদি হয় শিক্ষা অর্জনের স্বাধীনতা তা হলে তা অর্জন প্রতিটি নাগরিকের অধিকার আর এ জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবে। তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন শিক্ষা হিসেবে চালু করতে হবে এবং রাষ্ট্রকে তার সকল ভার বহন করতে হবে। ডঃ আব্দুল হাকিম তাঁর ' আল হুররিয়াত আম্মাহ্ ' গ্রন্থে বলেন, রাষ্ট্রীয় তত্ত্বধানে শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে করে শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাস সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত হয় আর নাস্তিকাবাদকে মানুষের অন্তর থেকে মুছে ফেলা যায়। এ লক্ষ্যেই সরকার শিক্ষাকে সমুন্নত করার জন্য সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা ইত্যাদি পৃথক পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে পারে। এভাবে শিক্ষা অর্জন করা যদি প্রতিটি লোকের স্বাধীনতা বা অধিকারে পরিনত হয় তবে তা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমানেদের জন্যও অধিকারে পরিনত হয় তবে তাদের জন্য দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে পারে: যেমন (ক) তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ব্যবস্থা এবং (খ) রাষ্ট্রীয় তত্ত্বধানে মুসলমানদের সাথে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা। তারা ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষা গ্রহনের মাধ্যমে নিজেদেরকে ও রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে পারবে। এ প্রসঙ্গে খায়বর যুদ্ধের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য অর্থাৎ খায়বর বিজয়ের পর মুসলমানরা ইহুদীদের ঘিরে ফেলার পর গনিমত সংগ্রহের সময় তাওরাতের একটি খন্ড পায়। অতঃপর রাসুল(সাঃ)

তাওরাতের সে খন্ডটি ইহুদীদের কাছে ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেন, কেননা এ খন্ডটি ফেরত দেয়ার মাধ্যমে তারা নিজেদের মাঝে শিক্ষা অর্জনের স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার পেল। কিন্তু তারা এ তাওরাত দিয়ে মুসলিম সমাজে ইহুদী ধর্ম প্রচার করতে পারবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানরা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে ও রাষ্ট্রের কল্যানের জন্য কল্যানকর চিন্তাধারা পোষন করতে পারে ও মতামত প্রকাশ করতে পারবে।

বর্তমান যুগে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলিম দেশে অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় শিক্ষাসহ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বধানে সাধারণ ও উচ্চ শিক্ষার সমান অধিকার ভোগ করছে। জাতিসংঘ তার বিশ্বমানবাধিকার ঘোষনা (১৯৪৮) এর মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে যে অধিকারের কথা বলছে তার প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলাম বিশ্বের সবার জন্য শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। শরিয়তের ঘোষণার সাথে জাতিসংঘের উক্ত ঘোষণার সাদৃশ্য রয়েছে। জাতিসংঘের বিশ্বমানবাধিকার ঘোষণা(১৯৪৮) এর ২৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে - Every one has the right to education. Education shall be free at least in the elementary and fundamental stages...... technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

৬. সম্পদ অর্জন ও রক্ষণা-বেক্ষনের অধিকার :

এর অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যায় বৈধভাবে সম্পদের মালিক হওয়া এবং উক্ত সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব শরীয়াহ্ বা ইসলামী রাষ্ট্রের উপর। মানুষের জীবন ধারনের জন্য সম্পদ একান্ত জরুরী এবং এ কারণে মানুষ সম্পদ অর্জনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণ করা শরীয়তের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কারণেই ফকিহ্‌গণ বলেন যে সৃষ্টির শুরু থেকে শরীয়াহ্ ব্যক্তিগত মালিকানাকে স্বীকার করে নিয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানার উপর হস্তক্ষেপকে শরীয়াহ্ অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। শরীয়তের এই ঘোষণা মুসলিম ও জিম্মি সকলের উপর প্রযোজ্য। কেননা অমুসলমানরা জিম্মা চুক্তির অধীনে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করছে। সুতরাং তাদের অর্জিত সম্পদের রক্ষার দায়িত্বও

রাষ্ট্রের উপর আরোপিত। এ কারণে তাদের সম্পদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে সাধারণ ঘোষণা হচ্ছে "তোমরা অবৈধভাবে নিজেদের মধ্যে সম্পদ ভক্ষণ করোনা" (নেসা-২৯)।

পবিত্র কোরআনের এই নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ হলে সেখানে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে করে সম্পদ সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়। যেমন সম্পদ চুরি হলে চোরের হাত কর্তনসহ অন্যান্য শাস্তির বিধান রয়েছে যাতে করে দ্বিতীয়বার এভাবে সম্পদের ক্ষতি না হয়। অনুরূপ ভাবে জোর করে সম্পদ হস্তগত করা হলে শরীয়াহ্ উক্ত সম্পদ আসল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়াসহ জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার অনুমতি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসুল(সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন জিম্মির উপর অত্যাচার চালায় বা তার কিছু অধিকার হরণ করে বা তার উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপায় বা তার অসম্মতি বা দৃষ্টির অগোচরে কোন কিছু হস্তগত করে আমি কিয়ামতের সময় তার জন্য সাক্ষী হব।(সহীহ্ বুখারী, ৩/২৬১, আবু দাউদ- ২/১৫২)। খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও অমুসলিমদের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদ হেফাযত করা হয়েছে। এমনকি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরও অমুসলিমদের দখলে থাকা জমি বা সম্পত্তিকে নিজ নিজ দখলে দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের কথা উল্লেখযোগ্য। একদিন হযরত ওমর (রাঃ) কোন এক ওফেদীকে ডেকে তার নিজের ও এলাকার লোকদের জান-মালের নিরাপত্তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "জিযিয়া প্রদানের বিনিময়ে জিম্মিদের রক্ত আমাদের রক্তের মত পবিত্র এবং তাদের মাল আমাদের মালের মত পবিত্র হয়ে যায়।" এর থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদা জিম্মিদের ব্যাপারে কত সচেতন ছিলেন। সবশেষে মুসলিম মনীষীগণ ঐকামত পোষণ করেছেন যে, জিম্মিদের জান-মাল মুসলমানদের জান-মালের ন্যায় পবিত্র এবং তাদের উপর কোন প্রকারে নির্যাতন করা বা অত্যাচার করা হারাম (বিদায়া ওয়া সানাঈ, আল মহল্লী, মাবসুত ও আল উম্মু)।

৭. ভোটাধিকার:

দেশের সংবিধান ও আইন মোতাবেক কোন ব্যক্তির আঞ্চলিক বা রাষ্ট্রীয় কোন বিষয়ের উপর কোন প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করা বা নিজে প্রার্থী হয়ে অন্যের কাছ থেকে এ ধরণের মতামত চাওয়াকে বর্তমান যুগে

...ধিকার বলে। এই অধিকার সবাই সমানভাবে প্রয়োগ করতে পারে। ...লামের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কোন অমুসলিম খলিফা নির্বাচনে অংশ ...ণ করেনি বা খলিফার বয়াত গ্রহণ করেনি। এটা মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ...। কারণ খলিফা নির্বাচন ছিল মুসলমানদের জন্য একটি ধর্মীয় কর্তব্য যা ...দতের সমতুল্য। একারণে অমুসলমানদের উক্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কোন ...য়োজন হয়নি (আহকাম আল জিম্মিইন ও হুররিয়া-আল-আম্মাহ)।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামেরও বিস্তৃতি ঘটে এবং এক ...ময় রোম সাম্রাজ্যের সাথে ইসলামের সংঘর্ষ লেগে যায়। তথাপি ইতিহাসে এমন ...কোন প্রমাণ নাই যে রাসুল (সঃ) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদা কোন অমুসলিমের ...সাথে পরামর্শ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী শাসকগণ অমুসলিমদের সাথে দ্বীন ও ...আকিদাহ ব্যতীত রাজনৈতিক ও পার্থিব ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেছেন।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, বর্তমান যুগে কি অমুসলিমরা দেশের ...রাষ্ট্রপতি বা সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ অথবা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ...পারবে কি না? এ সম্পর্কে আধুনিক ফকিহগণ মত ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু এ ...ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ও সুন্নায় সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই এবং ইহা একটি ...ইজতিহাদি বিষয় সেহেতু ফকিহগণ আঞ্চলিক নির্বাচনসহ সাধারণ নির্বাচনে ...অমুসলমানদেরকে অংশ গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করছেন।

এ ছাড়াও বর্তমান যুগে রাষ্ট্র প্রশাসন শরীয়াহ মোতাবেক চলছে না এবং ...যেহেতু রাজনৈতিক ও পার্থিব বিষয় সেহেতু অমুসলিমদের এতে অংশ গ্রহণ করার ...ব্যাপারে কোন কঠোর নিষেধাজ্ঞা নাই।

অনুরূপভাবে অমুসলিমরা সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে, ...তবে এখানে মুসলিম রাষ্ট্রের সংসদ নির্বাচনে বা সংসদের মোট আসনের একটি ...নির্দিষ্ট অংশ (আনুপাতিক হারে) অমুসলিমদের জন্য বরাদ্ধ থাকে সেক্ষেত্রে তারা ...তাদের নিজেদের সদস্য নির্বাচন করবে। আর এদিকটি তাদের জন্য উত্তম হবে ...কারণ তখন তারা তাদের স্বার্থ সম্পর্কে বেশী সচেতন হবে এবং প্রশাসনের কাছ ...থেকে বেশী সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে পারবে। বর্তমানে অনেক মুসলিম ...দেশে এই ব্যবস্থা চালু আছে এবং সেখানকার অমুসলিমরা অনেক বেশী অধিকার ...ভোগ করছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অমুসলিমদের কর্তব্যসমূহ

১. নিরাপত্তা কর বা জিযিয়া:

ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম বাসিন্দাদের নিকট হতে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণে জন্য আদায়যোগ্য নির্দিষ্ট পরিমান অর্থই হল জিযিয়া। এর মাধ্যমে অমুসলিমদের সাথে তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান কল্পে মুসলমানদের সাথে জিম্মা চুক্তি (Expressly or Impliedly) সম্পাদিত হয়। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই ইহা প্রচলিত হয়ে আসছে। ইহা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি অমুসলমানদের একটি পালনীয় কর্তব্য তখনই হয় যখন তারা অস্ত্র সমার্পণ করে বা বশ্যতা স্বীকার করে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা নিজ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আশ্রয় গ্রহণ করবে। বছরে একবার জিযিয়া আদায়যোগ্য। কোন জিম্মি ইসলাম গ্রহণ করলে জিযিয়া প্রদান থেকে সাথে সাথে অব্যাহতি পায়।

জিযিয়ার সংজ্ঞা:

জিযিয়া একটি আরবী শব্দ। ইহা একবচন, বহুবচনে জাযা'আ, যার অর্থ হল আদা' আ। অর্থাৎ আদায় করা। আরবী ভাষা বিজ্ঞানী ইবনে মানজার এবং ইমাম রাগীব বলেন, জিযিয়া শব্দটির জাযা'আ থেকে এসেছে যার অর্থ হল আদায় করা। জিযিয়া এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, ইহা জিম্মিদের প্রাণরক্ষার বিনিময়ে আদায় করা হয়। বিখ্যাত মুফাসসীর আল্লামা জামাখ্সারীর মতে শব্দটির মূল হলঃ জাযা'আ এবং ইহাকে এ জন্য জিযিয়া বলা হয় যে, জিম্মিদের কর্তব্যসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি কর্তব্য তারা পালন করে। আল্লামা বায়যাভী বলেন, "ইহা আরবী প্রবাদ "সে ঋণ পরিশোধ করেছে" হতে গৃহীত হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায় যে, জিম্মিদেরকে যুদ্ধ বিগ্রহ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয় এবং তার বিনিময়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। বিভিন্ন ফকীহ্গণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে জিযিয়াকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি সংজ্ঞা আলোচনা করা হলঃ

প্রথমত: ইবনুল আছীর বলেন- জিযিয়া এমন অর্থ বা সম্পদ যার

বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে জিম্মিদের নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিত হয়।

দ্বিতীয়ত: ইবনে মানজার বলেন-জিম্মির জিযিয়া এমন সম্পদ যার বিনিময়ে সে নিরাপত্তা জিম্মাদারীর আওতাভুক্ত হওয়ার চুক্তি সম্পাদন করে থাকে।...

তৃতীয়ত: আল্লামা ইবনে রুশদ বলেন-আহলে কিতাব বা জিম্মিদের কাছ থেকে নিরাপত্তা স্বরূপ প্রতিবছর যে অর্থ-সম্পদ নেয়া হয় তাকে জিযিয়া বলে।

চতুর্থত: ইবনে কুদামাহ্-এর মতে "ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে শান্তিতে বসবাসের জন্য কাফেরদের নিকট থেকে যে কর নেয়া হয় তার নাম জিযিয়া।"

পঞ্চমত: আল্লামা দারদির বলেন, "জিযিয়া হলো অমুসলিমদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ।"

ষষ্ঠত: আশরাফ আলী থানবীর মতে, "জিযিয়া হল যে অর্থ সম্পদ যা জিম্মিদের উপর আরোপ করা হয়। ইহাকে খারাজও বলে।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সকল ফকিহ্গণ প্রায় একই রকম কথা বলেছেন, যার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ সম্পদ যা অমুসলমানদের কাছ থেকে নিরাপত্তার বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্র আদায় করে।

জিযিয়া আরোপের প্রামাণ:

পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসে আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলমানদের উপরে জিযিয়া আরোপ করার ক্ষমতা রাখে। এগুলো পর্যায়ক্রমে নিম্নে আলোচনা করা হল:

ক. কোরআন : আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা তওবার ২৯ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলেন, "যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর ঈমান আনেনা এবং আল্লাহ ও রাসুল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করেনা এবং সত্য দ্বীন (ইসলাম) অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।"

খ. সুন্নাহ: জিযিয়া নেয়ার ব্যাপারে রাসুল (সঃ) এর বহু সুন্নাহ রয়েছে। এর মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখিত হল:

১. হযরত সোলায়মান ইবনে বুরাইদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সঃ) কোন যুদ্ধে বা জিহাদে সৈনাবাহিনী (মুজাহিদ) প্রেরণের সময় সেনাপতিকে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আল্লাহর ভীতি ও তার সঙ্গের মুজাহিদদের কল্যাণের ব্যাপারে

উত্তম উপদেশ দিয়ে বলতেন, "যখন তোমার সাথে মুশরিক শত্রুর সাক্ষাৎ হয় (আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে) তখন তাকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির প্রতি আহ্বান জানাবে। প্রথমত: তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিবে: ইসলাম গ্রহণ করলে অস্ত্র পরিচালনা বন্ধ করে দিবে এবং স্বাগত জানাবে। ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাদেরকে দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ জিযিয়া প্রদানের আহ্বান জানাবে। জিযিয়া দিতে সম্মত হলে তাদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করবে এবং স্বাগত জানাবে, আর জিযিয়ার আহ্বান প্রত্যাখাত হলে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।"

আলোচ্য হাদিসে স্পষ্টভাবে অমুসলমানদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

২. রাসুল(সঃ) নিজে অগ্নি উপাসকদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করেছেন।

৩. আমর ইবন আ'স ইকবাতদের (মিশরের একটি সম্প্রদায়) কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করেছেন এবং ওমর (রাঃ) কে অবহিত করার পর তিনি এ ব্যাপারে ইতিবাচক-সাড়া দিয়েছেন।

গ. ইজমা: বাদাই ও সানাই, ফতোয়া-ই আলমগীরি, এবং মুগনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সকল ফকিহ্ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানদের কাছ থেকে নিরাপত্তা কর স্বরূপ জিযিয়া নেয়ার ব্যাপারে ঐকামত পোষণ করেছেন।

ঘ. আকল (সাধারণ যুক্তি): সাধারণ যুক্তি দ্বারাও জিযিয়া আরোপের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। মুসলমানগণ যেহেতু রাষ্ট্রের আরেপিত সকল কর ও খাজনা আদায় করার পরও সমর্থবান মুসলমানরা নির্দিষ্ট হারে যাকাত করে সেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী সামর্থবান অমুসলমানদের কাছ থেকে নির্দিষ্টহারে জিযিয়া আদায় করা যায়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, যে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করা বৈধ এবং বাস্তবসম্মত।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে জিযিয়া ও খারাজ :

ইসলামের প্রাথমিক যুগে জিযিয়া ও খারাজ এক অন্যের সমর্থক হিসেবে ব্যবহৃত হত। 'লিসানুল আরব' গ্রন্থে জিযিয়া শব্দটি ভূমি রাজস্ব বা খারাজের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ খারাজ-এ-রুসুম অর্থাৎ আজমীদের

ভূমি রাজস্বের ন্যায় শব্দসমূহ ব্যবহার করেছেন। অপর একজন ইতিহাসবিদ বালাজুরী কখন কখন খারাজকে মাথাপিছু কর (জিযিয়া) অর্থে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং বুঝা যায় যে, পূর্বে জিযিয়া ও খারাজ সাধারণত কর বা খারাজ অর্থে ব্যবহৃত হতো। মুসলিম ঐতিহাসিক ও ফকিহ্গণের মধ্যে কেহ ১২১ হিঃ এর পূর্বে জিযিয়া এবং খারাজকে একে অপরের সমর্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু নাসর ইবন সোয়ায়ের ১২১ হিজরীতে জিযিয়া ও খারাজকে একই অর্থে নির্ধারণ করে দেন। অধ্যাপক ট্রিটন তার গ্রন্থ 'The Caliphs and thier non-muslim subjects' এ একটি সুক্ষ তথ্য প্রকাশ করেন যে: পশ্চিম অঞ্চলের প্রদেশসমূহে সাধারণত রাজস্বের ক্ষেত্রে জিযিয়া এবং পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে রাজস্বের ক্ষেত্রে খারাজ শব্দ ব্যবহার হতো।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানগণ বিজিত দেশসমূহে জিযিয়া ও খারাজের পরিমান একরূপ রাখতেন না। এ ছাড়াও মুসলিম শাসকগণ বিজিত রাজ্যে কেবল পূর্ব প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থাই(মুদ্রা ব্যবস্থা) রাখেননি বরং পূর্ব প্রচলিত ভাষাও বহাল রাখেন, যাতে করে প্রজারা কোন অসুবিধার সম্মুখিন না হয়।

জিযিয়া আরোপের কারণ:

অমুসলিম শত্রুরা যখন অস্ত্র সমর্পণ করে মুসলমানদের সাথে, নিজ ধর্মের উপর বহাল থেকে আল্লাহ্ ও তার রাসুলের হেফাযত ও দায়িত্বে আশ্রয় গ্রহণের সম্মতি সাপেক্ষ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করার সুযোগ লাভ করে তখন তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করা হয়। জিযিয়া প্রবর্তনের কারণ সম্পর্কে আলেমগণ বর্ণনা করেছেন যে, জিম্মিরা একদিকে যেহেতু কুফরের উপর দৃঢ় আস্থাবাদী অপরদিকে তারা নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তাও কামনা করে, কিন্তু মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় শত্রু দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় , সেহেতু তাদের জন্য একটি সহজ বিকল্প ব্যবস্থা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তারা নাগরিক অধিকারসমূহের ভোগের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি একটি আর্থিক দায়িত্ব পালন করবে অর্থাৎ বছরে একবার নির্দিষ্ট পরিমান জিযিয়া প্রদান করবে। এর মনস্তাত্তিক দিক হলো দারুল ইসলামে মুসলিম অধিবাসীগণ রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে নিজেদের জান-মাল কোরবান করে থাকে কিন্তু অমুসলিমদের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না। দারুল ইসলামে বসবাস করেও তার মনের টান থাকে দারুল হারবের দিকে এবং এটাই সত্য। এ

পরিস্থিতি পূর্বেও ছিল এখনো আছে।

আবার মুসলমানরা যখন অমুসলিমদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন তাদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া হয় না এবং নেয়া হলেও তা ফেরত দেয়ার বিধান আছে। ইসলামের ইতিহাসে এর বহু নজির রয়েছে। যেমন হযরত ওমর(রাঃ) এর খেলাফতকালে সিরিয়ার গর্ভনর হযরত উবায়দা (রাঃ) অমুসলিমদের জিযিয়া ফেরত দেন কারণ সেখান থেকে কোন কারণবশতঃ মুসলমান সৈন্য প্রত্যাহার করা হলে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।(রুহুল মায়ানী)

জিযিয়া আদায়ের শর্ত :

ফকিহ্গণ জিযিয়া আদায়ের ব্যাপারে কতগুলো শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন:

ক. প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন এবং সামর্থবান পুরুষ হতে হবে। শিশু, মহিলা ও পাগলের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া যাবে না। পবিত্র কোরআনের সূরা তওবার ২৯ নং আয়াতে ' আন-আদীন' ও 'ওহুমসাগীরুন' এই শব্দ দু'টির ব্যাখ্যায় মুফাসসীরগণ বলেন, 'আন-আদীন' শব্দটি শক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে জিযিয়া কেবল ঐসব অমুসলমানরা দিবে যাদের পেশী শক্তি আছে এবং অস্ত্র নিয়ে শত্রুতা করতে পারে। 'আন-আদীন' এর আর একটি অর্থ হল প্রাচুর্য। এজন্য জিযিয়া কেবল সমর্থবান জিম্মিরা প্রদান করবে।

আবার 'সাগীরুন' শব্দটি 'সিগার' থেকে নির্গত যার অর্থ ছোট হওয়া, মাথা নত করা বা অনুগত হওয়া। অর্থাৎ অস্ত্র সমর্পন করে বা শত্রুতা বন্ধ করে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার পর জিযিয়া আদায় যোগ্য হয়। হযরত ওমর (রাঃ) মহিলা, শিশু দের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করতেন না। হানাফী, মালেকী, হাম্বলী এবং যায়েদী মাযহাবের মতে অন্ধ, অক্ষম, অতিবৃদ্ধদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করা যাবে না : তবে ইমাম শাফেঈ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

পূর্বে মহিলা জিম্মিদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়ার অনুমতি ছিল না। কিন্তু এখন পূর্বের সেই পরিবেশ পরিস্থিতি নেই। এখন মহিলারা অস্ত্র ধারণ করছে, নিয়মিত সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করছে। এ ছাড়াও মহিলারা বর্তমানে স্বাধীনভাবে চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে আর্থিকভাবে অনেক মহিলা স্বচ্ছল হচ্ছে। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন রাষ্ট্রের সামগ্রীক কল্যাণের জনা সমর্থবান

...লাদের উপর জিযিয়া আরোপ করতে পারে।

খ. জিযিয়া আদায়ের দ্বিতীয় শর্ত ধনী হতে হবে কারণ গরীব জিম্মিদের ...ছ থেকে জিযিয়া নেয়া বৈধ নয়। তবে পুনরায় স্বচ্ছল হলে জিযিয়া আরোপ ...া যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন, 'কেহ যদি অভাবগ্রস্থ হয় তবে ...ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া প্রয়োজন, আর যদি ছেড়ে (মাফ) দাও তবে ...া তোমাদের জন্য কল্যাণকর....।

হযরত ওমর (রাঃ) গরীবদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করেননি। ...কদিন এক অতি বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে তিনি বৃদ্ধকে ভিক্ষা করার কারণ ...নতে চাইলে বৃদ্ধ জানায় তাকে ভিক্ষা করে জিযিয়া প্রদান করতে হয়। এ কথা ...নে হযরত ওমর (রাঃ) ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তির জিযিয়া মাফ করে দেন এবং বায়তুল মাল ...কে তার ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

...যিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি :

ফকিহ্গণের মতে জিম্মিরা কতিপয় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে জিযিয়া প্রদান করা ...কে অব্যাহতি পাবে। যেমন:

...ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যু বরণ: কোন জিম্মি ইসলাম গ্রহণ করলে বা মৃত্যুবরণ ...লে সে জিযিয়া প্রদান করা থেকে অব্যাহতি পাবে। হানাফী, মালেকী ও যায়েদী ...যহাবের ফকিহ্গণ এ মত পোষন করেন। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সঃ) বলেন, ...সলমানদের উপর কোন জিযিয়া নেই, উহা কেবলমাত্র কাফেরদের উপর ...য়াজিব করা হয়েছে।' শাফেঈ মাযহাবের ফকিহ্গণ এর সাথে দ্বিমত পোষন ...রেছেন। হাম্বলী মাযহাবের ফকিহ্গণ বলেন, কোন জিম্মি বৎসরের মাঝামাঝি ...ময় ইসলাম গ্রহণ করলে, পরবর্তী বছর থেকে তার জিযিয়া মাফ হবে।

... সময় অতিক্রান্ত: জিযিয়া প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলে ...জন জিম্মি তার উপর আরোপিত জিযিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি পাবে। আবু ...নিফা এই মত প্রকাশ করেন। তবে আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও শাফেঈ এবং ...ম্বলী মাযহাবের ফকিহ্গণ বলেন, সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও জিযিয়া ...ফ হবে না কারণ এটা দিয়াতের সমতুল্য। দিয়াত (অনিচ্ছাকৃতভাবে খুনের জন্য ...র্থনৈতিক জরিমানা) যেহেতু মাফ হয় না সেহেতু জিযিয়াও মাফ হয় না। এ ...ড়াও এ রকম সুযোগ দিলে জিম্মিরা বিভিন্ন অজুহাত সৃষ্টি করে সময় অতিবাহিত ...রে জিযিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতির আবেদন করবে, যা রাষ্ট্রের জন্য বড় ধরনের

আর্থিক ক্ষতির সৃষ্টি করবে। এদিক থেকে বিচার করলে শেষোক্ত মতটি উত্তম বলে প্রতীয়মান হয়।

গ. নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে: রাষ্ট্র যখন কোন কারণে অমুসলিম প্রজাদের নিরাপত্তা প্রদানে অক্ষম হয় তখন তাদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করবে না সম্ভবত একারণে কোন মুসলিম দেশ অমুসলিমদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করছে না। এ ছাড়াও এর পিছনে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ রয়েছে।

ঘ. জিহাদে অংশ গ্রহণ করলে: যদি কোন জিম্মি ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলাম ধর্ম রক্ষায় জিহাদে অংশ গ্রহণ করলে জিযিয়া প্রদান করা থেকে অব্যাহতি পাবে। ঐতিহাসিক তাবারী বলেন, যখন মুসলমানরা আর্মেনীয়া দখল করে তখন তাদের সাথে কিছু অমুসলমান জিহাদে অংশ গ্রহণ করে। এ ঘটনা হযরত ওমর(রা:) এর কাছে জানানো হলে তিনি জিহাদে অংশগ্রহণকারী অমুসলমানদের কাছ থেকে জিযিয়া না নেয়ার আদেশ দেন।

জিযিয়ার পরিমান:

জিযিয়ার পরিমান সম্পর্কে বিভিন্ন ইমাম ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবু হানিফার মতে ধনী ব্যক্তির উপর ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তের উপর ২৪ দিরহাম, বা এর সমপরিমান অর্থ জিযিয়া হিসেবে নির্ধারিত হবে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মতে জিযিয়ার কোন নির্দিষ্ট পরিমান নেই বরং সমকালীন রাষ্ট্র কর্তৃক যা সঠিক বলে বিবেচিত হবে তাই নির্ধারিত হবে। অপরদিকে ইমাম মালেক বলেন, জিযিয়ার পরিমান হল চার দিনার বা ৪০ দিরহাম বা এর সমমানের অর্থ। সব শেষে ইমাম শাফেঈ বলেন, ধনী গরীব সবাই এক দিনার করে জিযিয়া প্রদান করবে। এ প্রসঙ্গে তিনি রাসুলের এই হাদিসটি ' প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষের উপর জিযিয়া এক দিনার' উল্লেখ করে তার মতের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

জিযিয়ার অর্থনৈতিক মূল্য:

জিযিয়া আরোপের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্য অনস্বীকার্য। যে কোন দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর কর্মসূচী হচ্ছে নাগরিকদের রক্ষনাবেক্ষণ, জীবিকার পথ উন্মোচন, শিক্ষা-চিকিৎসা সুবিধাসহ সকল সুবিধা প্রদান করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে নাগরিকদের কল্যাণ সাধন করা। আর এ জন্য প্রয়োজন অর্থ। জিযিয়ার মাধ্যমে দেশের আয় হতে পারে। সুতরাং এর আর্থিক কল্যাণের

...ক উপেক্ষা করার মত নয়। অধিকন্তু ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ...বং এর সার্বিক রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব নীতিগতভাবে মুসলমানদের উপর ...র্তায়। অন্যকথায় বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা করা মুসলমানদের জন্য ইবাদত ...রূপ। অমুসলিমদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। তারা স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করতে ...রে তবে তাদের উপর জোর করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা ...খা হয়েছে অর্থাৎ তারা রাষ্ট্র রক্ষা ও নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য ...রকারকে একটি নিরাপত্তা কর দিবে।

...র্তমান যুগে অন্যান্য কর আদায়ের পর জিযিয়ার স্থান :

এ বিষয়টি দুটি দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত: অমুসলমানরা অন্যানা কর আদায় করার পরও জিযিয়া আদায় করবে যেমন মুসলমানরা অন্যানা কর আদায় করার পরও যাকাত আদায় করছে। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যবধান হচ্ছে মুসলমানদের যাকাত হচ্ছে একটি আবশ্যকীয় অর্থনৈতিক ইবাদত আর অমুসলমানদের জিযিয়া হচ্ছে রাষ্ট্রীয় দেয়।

দ্বিতীয়ত : ইসলামী প্রশাসন অমুসলমানদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে ইজমার মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের এই আয়াত ("কেহ যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া প্রয়োজন, আর যদি ছেড়ে (মাফ) করে দাও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর") এর আলোকে মাফ করে দিতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন এ ধরণের ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার রাখে। প্রশাসন কোন মুসলমানের যাকাত মওকুফ করার অধিকার রাখে না কারণ যাকাত আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত একটি অর্থনৈতিক ইবাদত। অপর দিকে জিযিয়া মওকুফ করার ক্ষমতা একারণে রাখা হয়েছে যে, জিযিয়া পার্থিব অর্থনৈতিক বিষয় মাত্র। জিযিয়া আদায় হলে রাষ্ট্র বেশী করে কল্যাণমূলক কাজ করতে পারে আর আদায় না করলে স্বভাবত কারণে কল্যাণমূলক কাজের পরিমান হ্রাস পাবে। অতএব এ বিষয়টি রাষ্ট্র প্রয়োজনে আরোপ করতে পারে আবার মওকুফও করে দিতে পারে।

২. ভূমি কর বা খারাজ:

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমান কর্তৃক ভোগদখলকৃত জমির উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে খারাজ বলে। জমির গুণাগুণ, উর্বরতার পার্থক্য, প্রয়োজনীয়

চাষের পরিমাণ, পানি সেচের আবশ্যকতা ইত্যাদির উপর বিবেচনা করে খারাজ নির্ধারিত হয়। অবস্থা বিশেষে খারাজের পরিমান হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়। বছরে একবার খারাজ আদায়যোগ্য। ভূমি কর মুসলমানরা আদায় করে: তবে তাকে ওশর বলে। ওশর শব্দের অর্থ এক দশমাংশ। ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ মুসলমানদেরকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দিতে হবে তাই এর নাম ওশর হয়েছে।

খারাজের সংজ্ঞা:

খারাজ ফারসী শব্দ। আরবী ভাষায় বলা হয় তিসকুন। কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে বলা হয়েছে, অমুসলিমদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে খারাজ বলে। আরবী এই 'তিস্‌কুন' শব্দ থেকে ইংরেজী Task বা Tax শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খারাজ শব্দটি গ্রীক মূল Khoregia শব্দ হতে উৎপত্তি হয়ে সিরিয়া ও ফারসী ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে ভূমি রাজস্ব বা ভূমি কর।

বিভিন্ন মুসলিম আইনবিদগণ খারাজকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন: আল মাওয়ার্দী (শাফেঈ মতাবলম্বী) ও আবু ইয়ালী (হাম্বলী মতাবলম্বী) বলেন: জমির উৎপাদিত ফসলের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে খারাজ বলে।

শিয়া সম্প্রদায়ের কিতাব শরহুল আজহার -এ ইবনে মিফতাহ বলেন, খারাজ হল কাফেরদের জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর ধার্যকৃত একটি অংশ। অপর একজন অমুসলিম মনীষী A. Von Kremer বলেন, প্রশাসন ভূমি রাজস্ব বাবদ অমুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের যে একটি নির্দিষ্ট অংশ আদায় করে তাকে খারাজ বলে।

ইসলামী বিশ্বকোষের পরিভাষায় বলা হয় যে, ভূমি রাজস্ব বাবদ অমুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে যা আদায় করা হয় তাকে খারাজ বলে।

খারাজ আদায়ের বৈধতা:

ক. কোরআন: আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের সূরা মুমিনুনের ৭২ নং আয়াতে বলেন, "না আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান (খারাজ) চান। আপনার পালন কর্তার প্রতিদান উত্তম।"

আলোচ্য আয়াতে অমুসলিমদের কাছ থেকে খারাজের বিপরিতে অন্য কিছু আদায়কে অনুৎসাহিত করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ: রেওয়ায়েত আছে যে, রাসুল(সঃ) হাজরবাসীর উপর খারাজ ধার্য করেছিলেন।

গ. ইজমা: আবু ইউসুফের 'খারাজ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত ওমর (রঃ) যখন ইরাক দখল করেন তখন মাথাপিছু ও জমির উপর খারাজ ধার্য করেন। এ ব্যাপারে কোন আপত্তি না তুলে সাহাবীরা সকলে সর্বসম্মতিক্রমে একে মেনে নিয়েছেন।

খারাজী জমি: যে সকল অঞ্চলের উপর ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন সেখানকার জমি অমুসলিমদের কাছে রাখার অনুমতি দিয়েছে অথবা মুসলিম দেশের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হবার পর মুসলিম দেশের অধীন হয়ে জিম্মিতে পরিনত হয়েছে তাদের ভূ-সম্পত্তিকে খারাজী জমি বলে। হানাফী ফকিহ্‌গণ বলেন, যে জমি অমুসলিমদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাকে খারাজী জমি বলে।

খারাজের প্রকারভেদ:

ফকিহ্ গণ খারাজকে দুভাগে ভাগ করেছেন। যথা: (ক) খারাজ আল ওজিফাহ্ - এ ধরণের খারাজ জমির উর্বরতা ও ফসলের ধরণ মোতাবেক নির্ধারিত হয়। ওমর (রঃ) ইরাক দখলের পর এ ধরণের খারাজ নির্ধারণ করেন। তিনি এক কুতবা যবের জন্য পাঁচ দিরহাম এবং এক কুতবা আঙ্গুরের জন্য দশ দিরহাম খারাজ ধার্য করেন। এক কুতবা সমান ২০০ কিলো গ্রাম। এ ছাড়াও হযরত ওমর এক জরিব(ষাট বর্গগজ) জমির উপর নগদ এক দিরহাম ও এক সাআ(৩ কে.জি) গম বা যব খারাজ ধার্য করেন। আর শাক-শবজী উৎপাদনশীল ভূমিতে জরিব প্রতি পাঁচ দিরহাম খারাজ ধার্য করা হয়। যেসব জমির খারাজ ওমর (রাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত হয়নি সে ব্যাপারে ফকিহ্‌গণ বলেন, ভূমির উৎপাদন ক্ষমতানুযায়ী খারাজ নির্ধারণ করা উচিত তবে তা উৎপাদিত ফসলের এক পঞ্চমাংশের কম অথবা অর্ধেকের বেশী যেন না হয়।

(খ) খারাজ আল মুকাসামাহ্: এ ধরণের খারাজে জমির উৎপদিত ফসলের অর্ধেক, তিন ভাগের এক ভাগ, বা চার ভাগের এক ভাগ বা অন্য কোন নির্দিষ্টহারে যে খারাজ ধার্য করা হয় তাকে খারাজে মুকাসামাহ্ বলে। খায়বর যুদ্ধের পর

রাসূল(সঃ) খায়বর বাসীর উপর এ ধরণের খারাজ ধার্য করেছিলেন।

ফকিহ্ গণের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, একবার জমির উপর এক ধরণের খারাজ ধার্য করা হলে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা বৈধ নয়। খারাজ আল মুকাসামাহ্ এর স্থলে খারাজ আল অজিফাহ্ ধার্য করা যাবে না।

সকল প্রকার খারাজ নির্ধারণের ব্যাপারে জমির গুনাগুন, উর্বরতার পার্থক্য চাষের পরিমান, পানি সেচের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির উপর লক্ষ্য রেখে খারাজ ধার্য হওয়া উচিত। বিশেষ কারণে সরকার খারাজের পরিমান হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে এমনকি সম্পূর্নরূপে পরিবর্তন করতে পারে। খারাজ বছরে একবার আদায় যোগ্য কিন্তু ওশর প্রতিটি উৎপাদিত ফসলের উপর আদায় যোগ্য। খারাজ আদায় করার সময় খারাজ দাতার প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শনের জন্য ইসলাম স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে।

খারাজ ব্যয়ের খাত:

খারাজী ভূমি থেকে যে, অর্থ ও ফসল আদায় হবে তা দেশের সাধারণ জন কল্যাণকর কাজ, দেশ রক্ষার্থে সেনাবাহিনীর যাবতীয় ব্যয়, রাষ্ট্রের সাধারণ কর্মচারী, দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জনকারী ছাত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষা) রাস্তাঘাট, মসজিদ, চিকিৎসালয়সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করা যাবে। অমুসলমানদের কাজ থেকে আদায়কৃত জিযিয়ার অর্থ এবং তাদের ব্যবসায়ীক দ্রব্য সামগ্রীর শুল্ক থেকে আসা অর্থ ও এসব খাতে ব্যয় করা যাবে।

হেদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, আমীরুল মোমেনীনের নিকট ভূমির খারাজ বা বনী তাগলেবদের ওশর অথবা আহলে হারবদের পক্ষ থেকে হাদিয়া স্বরূপ যে অর্থ সম্পদ এবং জিযিয়া থেকে যা কিছু আমদানি হবে তা সবই মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে। এছাড়াও শিল্প কলকারখানা নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করা যাবে, রাজকর্মচারীদের বেতন ভাতা দেয়া যাবে। মুজাহিদিন বা সেনাবাহিনী ও তাদের পরিবার পরিজনদের জন্যও এই অর্থ ব্যয় করা যাবে। সবশেষে শিক্ষা খাতেও এই অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৩. মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বিষয় পরিহার:

অমুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করার সময় মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজ বা কথা প্রকাশ করতে পারবে না; কেননা এই শর্তে তারা

...লামী রাষ্ট্রে বসবাস করার স্বীকৃতি পায়। মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর কাজ বা ...য়সমূহকে ফকীহ্গণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন:

...ধর্মের ব্যাপারে ক্ষতিকর কাজ বা কথা: অমুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস ...ার সময় ইসলাম ধর্মকে নিয়ে এমন কোন কথা বা কাজ করতে পারবে না, যা ...র্মের জন্য অবমাননকার হয়। এ কাজটি বিভিন্ন উপায়ে হতে পারে। যথা: (ক) ...ল্লাহর কিতাব সম্পর্কে কোন কটুক্তি করা এবং বিকৃতি করার চেষ্টা করা: (খ) ...সুল (সাঃ) কে মিথ্যাবাদী এবং তাঁর কথা ও কাজ নিয়ে হাসি তামাসা করা: (গ) ...সলাম ধর্ম অপূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ বা অমানবিক এ জাতীয় কোন কথা প্রকাশ করা বা ...চার করা: (ঘ) বিশৃংখলা সৃষ্টির ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা: ...বং অন্যান্য অমুসলিমদেরকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

অমুসলমানরা ধর্ম সংক্রান্ত এ সব শর্ত অবশ্যই পালন করবে। যদি তারা ...র পরিপন্থী কোন কাজ করে তখন তাদের বিরুদ্ধে ইসলামী প্রশাসন শাস্তিমূলক ...বস্থা নিবে। এদের শাস্তির কথা পবিত্র কোরআনের সুরা তওবার ১২নং আয়াতে ...ল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন কোন ফকীহ বলেন, প্রথমত: তাদের ...িম্মা চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং দ্বিতীয়ত: তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দিতে হবে। ...াফে'ঈ মাজহাব একটু ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছে যে অমুসলমানদের দ্বারা ...পরোক্ত যে কোন একটি কাজ সাধিত হলে তাদের উপরে হদ বাস্তবায়ন না করে ...াজির বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের দ্বারা এ ধরণের কোন ...াজ হলে তাকে মুরতাদ বলে সাব্যস্ত করা হয় এবং মুরতাদের জন্য রয়েছে ...ত্যুদন্ড। তবে শর্ত যে, তাকে পুনঃরায় তওবা করা বা ইসলামে ফিরে আসার ...যোগ দিতে হবে। বর্তমানে এ ধরণের কাজকে ব্লাসফেমাস করা বলে এবং ...াংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশের দন্ডবিধি আইনে এ কাজটি অপরাধমূলক ...লে গণ্য হয় এবং এর জন্য শাস্তিরও বিধান রয়েছে।

... জান, মাল ও সুখ্যাতির জন্য ক্ষতিকর কাজ পরিহার: অমুসলমানরা ...ুসলমানদের জান, মাল ও ইজ্জত আব্রু বা সুনাম-সুখ্যাতির ব্যাপারে এমন কোন ...াজ বা কথা বলবে না যার দ্বারা উক্ত বিষয়াদির ক্ষতি হতে পারে। যে সব কাজের ...ারা মুসলমানদের ক্ষতি হতে পারে তা নিম্নরূপ : (ক) ডাকাতি বা রাহাজানী করা ...থবা মুসলমানদের ধন-সম্পদ আটক করার চেষ্টা করা: (খ) মুসলমানদের ...ত্রুদেশকে যুদ্ধের ব্যাপারে সাহায্য করা, গুপ্তচরগীরি করা বা কোন গুরুত্বপূর্ণ

তথ্য প্রেরণ করা; (গ) কোন মুসলমান রমনীর সাথে ব্যভিচার করা বা জোর করে বিবাহ করা; (ঘ) মুসলমান নর বা নারীর উপরে জেনার অপবাদ দেয়া ইত্যাদি।

উপরোক্ত শর্তাবলী জিম্মা চুক্তির আওতাভুক্ত এবং এর একটিও করা হলে জিম্মাচুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রে ঘৃণিত বা নিন্দীয় বস্তু প্রদর্শন না করা: অমুসলমানরা ইসলামী সমাজে বসবাস করার সময় কোন খারাপ বা ঘৃণিত বস্তু প্রদর্শন করতে পারবে না। কারণ এ সব খারাপ বস্তু প্রদর্শনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং ধীরে ধীরে মুসলমানদের নৈতিকতার পদস্খলন ঘটবে। অমুসলমানরা দুটি উপায়ে মুসলিম সমাজে ঘৃণিত কাজ প্রদর্শন করতে পারে। (ক) আকিদা বা বিশ্বাসগত :এমন কোন কাজ করা যাবে না যা শরীয়তে নিষিদ্ধ; যদিও তাদের ধর্মে বৈধ। বৈধ হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের গণ্ডীর মধ্যে করার অনুমতি পাবে কিন্তু প্রকাশ্যে নয়। যেমন- মদ্যপান, শুকুরের মাংশ ভক্ষণ বা ক্রয়-বিক্রয়, উজাইর (আঃ) বা ঈসা (আঃ)কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে প্রচার করা ইত্যাদি। (খ) এমন কিছু কাজ বা বিষয় আছে যা মূলতঃ মুবাহ (যা সম্পর্কে হালাল বা হারামের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন বিধি-নিষেধ নেই), সে সব কাজ করা হলে মুসলমানদের জন্য ক্ষতি হতে পারে তা পরিহার করতে হবে। যেমন- অমুসলমানদের পোষাক-পরিচ্ছেদের ব্যাপারটি কারণ মুসলমানদের পোষাক-পরিচ্ছদ অমুসলমানদের থেকে পৃথক।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নিরপেক্ষতা

বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিরপেক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
নিরপেক্ষতা বলতে পক্ষপাতহীন আচরণকে বুঝায়। দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে
যুদ্ধ শুরু হলে যখন একটি রাষ্ট্র কোন পক্ষকেই সমর্থন না দিয়ে নীরব ভূমিকা
পালন করে এবং কখন কখন বিবাদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা
চালায় তখন ঐ রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে। মূলত নিরপেক্ষতা হল একটি
রাষ্ট্রের আইনগত অবস্থান যা দ্বারা বিবাদমান রাষ্ট্রদ্বয় থেকে তৃতীয় রাষ্ট্রকে পৃথক
করা যায়। অতীত কালে নিরপেক্ষতার ধারণা বর্তমান কালের ন্যায় বিকশিত না
হলেও এর অস্তিত্ব ছিল। আধুনিক আরবগণ নিরপেক্ষতার জন্য 'হিয়াদাহ' শব্দ
ব্যবহার করেন। প্রাক-ইসলামী এবং প্রাচীন কালের মুসলমান আরবগন 'ইতিযাল'
শব্দ ব্যবহার করতেন। যদিও এ শব্দটি কোন বিশেষ মুসলিম দর্শন ও ধর্মীয় চিন্তার
পোষকগণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তথাপি মুতাযিলাগন কর্তৃক সুন্নি
খারিজিদের প্রতি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার কারণে 'ইতিযাল' শব্দটি
নিরপেক্ষতার পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হত।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে নিরপেক্ষতার কোন সংজ্ঞা প্রদান করা
হয়নি। তবে নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন বিজ্ঞানীগণ যে সব
সংজ্ঞা দিয়েছেন তার সাথে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের নিরপেক্ষতার
বিষয়বস্তুর তেমন কোন বিরোধ নেই। যেমন Lawrence বলেন, "Neutrality
is the condition of those States which in times of war take no part
in the contest, but continue pacific intercourse with the belliger-
ents." নিরপেক্ষতা সম্পর্কে Oppenhiem বলেন, "Neutrality is the attitude
of impartiality adopted by third States towards the belligerents and
recognised by belligerent , such attitude creating rights and duties
between the impartial States and the belligerents."

প্রাক-ইসলামী যুগের ৪০ বছর ব্যাপী বিখ্যাত বেসাসের যুদ্ধে বনু বকর
তাগলিব গোত্রের নিরপেক্ষতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে একজন আরব

পন্ডিত বলেন," যখন তাগলিব গোত্রের সর্দার কুলায়েব বকর গোত্রের জনৈক যুবকের হাতে নিহত হয়, তখন বকর গোত্রের নিকট একটি দল পাঠান হয় অপরাধীর কিংবা সর্দারের অথবা গোত্রের যে কোন অভিজাত লোককে দেশ থেকে বহিস্কারের দাবী করে: অন্যথায় যুদ্ধের হুমকী দেয়া হয়। যেহেতু খুনী পলায়ন করেছিল তাই শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতিসত্বর একটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় যাতে রাবেয়া গোত্রের অধিকাংশ শাখা তাগলিব গোত্রের পক্ষে ও বকর গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে। অন্যদিকে বকর গোত্রের অনেকগুলো শাখা যেমন বনু হানিফা, বনু কায়েস ও সা'আলাবা নিরপেক্ষ থেকে যায়। সা'আলাবা গোত্রের বিখ্যাত কবি ও বীর পুরুষ আল-হারিস ইবনে আররাদ আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ ও চাপ সত্ত্বেও স্বীয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন। এই ছিল মূখ্য কারণ যার জন্য অন্যান্য শাখা ও যুদ্ধ হতে বিরত ছিল এবং বলেছিল, "ওহে শায়বানের অধিবাসীগন। তোমরা তোমাদের ভাইদের (তাগলিব) উপর অত্যাচার করেছ এবং তোমাদের ভ্রাতৃস্পুত্র যুবরাজকে (কুলায়েব) হত্যা করেছ। আমরা কখনও তোমাদের সাহায্য করবো না।

মহানবীর পূর্ব পুরুষ কুশাই তাঁর আত্মীয় কুদা'আ গোত্রের সাহায্যে মক্কার প্রধান সর্দার হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার কয়েকজন পুত্রের মধ্যে তাঁর কার্যাবলীর ভার অর্পন করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় এবং বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। প্রত্যেক গোত্র বিদেশী মিত্রের সাহায্য নেয়। সমস্ত স্থায়ী গোত্র কোন না কোন পক্ষে যোগদান করে। কেবল দুটি গোত্র নিরপেক্ষ থাকে (ইবনে হিশাম)। হাদিসেও এ বিষয়ে অনেক কৌতুহল পূর্ন বিষয় আছে। যেমন: - শোনা যায় মহানবী(সঃ) বলেছিলেন, অতিসত্বর মুসলিম সমাজে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে এবং ধার্মিকের তখন কাজ হবে সে অশান্তির মধ্যে ঘরে বসে থাকা এবং কোন দলে যোগ না দেয়া। মুহাদ্দিস বলেন,এ হাদিস অনুসারে হযরত আলী (রাঃ) ও মুয়াবিয়া (রাঃ) এর মধ্যে যুদ্ধে অর্দেক ধর্মপ্রান মুসলমান নিরপেক্ষ ছিলেন।(বুখারী)

নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোরআনের নির্দেশ:

নিরপেক্ষতা সম্পর্ক আল্লাহ্ পাক বলেন, "তোমরা কি মুনাফিকদের লক্ষ্য কর নাই? যারা মুসলমান বা আহলে কিতাবের মধ্য হতে তাদের কিছু অবিশ্বাসী

…দের বলে, যদি তোমরা বিতাড়িত হও আমরা অবশ্যই তোমাদের সংগে বাইরে … এবং তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে অন্য কোন আদেশ পালন করব না এবং …দি তোমরা আক্রান্ত হও, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সাহায্য করব এবং …ল্লাহ্ সাক্ষী যে, তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী" (হাশর-১১-১২)।

বস্তুত: যদি তারা বিতাড়িত হয়, তারা কখনও তাদের সংগে যাবে না …বং বাস্তবিক পক্ষে যদি তারা সাহায্য না করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত এবং তখন …জয় কখনও হতো না।

এই আয়াত গুলোতে ভবিষ্যৎ বানী করা হয়েছে যে, মদীনার অধিবাসীদের …ভিতর হতে মুনাফিকগণ তাদের বন্ধুদের (ইহুদী গোত্র বনু নাযির) সাহায্য করবে …না কিন্তু মুসলমানদের সংগে নিরপেক্ষ থাকবে, (তাবারীর তাফসীর ১৮ খন্ড …ষ্টব্য)। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আয়াত সম্ভবত: নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতটি যাতে নিরপেক্ষতা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

"মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দুই দলে কেন বিভক্ত হচ্ছে-ঐ মুনাফি-…কগণ বেইমান; যাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে বেইমান করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ করছেন, তুমি তাকে পথ দেখাবে, আল্লাহ …যাকে বিপদগামী করেছেন, হে মুহাম্মদ, তুমি তাকে পথ দেখাতে পারবে না। …তারা কামনা করে যে, তোমরা অবিশ্বাসী হবে, যাতে তোমরা তাদের সাথে শামিল হয়ে যাও। সুতরাং তাদের ভিতর হতে বন্ধু বাছাই কর না, যতোক্ষন তারা আল্লাহ্‌র পথে গৃহ ত্যাগ না করে। যদি তারা শত্রু হয়ে দাড়ায়, যেখানে তাদের পাবে হত্যা করবে এবং তাদের ভিতর হতে বন্ধু বা সাহায্যকারী গ্রহণ করো না। ব্যতিক্রম হিসেবে গন্য হবে তারা, যারা আশ্রয় নেয় ঐ মানুষদের নিকট যাদের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি আছে অথবা তোমাদের নিকট যারা আসে: তোমাদের সংগে যুদ্ধ করবে না বলে। যদি যুদ্ধ করবে না বলে কিংবা তাদের লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না বলে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তিনি তাদেরকে তোমাদের উপর শক্তিশালী করতেন, ফলে তারা নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। সুতরাং তোমাদের ব্যাপারে যদি তারা নিরপেক্ষ থাকে এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে শান্তির প্রস্তাব করে, আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে বলবেন না। তোমরা অন্যানাদের পাবে যারা তোমাদের নিকট হ'তে ও তাদের লোকদের নিকট নিরাপত্তা আশা করে। তারা বারবার দুষ্কৃতি করে ও তাতে নিমজ্জিত হয়। যদি

তারা নিরপেক্ষ না থাকে এবং তোমাদের সংগে শান্তি স্থাপন না করে তাহলে যেখানে দেখ তাদের ধর ও হত্যা কর। তাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের কে পরিষ্কার বিধান দিয়েছি'(নেসা-৮৮-৯১)।

মহানবী(সঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় নিরপেক্ষতার চুক্তিসমূহ :

নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোরআনের বিধানের পরেই প্রাচীন যুগের ঘটনাবলী ও কার্যকলাপের উপর গুরুত্ব আরোপ করা যায় । ঘটনাবলী: (ক) মদীনা ছাড়তে বাধ্য হয়ে বনু নযির খায়বরে হিযরত করতঃ বসবাস স্থাপন করে। মক্কাবাসী ও অন্যান্যদের সঙ্গে তাদের চক্রান্তের দরুন মহানবী (সঃ) গোড়াতেই বিপদের মুলোৎপাটনের জন্য সচেষ্ট হন এবং খায়বরের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। অন্য পথে তিনি বনু নযিরের মিত্র গাতফানের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন এবং তাদের মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে সংঘাতে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেন। গাতফান গোত্র প্রত্যুত্তরে বলেন, 'এরূপ একটি বিপদের সময় তারা তাদের বন্ধুদের ত্যাগ করতে পারবে না'। তাদের ঘাটির বিরুদ্ধে মুসলিমদের কূটনৈতিক অভিযান পরিচালিল হলো এবং তাদের গৃহাভ্যন্তরে থাকতে এবং খায়বরের বিরুদ্ধে মহানবীর (সঃ) ইচ্ছামত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেওয়ায় বাধ্য করল।

খ. মদীনায় আল জারুদ ইসলাম কবুল করেছিল। মহানবীর মৃত্যুর পর তার গোত্রের আব্দুল কায়েস বিদ্রোহ করার ইচ্ছা পোষণ করছিল, সে তার লোকজনকে সতর্ক করে দেয় এবং তার ফলে এই গোত্রটি ইসলামের প্রতি অনুগত থেকে যায়; ফলে বাহরাইনের মুসলমানদের সাথে রাবেয়া গোত্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধে তাতে তারা অংশগ্রহণ করে নাই। তাদের এই নিরপেক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল (ইবনে হিশাম দ্রষ্টব্য)।

সন্ধি সমুহ:

যে সমস্ত চুক্তিতে নিরপেক্ষতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে অথবা রাষ্ট্রীয় দলিল বা নথি-পত্র যাতে নিরপেক্ষতার কথা বলা হয়ে থাকে, সেগুলি প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়। ঐ গুলির মধ্যে কিছু অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা হল:

ক. যখন মহানবী (সঃ) মদীনায় হিজরত করেন ও সেখানে একটি নগর

রাষ্ট্র গঠন করেন তখন তিনি বিশেষ করে মক্কা হতে সিরিয়ার পথে এবং মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী অমুসলিম আরব গোত্রদের সংগে মিত্রতা স্থাপন করে মুসলিম শক্তিকে সংহত ও সুদৃঢ় করার প্রয়াস পান। নিম্ন লিখিত চুক্তিটি বনু দামরাহ্ গোত্রের সংগে দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে সম্পাদিত হয় ঃ "তিনি (মহানবী)বনু দামরাহ্ কে হামলা করবেন না কিংবা তারাও তাঁকে হামলা করবে না, কিংবা তারা শত্রু সৈন্যদল বৃদ্ধি করবে না অথবা কোন রূপেই শত্রুদের সাহায্য করবে না।"

খ. অনতিকাল পরে একই গোত্রের অন্যান্য পরিবার গুলি একত্রিত হয় এবং পারস্পরিক সাহায্য ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়।

"আল্লাহ্ রাহমানুর রাহিমের নামে। ইহা আল্লাহ্র রাসুল মুহাম্মদের লিপি বা প্রতিশ্রুতি বনু দামরাহ্র জন্য, যাতে তাদের জান মালের নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে; তারা তাঁর সাহায্যের উপর ভরসা করতে পারে,যদি কেউ তাদের উপর হামলা চালায়, একমাত্র ব্যতিক্রম হবে যদি তারা ধর্মের নামে যুদ্ধ করে। এই আশ্বাস কার্যকরী থাকবে যতদিন সমুদ্র সলিল শুক্তিকে শিক্ত করতে থাকবে।

অনুরূপভাবে যখন মহানবী তাদের সাহায্য চাইবেন তারা তাঁকে সাহায্য করবে; এবং তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের নামে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তাদের সাহায্য করা তাদের আনুগত্য ও সততার উপর নির্ভর করবে।"

গ. হুদায়বিয়ার বিখ্যাত চুক্তিতে নিরপেক্ষতার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। বস্তুত সেখানে একটি বাচন ভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে, যা অভিধান লেখক বা শব্দকোষ সংকলকের মতানুযায়ী বিভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। সে শব্দটি হচ্ছে 'ইসলাল'। এর অর্থ তরবারী কোষমুক্ত করা এবং সেই সংগে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ এবং চুক্তিবদ্ধ অপর পক্ষের শত্রুকে সাহায্য করা। ইসলাল শব্দটি হুদায়বিয়া চুক্তিতে শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হুদায়বিয়া চুক্তির প্রাসঙ্গিক ধারাটি নিম্নরূপ:

".........এবং তারা উভয়ই দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বীকৃত এবং এই সময়ের মধ্যে জনগন শান্তি উপভোগ করবে এবং পারস্পরিক সংঘাত হতে বিরত থাকবে.......এবং আমাদের মধ্যে বক্ষ বদ্ধ থাকলে অর্থাৎ আমরা শর্তাবলী পালন করতে বাধ্য থাকবো এবং নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে কোন গোপন সাহায্য করা

ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে কোন কাজ করা চলবে না।"(ইবনে হিশাম)

নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত অন্যান্য চুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

ঘ. আল্লাহ্ রাহমানুর রাহিমের নামে। শত্রু এলাকা তাবরিস্তান ও জিল জিলান সম্বন্ধে ইহা খুরাসানের সেনাপতি ফারুর খানের পক্ষে সুওয়ায়িদ ইবনে মুকাররিনের প্রতিশ্রুতি।

"তোমরা আল্লাহ্র হিফাযত সম্বন্ধে নিশ্চিত । তিনি মহিমান্বিত,যদি তুমি তোমার দেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশের দস্যু-তসকরের লোভ-লালসার বিরোধিতা করতে পার এবং যদি তুমি আমাদের বিরোধী কোন বিদ্রোহীকে আশ্রয় না দাও এবং তুমি তোমার দেশের সীমান্তে মুসলিম সেনাপতিকে তোমার দেশের মুদ্রায় ৫ লক্ষ দ্রাকমা দান করবে।"

যদি তুমি এটা কর, আমাদের পক্ষে তোমাদের আক্রমণ করা, তোমার দেশে বিচরণ করা বা প্রবেশ করা ন্যায় সঙ্গত হবে না। যা হোক, অনুমতি নিয়ে আমরা তোমাদের দেশে নিরাপদে পর্যটন করতে পারবো এবং একই আইন প্রযোজ্য হবে তোমাদের পর্যটন সম্পর্কেও। এ ছাড়াও, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহীকে আশ্রয় দেবে না, আমাদের কোন শত্রুকে গোপন সাহায্য দেবে না এবং বিশ্বাস ঘাতকের মতো কোন কাজ তোমরা করবে না। নতুবা আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন চুক্তি হবে না।(তাবারী)

ঙ. মিসরের শাসনকর্তা কায়েস ইবনে সাদ খলীফা আলী(রাঃ) কে তৎকালীন গৃহযুদ্ধের সময় নিম্নলিখিত পত্র দিয়েছিলেন :

আল্লাহ্ রাহমানুর রাহিমের নামে-আমীরুল মুমিনিনকে-এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, এখানকার লোক নিরপেক্ষ থাকতে চায়।তারা আমাকে শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে নির্যাতন না করতে অনুরোধ করেছে।

এর উত্তরে আলী (রাঃ) বলেন, যে লোকদের কথা তোমার পত্রে উল্লেখ করেছ তাদের নিকট যাও,যদি অন্য মুসলমানের মতো তারা কথা শুনে তো ভাল, অন্যথায় তাদের শাস্তি দাও।

এরপরে শাসনকর্তা জওয়াব দিলেন: "আমি বিস্ময় বোধ করছি, হে আমীরুল মুমিনিন! আপনি কিরূপে ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিচ্ছেন, যারা আপনার নিকট হতে দূরে থাকছে এবং তদ্বারা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আপনাকে সুযোগ দিচ্ছে ! আপনি যদি তাদের সংগে যুদ্ধ করেন তাহলে

তারা আপনার বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করবে। সুতরাং, হে আমীরুল মুমিনিন আমার কথা শুনুন, ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন।

চ. ২৮ হিজরীতে মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাসে হামলা করেছিল এবং সেখানে নিম্নলিখিত শর্তে একটি চুক্তি হয়েছিল :

মুসলমানরা সাইপ্রাসের অধিবাসীগণের উপর আক্রমন করবে না, কিন্তু সেই সংগে তারা ওদের রক্ষা করবে না যদি অন্য কোন শক্তি মুসলমানদের আক্রমণ করে। যখন সিসিলির শাসক ফিমি তার বাইয়ানটাইন প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তিউনিসের আগলাবী রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তিনি সিসিলি আক্রমন করেন (২৪৪ হিঃ)। কিন্তু মুসলিম সেনাপতি, ফিমি ও তার লোকজনকে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকতে নির্দেশ দেন এবং বাইয়ানটাইনদের একা পরাস্ত করেন। (তাবারী)

ফকিহ্গণের মতে নিরপেক্ষতা :

পূর্বের আলোচনা হতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে ধারণা এবং বাস্তব রাজনীতিতে তার প্রয়োগ পূর্বেকার মুসলমানদের অবিদিত ছিল না। যেহেতু মুসলমান ফকিহ্গণ এই বিষয়টিকে পৃথক একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেন নাই, তথাপি এ বিষয়ে সমস্ত আইন কানুন, কিছু শান্তি সংক্রান্ত আইন-কানুনের মধ্যে ও কিছু যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন-কানুনের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তবে বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে যেমন নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইন উন্নত হয়েছে তেমন প্রাচীন কালে হয় নাই। তথাপি শায়বানীর প্রখ্যাত ব্যাখাকারী আল্লামাহ সারাখসী তাঁর রচনায় কিছু আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া ও অন্যান্য ফকিহ্গণের রচনায় আরো কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্যে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত পূর্ন আইন বিধি প্রনয়ণ করা না গেলেও যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু জানা যায়। যেমন (ক) যদি কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে এবং পরবর্তীতে তৃতীয় রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কিছু লোক বন্দী হয়ে দাসে পরিনত হয় এবং পরে মুসলমানরা ঐ রাষ্ট্রকে আক্রমন করে স্বাধীন করে এবং তাদের মিত্র শক্তির বন্দীদেরকে পুনরুদ্ধার করে, তাহলে তারা মুসলমানদের দাস বলে গন্য হবে ,কারণ তৃতীয় রাষ্ট্র তাদের বন্দী করতে গিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের এলাকার উপর আক্রমন বা হস্তক্ষেপ করেনি..... যদি তৃতীয় রাষ্ট্র ওদেরকে অধিকার করে নেয় তবে তারা এর ন্যায্য অধিকার ভুক্ত

হবে। অর্থাৎ এটা নিরপেক্ষতার ব্যতিক্রম হবে না যদি তৃতীয় রাষ্ট্রের অর্জিত সম্পদ বা বন্ধু রাষ্ট্রের যে সম্পদ ছিল তা মুসলমানদের হাতে ন্যায়সংগতভাবে আসে। (মাবসূত:সারাখসী)

খ. মুসলিম নাগরিকগণ যদি বিদেশে অবস্থান করে এবং সেই দেশ তৃতীয় কোন শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রে তারা তৃতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যদি সে রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে, ব্যতিক্রম হবে শুধু সেই ক্ষেত্রে যখন তারা স্বয়ং বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে তারা তৃতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় যুদ্ধ করতে পারে, তবে তাদের নিজেদের মুসলিম রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে নয়। এর দৃষ্টান্ত মিলে মহানবীর ভ্রাতুষ্পুত্র জাফরের নিকট হতে। তিনি যখন আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন সে দেশ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল এবং জাফর নাজ্জাশীর পক্ষে অস্ত্রধারন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন কারণ তিনি আশংকা করেছিলেন নতুন শাসক হয়তো তাঁকে আগের মত আশ্রয় দিবে না।

গ. যদি বিদেশী কোন নাগরিক মুসলিম রাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে আসে এবং মুসলমানদের সংগে যুদ্ধরত তৃতীয় রাষ্ট্রে যেতে চায়, মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের সংগে যোগদান করার জন্য, তাহলে এর অনুমতি তাকে দেয়া যাবে না। কারণ পাসপোর্ট বা অনুমতি তাদেরকে মুসলিম রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে বাস করার জন্য দেয়া হয়েছে, মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করার জন্য নয়। মুসলিম রাষ্ট্র মুসলমানদের জন্য অনিষ্টকর সব কিছু প্রত্যাখান করলে তা অবৈধ হবে না। অবশ্য তাদের মধ্য থেকে যদি দু-একজন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তৃতীয় রাষ্ট্রে যেতে চায় তবে তা প্রত্যাখান করা হবে না।

ঘ. উদার নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত: যাতে মুসলিম এলাকার ভিতর দিয়ে অন্য রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী অতিক্রম করতে পারে তা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে :

যদি তারা শক্তিশালী হয় এবং অনুমতিক্রমে মুসলিম এলাকার ভিতর দিয়ে অন্য দেশে যায় তাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং মুসলিম এলাকায় থাকা কালে কোন শত্রু কর্তৃক তারা যদি আক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের রক্ষা করবে না। তবে যখন মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজাগণ বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হবে তখন মুসলিম রাষ্ট্র তাদের রক্ষা করবে।

ঙ. নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মাল পত্র বোঝাই শত্রুর জাহাজ এবং শত্রুর মালপত্র বোঝাই নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজ সম্বন্ধে ফকিহগণ একটি সাধারণ নীতি নির্ধারন করেছেন যে, মালিকের নিরপেক্ষ থাকার ফলে মালপত্র ও নিরাপদ। (শরহ্ সিয়ার আল কাবির)

অপর দিকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত ধারণার উদ্ভব খুব বেশী দিন আগের নয়। আজ থেকে প্রায় ২০০/২৫০ বছর আগে তাদের মধ্যে এ ধারণার অস্তিত্ব ছিল অসম্পূর্ণ। গ্রোটিয়াস এ ধারণাকে Medii বা 'মাধ্যম' শব্দ দ্বারা এবং বাইংকার শুয়েক Non-Hostes বা 'মিত্র' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেন। ১৭শ শতাব্দীর শেষের দিকে সর্ব প্রথম ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় Neutral বা নিরপেক্ষ শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং ১৮শ শতাব্দীতে 'ভাটেল' আন্তর্জাতিক আইনে এ শব্দটি ব্যবহার শুরু করেন। ১৬শ ও১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে নিরপেক্ষতাকে ক্ষতিকর মনে করা হত। মেকিয়াভেলির মতে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে পার্শে অবস্থিত দেশের উচিত কোন না কোন পক্ষের সাথে যোগদান করা। এর একশো বছর পরে গ্রোটিয়াস বলেন, একটি দেশের সরকারের কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যাকে সে ন্যায়বান মনে করে তার সাথে সহযোগিতা করা এবং অন্যায়পন্থীর বিরোধিতা করা। তবে যখন ন্যায়পন্থী ও অন্যায়পন্থীর পার্থক্য করা যায় না তখন উভয়ের সাথে সমান ব্যবহার করা উচিত। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত নিরপেক্ষদের কোন অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়নি। যুদ্ধরত দেশগুলো যুদ্ধ করতে করতে নিরপেক্ষ দেশগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়তো। নিরপেক্ষ দেশগুলোও যে পক্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতো তার সাহায্য করতো। ১৭৯৪সালে মার্কিন কংগ্রেস সর্বপ্রথম আইন পাশ করে যে, যেসব দেশের সাথে যুদ্ধরত নয় (মার্কিন সরকার) তাদেরকে সামরিক সাহায্য দেয়া মার্কিন জনগণের জন্য নিষিদ্ধ। এ ভাবে তারা ১৮১৮ সালে নিরপেক্ষতার একটি পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরী করে। ১৮১৯ সালে বৃটেনও অনুরূপ আইন প্রনয়ণ করে। এ ভাবে ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশ নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইন তৈরী করে। সব শেষে ১৯০৭ সালে হেগ সম্মেলনের মাধ্যমে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন তৈরী হয়। (Lawrence: Principles of International Law - pp .475-77)

হেগ convention এ নিরপেক্ষদের প্রতি যুদ্ধরতদের কর্তব্য

সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা:

হেগ কনভেনশনের ৫ ও ১৩ নং সমঝোতা অনুসারে স্থল ও নৌ যুদ্ধে নিরপেক্ষদের সম্পর্কে যুদ্ধরতদের যে সব কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে তা নিম্নরূপ :

১. নিরপেক্ষ দেশের সীমান্তে কোন প্রকার সামরিক তৎপরতা চালানো নিষিদ্ধ।

২. সেনা বাহিনী, যুদ্ধসরঞ্জাম ও রসদপত্র নিরপেক্ষ এলাকার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

৩. নিরপেক্ষ এলাকাকে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

৪. নিরপেক্ষ এলাকায় বা পানি সীমানায় ঢুকে শত্রুকে গ্রেফতার করা যাবে না।

৫. নিরপেক্ষ দেশ আপন নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য যে আইন কানুন প্রনয়ন করবে যুদ্ধরতদের তা মেনে চলা কর্তব্য।

৬. জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কখনো কোন নিরপেক্ষ দেশের অধিকার লঙ্গন করা হলে লঙ্গনকারী দেশকে তার ক্ষতিপূরন দেয়া কর্তব্য।

যুদ্ধরতদের প্রতি নিরপেক্ষদের কর্তব্য:

আধুনিক আর্ন্তজাতিক আইনে নিরপেক্ষদের উপর যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের ব্যাপারে কিছু কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে, যেমন যুদ্ধরত কোন পক্ষকে যুদ্ধে সাহয্য করা যাবে না এবং উভয় পক্ষের সাথে একই রূপ আচরণ করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে এটাই নিরপেক্ষতার মৌলিক দায়িত্ব । দ্বিতীয়ত: যুদ্ধরতদের মধ্যে কাউকে বা উভয়কে যুদ্ধ সরঞ্জামাদি ও টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করা যাবে না। অর্থাৎ যুদ্ধ চলাকালে কোন নিরপেক্ষ দেশ যুদ্ধরত দেশের নিকট যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধের সরঞ্জামাদি বিক্রি করতে পারবে না এবং ঋণ দিয়ে ও সাহায্য করা উচিত নয়। তৃতীয়ত: যুদ্ধরত দেশের সৈন্যদের নিজ এলাকার উপর দিয়ে চলাচল করতে না দেয়া। এই বিধিটি আগে ছিল না, যেমন সপ্তদশ শতকে গ্রোটিয়াস লিখেন, 'যুদ্ধকারীরা নিরপেক্ষ এলাকার উপর দিয়ে সৈন্য নিয়ে যাওয়ার অধিকারী'। কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এ অধিকার দিতে অস্বীকার করা হলে তা বল প্রয়োগ করে আদায় করা যায়। ১৮শ শতাব্দীতে ভাটেল ও অনুরূপ কথা বলেন। (Lawrence: Principles of International Law, p.525) তবে ১৮৮০ সালের দিকে Hall এবং তাঁর সমসাময়িক লেখকগণ একে অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। চতুর্থত: যুদ্ধকারীদেরকে আপন সীমান্তে সামরিক অভিযান সংগঠন এবং যুদ্ধ জাহাজ সজ্জিত করার অনুমতি দেয়া যাবে না। ১৮৭১ সালে ওয়াশিংটন চুক্তিতে এই

সংযোজিত হয়। সবশেষে আপন নাগরিকদেরকে যুদ্ধকারীদের বাহিনীতে ভর্তি হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে।

পাশ্চাত্যে এই আইনের বহু ব্যতিক্রম ঘটেছে। এই সব বিধির মূল কথা নিরপেক্ষ জাতির যুদ্ধরত কোন পক্ষকেই সাহায্য করা উচিত নয় এবং ...র পর্যায় পৌছে এমন কোন কাজ করা উচিত নয়। অন্যকথায় বলা যেতে যে, নিরপেক্ষ দেশের সীমান্ত পবিত্র ও অলংঘনীয়। এই মূলনীতি হুবহু ...বে বিদ্যমান। ইসলামী আইনের চিরন্তন বিধিমালার মধ্যে একটি হলো এই যে জাতির সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে এবং যে জাতি ...ম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না তার ...ন্তে কোন প্রকার সামরিক তৎপরতা চালানো যাবেনা। শত্রু যদি যুদ্ধ করতে ...তে নিরপেক্ষ দেশের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলেও তার পশ্চাদ্ধাবন করা ...ত নয়। শত্রু পক্ষের যে সব লোক ঐ দেশে বসবাস করছে তাদের উপর কোন ...র আক্রমণ চালানো যাবে না।

সবশেষে বলা যায় যে, ইসলামী আইনে নিরপেক্ষতার মূলনীতি হচ্ছে- ... ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করে না এবং মুসলমানদের কারও ক্ষুন্ন করে না তার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে ...। এই নীতির আলোকে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিধি প্রনয়ন করা বৈধ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা

মরোক্কোর রাজধানী রাবাতে ১৯৬৯ সালে প্রথমে ২৪টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন গঠিত হয়। মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল আকসায় ইহুদীদের অগ্নিসংযোগের ঘটনার পরই ও.আই.সি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ও.আই.সি আল আকসাকে ইহুদীদের কব্জা থেকে মুক্ত করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামী ঐক্য-সংহতি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন সাধন, সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগীতা শক্তিশালী করণ, মুসলিম দেশগুলোর বর্ণ-বৈষম্য নির্মুল করা এবং সকল ধরনের উপনিবেশিকতার মূলোৎপাটন করা, মুসলিম পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়াসের সমন্বয় সাধন, মর্যাদা নিরাপত্তা স্বাধীনতা এবং জাতীয় অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত মুসলমানদের সমস্ত সংগ্রামকে জোরদার করা ইত্যাদি।

অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ইসলামী উম্মার জন্য চরম হতাশার মধ্যে এক অনির্বান আলোক বর্তিকা। নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারসমূহের প্রধানগণ ইসলামী উম্মার স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয় নিয়ে একত্রে বসবার, ভাবার পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করার একটি ফোরাম গঠন করেছেন সে হিসেবে এর গুরুত্ব অনেক বেশী। যদিও ও.আই.সি যে বিপুল সম্ভাবনা ও মহান উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে তা বাস্তবায়নে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে অতি সামান্যই।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বা ও.আই.সি মুসলিম জাহানের ৫৬টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি বলিষ্ট সংগঠন। বিশ্বের প্রায় একশত পঁচিশ কোটি মানুষের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হচ্ছে ও.আই.সি।

...আই.সি'র প্রতিষ্ঠা বা গঠন:

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা প্রথম থেকেই একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন ...সেবে গড়ে উঠেনি। ১৯৬৯ সালে এই সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ...কেটি দুঃখজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্র নায়ক এই সংস্থা গঠনের ...গিদ অনুভব করেছিলেন।

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে জয়ী হয়। অতঃপর ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসরাইলী অধিকৃত জেরুজালেমের পবিত্র আল- আকসা মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয়ার পর ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই বর্বরতা মোকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই ঘটনায় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৬৯ সালের ২৫ আগস্ট মিশরের রাজধানী কায়রোতে ১৪টি আরব দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে অভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য গোটা মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সে ভিত্তিতেই সৌদি আরব, মরোক্কো, ইরান, পাকিস্তান, সোমালিয়া, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়াকে নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটিও গঠিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসের ৮ ও ৯ তারিখ প্রস্তুতি কমিটি মরোক্কোর রাজধানী রাবাতে মিলিত হয়ে শীর্ষ সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ ও প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেন। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ১৯৬৯ সালের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর রাবাতে অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন। এ সম্মেলনে ২৪টি মুসলিম দেশ অংশ গ্রহণ করে।

প্রথম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ২২-২৭ মার্চ জেদ্দায় মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সমন্বয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২২টি দেশ যোগ দেয়। এই সম্মেলনে ইসলামী সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আব্দুর রহমানকে প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। ও.আই.সি এর দ্বিতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন করাচিতে অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ টি দেশ এ সম্মেলনে যোগ

দেয়। এ সম্মেলনেই ও.আই.সি এর খসড়া চার্টার অনুমোদিত হয় এবং ও.আই.সি'র বিধিবদ্ধ যাত্রা শুরু হয়। ১৪টি আর্টিকেল বা অধ্যায়ে বিভক্ত চার্টারে সদস্য রাষ্ট্রগুলির ৫টি অসাধারণ বিধি এবং সংগঠনের ৭টি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়।

ও.আই.সি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১৯৭১ সালের চার্টারে ও.আই.সি'র নিম্নলিখিত ৭টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত করা হয়:

১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামী সংহতি বৃদ্ধি করা;

২. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য মৌলিক ক্ষেত্রে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সদস্যদের সাথে পরামর্শমূলক সভার আয়োজন করা;

৩. সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ এবং সব রকমের উপনিবেশবাদের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করা;

৪. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৫. পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের সংগ্রামকে সমন্বিত ও সংহত করা এবং ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন করা এবং তাদের অধিকার আদায় ও মাতৃভূমি মুক্ত করার সংগ্রামকে সমর্থন দেয়া;

৬. মুসলমানদের মান-মর্যাদা, স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার সংরক্ষণের সকল সংগ্রামে মুসলিম জনগণকে শক্তি যোগানো;

৭. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে সহযোগীতা ও সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ও.আই.সি' এর নীতিমালা :

ও.আই.সি'এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ও.আই.সি সনদের ৫টি নীতি মেনে চলার অঙ্গীকার করা হয়েছে. এগুলি নিম্নরূপ:

১. সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পুরোপুরি সমতার নীতি;

... সদস্য দেশগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন;

... প্রত্যেক সদস্য দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও অখন্ডত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

... সদস্য দেশসমূহের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ শান্তিপূর্ণ পন্থায় আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা, আপোষ-মীমাংসা বা শালিসীর মাধ্যমে মিটমাট করা এবং

৫. কোন সদস্য রাষ্ট্রের ভৌগলিক অখন্ডত্ব, জাতীয় ঐক্য বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান বা বল প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা।

ও.আই.সি'এর সদস্য পদ:

বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্র এ সংস্থার সদস্য হতে পারে। সদস্য পদের জন্য মুসলিম শাসিত রাষ্ট্র হওয়া পূর্বশর্ত অর্থাৎ যে সমস্ত দেশে ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য আছে সে সমস্ত দেশ নিয়ে এই সংস্থা গঠিত। শুরুতেই এই সংস্থার সদস্য ছিল ২৪টি রাষ্ট্র। কিন্তু এর পরিধি অনেক বিস্তৃত হচ্ছে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫৬টি।

ও.আই.সি'এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো :

ও.আই.সি'এর প্রধান ৪টি শাখা রয়েছে:

১. শীর্ষ সম্মেলন
২. পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন
৩. সচিবালয় এবং
৪. বিশেষায়িত কমিটিসমূহ।

এই শাখাগুলি প্রসঙ্গে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

শীর্ষ সম্মেলন:

রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন ও.আই.সি'র সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ এবং এ সম্মেলন মুসলিম বিশ্বের সমস্যাবলী ও তা নিরসনের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার মুল ফোরাম। প্রতি তিন বছরে একবার ও.আই.সি'র

ও.আই.সি'এর অঙ্গসংগঠনসমূহ

ও.আই.সি'এর অধীনে কিছু অঙ্গসংগঠন রয়েছে যেগুলো উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বাস্তবায়নে মুল ভূমিকা পালন করে থাকে। সংগঠনগু হলো:

* আল-কুদস ফান্ড: জেরুজালেমের পুনাভূমি পুনরুদ্ধারের জ ফিলিস্তিনী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের সংগ্রামে সার্বিক সহযোগীতা প্রদা লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে এ কমিটি গঠিত হয়।

* International Commission for the Preservation Islamic Cultural Heritage;

* Islamic Centre for the Development of trad ১৯৮৩ সালে মরোক্কর রাজধানী ক্যাসাব্লাংকায় এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হ ও.আই.সি ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক বাণিজ্যি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা এ সংগঠনের মুল কা

* Islamic Foundation for Science, Technology a Development: ইসলামী দেশসমূহের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় এ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

* Islamic Centre for Technical Vocational and R search: ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের গাজীপুর জেলায় এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হ মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং কেমিক্যাল প্রকৌশলের ক্ষে দক্ষ জনশক্তি এবং প্রশিক্ষক সৃষ্টির প্রতায়ে তথা এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে।

* Islamic Turiprudence Academy: সৌদি আরবের জেদ্দা ১৯৮১ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

* Islamic Solidarity Fund: সৌদি আরবের জেদ্দায় ১৯৭ সালে এ সংগঠনটি গড়ে উঠে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিশেষ জরুরী প্রয়োজ

সাহায্য প্রদানসহ মসজিদ, হাসপাতাল, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ইসলামিক কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সহযোগীতা প্রদানের জন্য এ সংগঠনটি কাজ করে থাকে।

* Research Centre for Islamic History, Arts and Culture: ১৯৭৯ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়।

* Economic Social Research and Training Centre for the Islamic Countries: তুরস্কের আংকারায় ১৯৮৭ সালে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়।

ও.আই.সি ভুক্ত অন্যান্য সংগঠন

* International Islamic News Agency: আন্তর্জাতিক ইসলামিক সংবাদ সংস্থা: ১৯৭২ সালে সৌদি আরবের জেদ্দাতে সংস্থাটি গঠিত হয়।

* Islamic Development Bank: সৌদি আরবের জেদ্দায় ১৯৭৫ সালে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ও.আই.সি'র সদস্য দেশসমূহ এবং অন্যান্য দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ব্যাংক ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী ঋন দান ও প্রযুক্তিগত অনুদান প্রদান করে থাকে।

* Islamic Educational Scientific Organisation: মরোক্কোর রাজধানী রাবাতে ১৯৭২ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

* IslamicReserch and Training Instititute: সৌদি আরবের জেদ্দায় ১৯৮২ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ও.আই.সি ভুক্ত দেশসমূহের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক, ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং ইসলামী আইন কানুনের ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসছে।

* Islamic Trade Broadcasting Organisation: সৌদি আরবের জেদ্দায় এ সংগঠনটি অবস্থিত। এ ছাড়া ও.আই.সি'র তালিকা ভুক্ত কিছু

৮ম শীর্ষ সম্মেলন: ১৯৯৭ সালের ৯-১১ ডিসেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরানে ও.আই.সি'এর ৮ম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৫৫টি সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইস্যুতে ১৪২টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তেহরানে ঘোষণায় ইসরাইলের প্রতি নিন্দা জানানোর পাশাপাশি মুসলিম ঐক্য জোরদার করা ও ইসলামী কমনমার্কেট প্রতিষ্ঠার আশা করা হয়।

৯ম শীর্ষ সম্মেলন: ইসরাইলের কঠোর নিন্দা এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানানোর মধ্যে দিয়ে দোহায় ২০০০ সালের ১২-১৩ নভেম্বর ও.আই.সি'র ৯ম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম বিশ্বের ৫৬টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ এতে যোগ দেন। কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ইরাক ও বসনিয়া ইত্যাদি ইস্যুতে শীর্ষ সম্মেলনে প্রস্তাব নেয়া হয়। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি আলোচনায় ব্যর্থ হওয়া এবং নতুন করে সহিংসতা ও রক্তপাত শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে নবম ও.আই.সি' শীর্ষ সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। এ সম্মেলনে শীর্ষ নেতাদের অভিন্ন অবস্থানের প্রতিফলন ঘটেছে। নিরস্ত্র ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরাইলী বর্বরতার জন্য ও.আই.সি যে কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেছে তার সাথে অনেক দেশই একমত। যদিও ইসরাইলের সাথে তার সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি ও.আই.সি'এর সদস্যদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি, তবুও এ ঘোষণায় চেতনার সাথে সব মুসলিম রাষ্ট্রই একমত।

• প্রতিবারের মত এবারও ও.আই.সি' ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর ব্যাপারটি আলোচিত হয়। যদিও এর বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই না। অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য মুসলিম দেশগুলো সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দরিদ্রতম মুসলিম দেশগুলোর কোটি কোটি অধিবাসীর কল্যাণ হতো।

এদিকে ও.আই.সি' শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সন্তুষ্ট নয়, বিশেষ করে ইসরাইলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের এবং

ফিলিস্তিন নেতৃত্বের প্রতি সংহতি প্রকাশ করার জন্য। ও.আই.সি ইরাকের উপর যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বিমান হামলা বন্ধের পরোক্ষ আহ্বান জানিয়েছে।

ও.আই.সি'এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ:

আজ থেকে প্রায় ৩২ বছর আগে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ পর্যন্ত সম্মেলনের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের ৯টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় মরোক্কোতে। শেষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে কাতারে। সংস্থার ৭ম সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠানের দশটি ইনষ্টিটউশনের সাথে আরো ৪টি বিশেষ ইনষ্টিটিউশন বাড়ানো হয়েছে।

* ইসলামিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি (IESCO)
* ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (IDB).
* ইসলামিক আর্ন্তজাতিক নিউজ এজেন্সি (IINA) এবং
* ইসলামী সরকারী সংবাদ সংস্থা (IGNO)।

ইসলামী সংবাদ সংস্থার সচিবালয়সহ উপরোক্ত ইনস্টিটিউশন ও সংস্থার ৬টি অফিস সউদী আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। এগুলোর নয়টি কেন্দ্র রয়েছে তুরস্কে, ২টি সংস্থার অফিস রয়েছে মরক্কোতে। ২টি সেন্টারের একটি কাতারে, নাইজেরিয়া ও উগান্ডায় রয়েছে। ও.আই.সি'এর সচিবালয় ও এর অনুমোদিত সংগঠনের অফিস যেখানে রয়েছে এবং যে নিয়ম নীতিতে এর ক্রিয়াকর্ম চলছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনায় দেখা যায় রক্ষনশীল সদস্য রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে তুলনামুলকভাবে বেশী ক্ষমতাবান এবং প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন।

স্বাভাবতই সবার বিশ্বাস সৌদী আরবের প্রভাব বলয়েই সবাই আছে। তা এরকম বিশ্বাস পোষণ করার পেছনেও কতগুলো কারণ নিহীত আছে। তা নিম্নরূপ:

১. সৌদী আরবের বাদশাহ মরহুম ফয়সাল সর্বপ্রথম এ সংস্থা গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

২. বেশীর ভাগ সম্মেলন সৌদিআরবের জেদ্দায় হয়ে আসছে।

৩. ও.আই.সি'এর বাজেটের দশ শতাংশ সউদী সরকার যোগান দিয়ে যাচেছ।

৪. ও.আই.সি'এর শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই সউদী নাগরিক।

৫. সংস্থার রক্ষনশীল সদস্য ও নিম্ন পর্যায়ের আয়ের উপর নির্ভরশীল সদস্য উভয়কে সউদী সরকার অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে যাচেছ। ইসলামী বিশ্বের সমস্যা নিয়ে দেন দরবার করাটা এ সংস্থার নৈতিক দায়িত্ব। তাছাড়া এর আলোচ্য সূচীতে অনান্য সমস্যাও স্থান পেয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ ৭ম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে সে সম্পর্কে আলোচিত বিষয়বস্তু ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী স্থান পেয়েছে। ঐ সব সমস্যা পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ সংশ্লিষ্ট, নিরাপত্তা ও সংহতি বিষয়ক, নিরস্ত্রীকরন, উপনিবেশিক কারনে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের ক্ষতিপুরন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সমঅধিকার, ধ্বংসাত্মক রাসয়নিক দ্রব্য মজুদকরন ইত্যাদি বিষয়সমুহ। মজার বিষয় হলো কানাডায় ইলিক্যাস্ত্র শীর্ষ ৭ জাতীয় নেতারা ১৯৯৫ সালে এর চেয়েও কম সমস্যা নিয়ে যে প্রস্তাব নিয়েছিলেন তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৯।

শুরুতে ও.আই.সি ২৪টি দেশ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৬ তে। ১৯৯৫ সালের ২৭-২৮ জুন সম্মেলনে সংস্থার মহাসচিব হামিদ আল গাবিদ তার ভাষনে বলেছিলেন, সংস্থার সফলতার দরুন দ্রুত এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচেছ। সদস্য সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচেছ তেমনি মতদ্বৈততাও বেড়ে যাচেছ।

ও.আই.সি'র সদস্যদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যসমূহে বিভিন্নতা বিদ্যমান। ধনী ও দরিদ্র সদস্যগুলোর মাথাপিছু গড় আয়ের ব্যবধান ১ থেকে ১৫০ পর্যন্ত। ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় ব্যাবস্থায় একের সাথে অপরের পার্থক্য বিরাজমান। ১২টি সদস্য রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় রয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষতা অথচ ও.আই.সি'র সদস্য হয়ে ইসলামী ব্যবস্থার অংশ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাজনীতির মৈত্রী গ্রুপিং এ বিভিন্নতা বিভিন্নভাবে লক্ষনীয়। তবে ও.আই.সির কোন প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য বল প্রয়োগের ক্ষমতা

নেই। নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থাকলেও সমঝোতার ভিত্তিতে তা কার্যকর করা যেতে পারে। অবশ্য ৩২ বছরের একটি সংগঠন আর সদস্য সংখ্যা ৫৬ রাষ্ট্র ভূমন্ডলীয় পরিসরে তার প্রভাব রাখা সঙ্গত কারনেই প্রয়োজন ছিল। অসংখ্য সমস্যার মধ্যে ফিলিস্তীন সমস্যা ও.আই.সির এক বড় সমস্যা।

বায়তুল মোকাদ্দাসের আল আকসা মসজিদে ইহুদিদের আগুন দেয়ার ব্যাপারে সমবেত প্রচেষ্টায় তার প্রতিরোধ করার অঙ্গিকার সত্বেও আজ পর্যন্ত তার কিছুই করতে পারেনি। ফিলিস্তিনি সমস্যার দায়িত্ব ৪ জন উপমহাসচীবের একজনের উপর অর্পন করা হয়েছিল। কিন্তু আজ মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় ও.আই.সির কোন ভূমিকা নেই বলেই মনে হচেছ।

ইরাক-ইরান যুদ্ধে ও.আই.সি কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। এমনকি তাদের আপসের টেবিলে ও বসাতে পারেনি। আফগানিস্থানের ব্যাপারেও এর ব্যর্থতা পরিষ্ফুট হয়েছে। ১৯৮২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্থানে আক্রমন চালায়। ও.আই.সি'র সদস্য সিরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, আলজেরিয়া, লিবিয়া, ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা তাদের পুরানো বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। একমাত্র কাজ তারা করেছে আফগান উদ্বাস্তুদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এভাবেই ও.আই.সির ভূমিকা ফিলিস্তিন ইরাক-ইরান যুদ্ধ ও আফগানিস্থানের ব্যাপারে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে বসনিয়ার ব্যাপারে ও.আই.সি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছে নিঃসন্দেহে।

বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এক চতুর্থাংশ মুসলিম রাষ্ট্র। এদের অবস্থানগত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের বড় সুযোগ রয়েছে। বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চে নতুন শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

যদিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে সংস্থার জন্ম হয়েছিল। তথাপি ও এসংস্থা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালনে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। সারা বিশ্বে আজ নতুন ভাবনার অবকাশ পরিলক্ষিত হচেছ যে, মুসলিমরা সুসংহত হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। তবে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রথম পদক্ষেপ হবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা।

বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৬শত কোটি। এর মধ্যে প্রায় একশত পচিশ কোটি মুসলমান। এরা সবাই সংস্থাভূক্ত দেশগুলোর অধিবাসি। আগামী ৩৬ বছরে এ সংখ্যা ২ দশমিক ৯ শতাংশ হারে দ্বিগুন হবে। তার তুলনায় ইউরোপের লোকসংখ্যা দ্বিগুন হতে সময় নেবে ৮০ বছর।

১৯৯০-৯৫ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৬ শতাংশ। ঐ একই সময়ে সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ২.৪ শতাংশের সামান্য উপরে। ঐ একই সময়ে ওপেকভুক্ত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ছিল ০.৪ শতাংশ। ১৯৯৩ সালে এ সংস্থার গড় আয় ছিল ৮৬৩ ডলার। অথচ উন্নত দেশের গড় আয় ছিল ১৮২৭৪ ডলার। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো বাদ দিলে অন্য সদস্য দেশের আয় খুব বেশী হবেনা।

ও.আই.সি সদস্যভূক্ত দেশগুলোর সামরিক খাতে ব্যয় অগ্রগামী রয়েছে। গড় প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় সামরিক ব্যয় ১৯৯৩ সালে ছিল ৮ শতাংশ। বিশ্বে এ হার সর্বোচ্চ। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩ সালে ও.আই.সি সদস্য দেশের ঋনের অংক ২শত ৭৫ কোটি ডলার থেকে বৃদ্ধ পেয়ে ৪শত ৫১ কোটিতে দাড়ায়। অথচ উন্নয়নশীল দেশের জন্য এর বৃদ্ধির হার ছিল ৩০ শতাংশ মাত্র। অথচ এদের বৃদ্ধির হার হলো ১১০ শতাংশ। সংস্থাভূক্ত দেশগুলো ঋনের উপর ২২ শতাংশ হারে সুদ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়েছিল। অথচ উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড়ে ১৪শতাংশ হারে তার ঋনের সুদ আদায় করেছে।

অমুসলিম দেশগুলো এ সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে মূলধন বিনিয়োগ করেনি। তেল উৎপাদন করেনা এমন সদস্য দেশ ১৯৯৩ সালে মাত্র ১ কোটি ডলার বিনিয়োগ পেয়েছিল। সদস্য ভূক্ত দেশগুলোর সাথে ব্যবসায় জড়িত আছে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো। ৭০ এর দশকের পর যদিও এ দেশগুলোর ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়েছে। তবুও বিদেশী বানিজ্য ১২% এর বেশী বাড়েনি। এর অন্যান্য কারনের অন্যতম হলো এরা ইউরোপীয় শক্তির উপনিবেশ ছিল। তাই এখনও ঐসব শক্তি এদেশগুলোর ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব বজায় রেখেছে৭

ও.আই.সি' তার ইতিপূর্বেকার ব্যর্থ ভূমিকার জন্য যদিও ইসলামী দুনিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে সমালোচিত হচ্ছিল কিন্তু নবম শীর্ষ সম্মেলনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে একদিকে যেমন মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় হয়েছে, তেমনি সমস্যাবলীর ব্যাপারে তার আগ্রহ এবং প্রতিকারে সক্রিয়তার ভাব পরিস্কুট হয়ে উঠেছে। এভাবে যদি মুসলিম দেশসমূহ সকল সময়ে এই জাতিসত্তার কোনো অংশের প্রতি কারো জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐকাবদ্ধ হয়ে সোচ্চার হয়ে উঠতে ও তার প্রতিকারে সক্রিয়তার পরিচয় দিতে পারে. তাহলে প্রতিপক্ষ পৃথিবীর যতবড় শক্তিই হোক না কেন তারা মুসলমানদের প্রতি কাংঙ্খিত সম্মান দিতে বাধ্য হতো। বলাবাহুল্য ও.আই.সি' গঠনের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে. ও.আই.সি' সে লক্ষ্যে তেমন একটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ও.আই.সি' ভুক্ত কোনো কোনো রাষ্ট্রের বিরূপ ভূমিকা মুসলমানদের প্রতি অন্যায় অবিচারকারীদের উৎসাহকে দ্বিগুন বাড়িয়ে দেয় বৈকি। যেমন-ইসরাইলী দমন-নিপীড়ন এখনো অব্যাহত রয়েছে সেক্ষেত্রে ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনকারী মিশর ও জর্দান এর উদ্যোগে সূচনাপর্বে প্রেসিডেন্ট আরাফাত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ইয়াহুদ বারাকের নিষ্ফল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তার পরেই মিশরের শারমুশ শায়েখ-এ আরব লীগের লজ্জাজনক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকের পর ইসরাইলের পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়। অথচ অপর দিকে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের প্রতি জুলুম-নিপীড়নও অব্যাহত থাকে। প্রথমে ঐ ত্রিপক্ষীয় বৈঠকটির কারণে আরব লীগের অধিবেশনের কোনো গুরুত্বই থাকেনি। কারণ আমেরিকা এবং অন্যানা আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রায় সকলে ইরাইলের অমানবিক তৎপরতা ও মুসলমানদের হত্যার প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

তারপরও কাতার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া এবং সর্বসম্মিতিক্রমে সেখানে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এটি কম কথা নয়। অন্তত: এর মধ্যে দিয়ে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি এবং তাদের পারস্পরিক পুন:ঐক্যের একটি পরিবেশ গড়ে উঠছে। বিশেষ করে গৃহীত প্রস্তাবলীর মধ্যে ইসরাইলের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা

আহ্বানটি এ সময় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এছাড়া তেলাবিব থেকে মার্কিন দূতাবাস জেরুজালেমে স্থানান্তরের সম্ভাব্য কোনো পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে মুসলিম নেতারা যে বলিষ্ঠ ভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন, এজন্য আমরা তাদের প্রতি জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। সেই সাথে মুসলিম উম্মাহ মুসলিম নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এও প্রত্যাশা করে যে, তাদের গৃহীত কোনো প্রস্তাবে ফিলিস্তিনীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে যাবেন। দোহার ঘোষণা পুরোপুরি বাস্তবায়নে মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঐক্য ও দৃঢ়তা অটল থাক, এটাই আমাদের কাম্য।

বিরোধ নিষ্পত্তিতে ও.আই.সি'এর ট্রাইব্যুনাল গঠন আবশ্যক:

ও.আই.সি'এর লক্ষ্য হচেছ ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে সংহতি জোরদার করা। ইসলাম হলো একটি বাস্তব ধর্ম যাতে মানব জীবনের প্রতিটি দিকের প্রতিফলন ঘটেছে। এই মহান ধর্মে, সামাজিক মূল্যবোধের উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শত্রুরা এই মানব ধর্মকে বিকৃত করেছে। তারা মুসলিম অনুসারীদের মধ্যে দ্বৈবিতার বীজ বপন করেছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে ভূ-খন্ডগত বিরোধ ও মতানৈক্যের কারণে এসব অনভিপ্রেত বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে। কয়েকটি এশিয় ও আফ্রিকান দেশের মধ্যে অনৈক্য ও সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামী বিশ্ব এর ব্যাতিক্রম নয়।

ও.আই.সি সম্মেলনে ভূ-খন্ডগত বিরোধ ও মতানৈক্য প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিনত হয়েছে। বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এই বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ও.আই.সি'এর কৌশল অবলম্বন করা উচিৎ। প্রথম ও গুরুত্বপূর্ন কৌশল হতে পারে, প্রতিবেশী ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে চুক্তি সাক্ষর করা। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এসব চুক্তি কাগজে কলমে রয়ে গেছে ফলে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। দুই বা ততোধিক দেশ ভূখন্ডগত বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। এসব সমস্যা নিষ্পত্তিতে ও.আই.সিএর ট্রাইব্যুনাল গঠন আবশ্যক। ১৯৯৭ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল খারাজি বলেছেন, ইসলামী বিশ্ব পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াধীনে রয়েছে।

...লামী বিশ্বের সাফল্য আজ বহুজাতিক বিশ্বের ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টিশীল, গঠনমূলক ...ক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সম্মেলনে ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাভেদ জারিফ বলেন, ...লিম দেশগুলোর মধ্যে সংহতি জোরদার করার ব্যাপারে ও.আই.সি হলো ...কটি কার্যকর মাধ্যম। তিনি ইহুদি শাসকদের জবর দখল নীতির বিষয়টি তুলে ...রে বলেন, তাদের বিধ্বংসী অস্ত্রের মজুদ আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রতি হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপরের বিভিন্ন আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, সংস্থার বিভিন্নমুখী কাজকে গতিশীল করতে হলে ও. আই. সি' এর সংস্কার সাধন করতে হবে। আর এজন্য বিরোধ নিষ্পত্তিতে ও.আই.সি'র ট্রাইবুনাল গঠন আবশ্যক।

ও.আই.সি এবং বাংলাদেশ:

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ও.আই.সি এর বিভিন্ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত হয়েছে। মূল সংস্থার সদস্য ছাড়াও বাংলাদেশ ও.আই.সি'র সব কয়টি অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

বাংলাদেশ তিন সদস্য বিশিষ্ট আল কুদস শীর্ষ কমিটি, পনের সদস্যের আল-কুদস কমিটি, নয় সদস্য বিশিষ্ট ইরান-ইরাক যুদ্ধে মধ্যস্থতাকারী শান্তি কমিটি, ১৩ সদস্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, তের সদস্যের ইসলামী অর্থ তহবিলের স্থায়ী কমিটির সদস্য। ১৯৮৩ সালের ৬ হতে ১১ ডিসেম্বর ঢাকায় ও.আই.সি'র চতুর্দশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ও.আই.সি'র একটি অঙ্গ সংগঠন যথা- Ialamic Centre for Technical and Vocational Training and Research নামক সংগঠনটি ১৯৮৩ সালে বাংলদেশের গাজীপুর জেলায় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক সুনিবিড়। বাংলাদেশ ফিলিস্তিনীদের আত্মনিয়ন্ত্রনাধীকারের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমানের ভূমিকা সারাবিশ্বে প্রসংশিত হয়েছিল।

মুসলিম বিশ্বের যে কোন প্রকার সমস্যায় বাংলাদেশ সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। ১৯৮৩ সালে ঢাকায় পাঁচদিনব্যাপী ও.আই.সি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশের সাথে ও.আই.সি এর সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়।

১৯৯০ সালে [illegible]রে অনুষ্ঠিত ও.আই.সি'র শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের ভূমিকার ভূয়শী প্রসংসা করা হয়। ১৯৯৩ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তে মোতাবেক বাংলাদেশ বসনিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করে। ১৯৯৭ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত ও.আই.সি'র ৮ম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও.আই.সি'এর নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন এবং মুসলিম বিশ্বের সকল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ও.আই.সি কে একটি কার্যকর সংস্থারূপে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

তেহরান সম্মেলনের ২য় দিনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুসলিম উম্মাহার অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ৭ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দান এবং একটি অভিন্ন বাজার প্রতিষ্ঠায় সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ও.আই.সি'র সদস্যপদ লাভের গোড়া থেকেই বাংলাদেশের ভূমিকা প্রশংসিত হয়ে আসছে। জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ ও.আই.সি'র ৩য় বৃহত্তম দেশ। ফলে সদস্য দেশসমূহের কাছে বাংলাদেশের আবেদন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বুরকিনা ফাসোতে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি মুসলিম দেশসমূহের ভ্রাতৃত্বের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব তুলে ধরেন।

অষ্টম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত ইশতেহার সমূহ:

১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর তেহরানে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ৮ম শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশননের শেষে যে ইশতেহার প্রকাশিত হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হলঃ

১৯৯৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তেহরানে অনুষ্ঠিত মর্যাদা সংলাপ ও অংশীদারিত্বের সম্মেলন শীর্ষক ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অষ্টম শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত ইশতেহারঃ

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য দেশ সমূহের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ, বাদশাহগণ ও প্রেসিডেন্টগণ ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দের ৯ থেকে ১১ ডিসেম্বর তাদের অষ্টম সম্মেলনে (মর্যাদা সংলাপ ও অংশীদারিত্বের সম্মেলনে) মিলিত হন।

ইসলামী জাহানের সংহতি ও নিরাপত্তা:

ইসলামী জাহানের সংহতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ৮ম শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষণা হল:

* এই শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ ইসলামী জাহানের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা ও বৃদ্ধি করণের অঙ্গিকার করেন। পরস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং এ লক্ষ্যে যথাযথ পথ নির্দেশনা প্রদান ও তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব সদস্য দেশগুলোর সংহতি ও নিরাপত্তা বিষয়ক সরকারী বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত করা হয়।

* সদস্য দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়কে শক্তিশালী করার ইচ্ছার ওপর এবং সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারনের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

* এ সম্মেলনে অভিন্ন ইসলামী বাজার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

* সম্মেলনে ও.আই.সি'র নেতৃবৃন্দ ফিলিস্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাস, সিরিয়ার মালভূমি ও দক্ষিণ লেবাননসহ আরব ভূ-খন্ডসমূহের জবর দখলের নিন্দা জ্ঞাপন, দখলকৃত সমস্ত আরব ভূ-খন্ড মুক্ত ও ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার প্রত্যার্পণের দাবী করেন।

* সম্মেলনে বাইতুল মোকাদ্দাস ও মুসজিদুল আকসার পুনরুদ্ধার এবং বাইতুল মোকাদ্দাসকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১০

* সম্মেলনে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলিম জনগণের সাথে সংহতির ওপর গুরুত্বারোপ, আফগানিস্থানে সংঘর্ষ সহিংসতা ও রক্তপাত বন্ধ করা ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক তৎপরতার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং সেই সাথে আমেরিকা প্রজাতন্ত্র কর্তৃক আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রে হামলা, সীমালংঘন ও ভূখণ্ড দখলকে প্রত্যাখান করা হয়।

* এ সম্মেলনে জাতিসংঘের প্রস্তাব সমূহের ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মিরের জনগণের স্বীয় ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার আদায় এবং সাইপ্রাসের তুর্কী মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

* সম্মেলনে সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদ ও তার বহি: প্রকাশের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন এবং উপনিবেশবাদ বা বৈদেশিক আধিপত্য বা বিজাতীয় দখলদারীর বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের ক্ষেত্রে ও.আই.সি এর আচরন বিধির নীতিমালা অনুসরণের অঙ্গিকার ও এ ব্যাপারে একটি চুক্তি সম্পাদন এবং সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দান থেকে বিরত থাকা, সন্ত্রাসীদের শাস্তিদানের ও সন্ত্রাসে সহায়তাকারী চক্রকে প্রতিহত করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

* সম্মেলনে ইসলামের সমুন্নত শিক্ষাসমূহ বিশেষতঃ ধৈর্য, ন্যায়নীতি ও শান্তির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সমঝোতা ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বন্ধের আহ্বান জানানো হয়।

* এ সম্মেলনে ভূল বোঝাবুঝি দুরীকরণ এবং শান্তি, যুক্তি ও ন্যায়নীতির দ্বীন হিসাবে ইসলামের সঠিকরূপ তুলে ধরা এবং মানব জাতির নিকট ইসলামের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও অবিনশ্বর মূলনীতিসমূহ তুলে ধরার জন্যে তথ্য ও গণসংযোগ ক্ষেত্রে কারিগরী সাফল্যের সদ্ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

ভারসাম্যপূর্ণ ও টিকসই সর্বাত্মক উন্নয়ন:

ভারসামাপূর্ণ ও টিকসই সর্বাত্মক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয় তেহরান ঘোষনায় স্থান দেয়া হয়।

* ইসলামী বিশ্বের জন্য আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সর্বাত্মক ভারসামাপূর্ণ ও টিকসই উন্নয়নের অপরিহার্যতার বিষয় বিবেচনা করে সম্মেলনে চিন্তা ও অভিজ্ঞার বিনিময় এবং ইসলামী উম্মাহার সকল শ্রেণীর জনগণের পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং ইসলামী মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কায়রো ঘোষণার লক্ষ্য ও মূলনীতির প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত ও তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

* সম্মেলনে ইসলামী বিশ্বের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পুঁজি বিনিয়োগের জন্য সদস্য দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

* সম্মেলনে মুসলিম নারীদের মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন এবং ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সামাজিক জীবনের সব ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থাকে শক্তিশালী নীতিমালা গ্রহণ :

ও.আই.সি কে নীতিমালা করণের জন্য সম্মেলনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়-

ক) নেতৃবৃন্দ ও.আই.সি কে অধিকতর কর্মতৎপর ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা ও পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে এর সঙ্গতি বিধানের জন্য সংস্থার কাঠামোর আশু:সংশোধন ও পরিবর্তনের লক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থার মহাসচিব ও সভাপতির সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ গ্রুপকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

খ) সম্মেলনে আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত গঠনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য সদস্য দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং এ ব্যাপারে মুসলিম দেশসমূহের পার্লামেন্ট প্রতিনিধিদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অধিবেশনসমূহে পারস্পারিক সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানানো হয়।

গ) সদস্য দেশসমূহের সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিষয় ভিত্তিক পরামর্শ ও মহাসচিবের সহযোগিতায় অত্র ইশতেহার বাস্তবায়নের বিষয়ে খোঁজ নেয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতির নিকট আবেদন জানানো হয়।

ঘ) মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১১.১২.৯৭ তারিখে ইসরাইলকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে নিন্দা করে অধিকৃত সমগ্র আরব ভূ-খন্ড সমর্পনের দাবী জানায়। নেতৃবৃন্দ ইরান ও লিবিয়ার তৈল ও গ্যাস ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করন সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের একটি আইনকেও নাকচ করে দেন। ৫৬ জাতী ইসলামী সম্মেলন সংস্থার তেহরান শীর্ষ সম্মেলনের শেষদিনে সন্ত্রাস মোকাবিলার জোরদার আহবান জানান হয়।

শীর্ষ সম্মেলনের শেষদিন ইরানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামীর সমাপনী ভাষনের প্রাক্কালে তেহরান ঘোষনা গৃহীত হয়। তেহেরান ঘোষনায়, মুসলিম দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৯৬ সালের ইরান-লিবিয়া নিষেধাজ্ঞা আইন নাকচ করে দেন। মুসলিম দেশগুলি এই এক তরফা ব্যবস্থা ও তার বাস্তবায়ন নাকচ করে সকল দেশকে এই আইন বাতিল গন্য করার আহবান জানান। মার্কিন কংগ্রেসে গৃহীত এই আইনে ইরান অথবা লিবিয়ার তৈল বা গ্যাস শিল্পে ৪ কোটি ডলারের বেশী বিনিয়োগে সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ওয়াশিংটনকে এই দুই দেশের সন্ত্রাসকে উৎসাহদান এবং পারমানবিক অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত করে তাদেরকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে সম্পূর্ন বিচ্ছিন্ন করার দিকে এগিয়ে দেয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯৯৪ সালে কাসাব্লাংকায় অনুষ্ঠিত ও.আই.সি'র শীর্ষ সম্মেলনে অনুমোদিত সন্ত্রাস মোকাবিলায় বিধিমালার প্রতি তাদের অঙ্গিকার পূর্নব্যক্ত করে জাতিসংঘের উদ্যোগে সন্ত্রাস সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহবান জানায়। ও.আই.সি'র রাষ্ট্র গুলোর উপনিবেশিক অথবা বিদেশী শাসনাধীন অথবা বিদেশী অধিগ্রহনাধীন এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার স্বীকার করে সকল ধরনের সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা করেন।

ও.আই.সি সম্মেলন ও যুক্তরাষ্ট্র:

তিনদিন ব্যাপী ও.আই.সি তেহরান শীর্ষ সম্মেলনে মোট ১৪২টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন প্রস্তাব হচ্ছে - আরব ভূমি থেকে ইসরাইলী সৈনা প্রত্যাহার, কাশ্মীর নির্যাতন বন্ধ, বাবরী মসজিদ পুর্নঃ নির্মাণ এবং ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার রক্ষণ ইত্যাদি। মসজিদুল আল আকসায়

অগ্নি সংযোগের ঘটনা থেকে ও আই সি জন্ম লাভ করে। ১৯৬৯ সালে ইহুদীরা বায়তুল মোকাদ্দেসে ইসলামের প্রথম কেবলা আল-আকসায় অগ্নি সংযোগ করে। ইহুদিদের এই ঘৃন্য কর্মকান্ডে মুসলিম বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা উপলব্ধি করে যে, তাদের মধ্যে পারস্পারিক অনৈক্যের কারনেই ইসলামের দুশমন ইহুদিরা মসজিদুল আল আকসায় অগ্নি সংযোগ করার সাহস পেয়েছে। এ উপলব্ধি থেকে তদানিন্তন বিশ্বের মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলিম উম্মাহার কল্যানে একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাট ফরম গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। সৌদি আরবের মরহুম বাদশাহ ফয়সালের দিক নির্দেশনা ও বলিষ্ট নেতৃত্বে গঠিত হয় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বা ও আই সি।

১৯৭৯ সালে মরহুম ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফল হয়। ইরানে যতদিন রেজাশাহ ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন ইরান ছিল আমেরিকার ঘনিষ্ট মিত্র। রেজাশাহ এর ক্ষমতার অবসান হলে এ দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। যুক্ত রাষ্ট্র ইরানকে পংগু করা জন্য একটির পর একটি চক্রান্ত করতে থাকে। বিগত বছরে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপর বিনিয়োগ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর তুরস্কের ডাকে ইসলামপন্থী প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দিন আরবাকন তেহরান সফরে এসে ইরানের সঙ্গে তেলের পাইপ লাইন নির্মানে ২ হাজার কোটি ডলারের একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। ইরানে আরবাকানের এ সফরে আমেরিকা উষ্মা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। কিন্তু আরবাকান আমেরিকার আপত্তি ও অসন্তোষে ইরান সফরে নিরুৎসাহিত হননি। বলতে গেলে আমেরিকাকে উপেক্ষা করে তিনি ৩ দিন ব্যাপী তেহেরান সফর করেন।

যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান, সুদান, লিবিয়া, ইরাক ও ইরানকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং ইসরাইলকে একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে মনে করে। তেহরানে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যে যুক্তরাষ্ট্র চরমভাবে হতাশ হয়েছে। মুসলিম দেশগুলি দরিদ্র হওয়ায় তারা কম বেশী ধনী দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতাকে ধনী বিশ্বের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচেছ। অর্থনৈতিক সহায়তা লাভের আশায় বেশীরভাগ মুসলিম দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ইচছার বাইরে পা ফেলার সাহস পায় না।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথীর মোহাম্মদ সম্প্রতি ইষ্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ এর সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন যে, মুসলিম দেশগুলোর যুক্তরাষ্ট্রের দুরভি সন্ধি সম্পর্কে যে ওয়াকিবহাল নয়, তা নয়। তবে সব গুলোও আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারে না। মাহাথির মোহাম্মদ যথার্থ সত্য কথাটিই অকপটে বলেছেন

তার মত সাহস নিয়ে কথা বলার জন্য চাই মালয়েশিয়ার মত একটি উন্নত দেশ। ৫৬টি মুসলিম দেশের সবকটি দেশ মালয়েশিয়ার মত স্বয়ংসম্পুর্ণ হলে এতদিনে বিশ্বে মার্কিন প্রভূত্বের অবসান হতো।

পরিশেষে বলা যায় যে সুদীর্ঘ প্রায় দুই যুগ অতিবাহিত হয়ে গেলেও ও.আই.সি তার অভিষ্ট লক্ষ্য থেকে বহু দুরে রয়ে গেছে বললেও অত্তুক্তি হবে না। আন্তর্জাতিক ইসলামী সংবাদ সংস্থা স্থাপন, বানিজ্য শিল্প ও পন্য বিনিময়ের জন্য ইসলামী চেম্বার প্রতিষ্ঠা, ইসলামী পুঁজি সংস্থা গঠন, ইসলামী জাহাজ মালিক এসোসিয়েশন কায়েম, ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা কায়েম, অভিন্ন বাজার; একক ইসলামী বিনিময় মুদ্রা প্রচলন ইত্যাদি এখনও পরিকল্পনা পর্যায়ে রয়ে গেছে। ইসলামী ভাতৃত্বের চাইতে কোন কোন ক্ষেত্রে উপনিবেশিক ও নব্য আধিপত্যবাদী শক্তির তাবেদারই প্রাধান্য লাভ করেছে। বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, উপসাগরীয় বিরোধ ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই কাংক্ষিত ও প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি ও আই সি। ইহুদী-খ্রীষ্ট, ব্রাহ্মনবাদী শক্তি দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে দলিত হয়েছে মুসলিম স্বার্থ, নির্যাতিত নিগৃহীত হয়েছে উম্মাহর সদস্যরা অন্যায় জুলুমের শিকার হয়েছে একাধিক মুসলিম দেশ কিন্তু তা প্রতিহত করার জন্য ও আই সি গ্রহন করতে পারেনি বলিষ্ঠ কোন পদক্ষেপ, নিতে পারেনি প্রতিরোধের কার্যকর পদক্ষেপ। তবুও এর মধ্য দিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে টিকিয়ে রেখেছে নিজ অস্তিত্বকে।

ও.আই.সি নিজেই এক বড় সাফল্য। এর উপযোগীতা সীমাহীন, এর সম্ভাবনা অফুরন্ত। প্রায় দেড়শ কোটির এক জাতি, ৫৬টি যাদের রাষ্ট্র, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের যারা মালিক, একই বিশ্বাস ও তাহজীব-তমদ্দুনের ধারক ও বাহক এই উম্মাহার অনন্ত সম্ভাবনাকে বস্তব রূপ দিতে পারে একমাত্র ও আই সি-ই। এজন্য পরাশক্তির তল্পীবহন ও বিজাতীয় সংস্কৃতির লালন, স্বার্থান্বেষী চিন্তা ইত্যাদি, আত্মবিধ্বংসী কার্যাবলী পরিত্যাগ করে সীসা ঢালা প্রাচীরের মত মজবুত ঐক্য, ইস্পাত দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দাড়াতে হবে ও আই সিকে। এভাবে করতে হবে তাকে বর্তমান শতাব্দির সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা। যেমনটি আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে সুরা আল এমরানে বলেন," তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারন কর"।

গ্রন্থপুঞ্জি

১. জাস-সাছ. ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আলী রাজী: আল আহকামুল কোরআন: দারুল মাসহাফ. কায়রো।
২. আল মওসুয়াতে আল মুইসসেরাহ্ ফি আল আদিয়ান ওয়া আল মাযাহেব আল মু'আছেরাহ: ওয়ামী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
৩. আল ফাতওয়া আল হিন্দিয়া(ফাতওয়াই আলমগিরি). আমিরিয়া প্রকাশনী. ২য় প্রকাশ. মিসর ১৩১০ হিঃ।
৪. ডঃ আব্দুল করিম যায়দান :আহকাম আল জিম্মিইন ওয়া আল মুস্তামিনিন ফি দ্বারেল ইসলাম: বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়. ১ম প্রকাশ,১৯৬৩ ।
৫. ডঃ আলী খাফিফ : আল হুকুক ওয়া আল জিম্মা: মিসরীয় প্রকাশনা, ১৯৭৬।
৬. ডঃ আহমেদ মুসলিম : আল কানুন আদ-দাওলী আল খাস: মাকতাবাতুন নাহাদা. কায়রো. ১৯৫৬।
৭. আল্লামাহ সারাখসী : আল মাবসূত : মাকতাবাতুন নাহাদা. কায়রো।
৮. মাওয়ার্দী . আবু হুসেন আলী বিন মুঃ হাবিব : আল আহকাম আল সুলতানিয়া:.মাতবা'আ বদর উদ্দিন. মিসর.১৯০৯।
৯. ডঃ ওহাব আল যুহাইলি. :আল হারব ফিল ইসলাম. দারুল ফিকর. দামেস্ক. ১৪০৫ হিঃ।
১০. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী :আশ-শরীয়া আল ইসলামিয়া ফিল জিহাদ ওয়া আলাকাতুদ দাওলিয়া. দারুল ফিকর আল আরাবী.কায়রো।
১১. আবু ইউসুফ : আল খারাজ : সালফিয়া প্রকাশনী.৬ষ্ঠ প্রকাশ.মিসর.১৩৯ হিঃ।
১২. ডঃ সিরাজুল ইসলাম :আন্তর্জাতিক সম্পর্ক. দেওয়ান প্রকাশনী.ঢাকা. ৪র্থ প্রকাশ.১৯৮৮।
১৩. সাইয়্যেদ আবুল আলা মাওদূদী: ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ:.আধুনিক প্রকাশনী.ঢাকা.১৯৯০।
১৪. আফজাল ইকবাল: কূটনীতি ও ইসলাম: (উর্দূ)আশরাফিয়া প্রকাশনী.লাহোর.১৯৬১।
১৫. আবু জাফর মুঃ বিন জারির আত-তাবারী : তারিখে তাবারী(তাবারীর ইতিহাস) ১মপ্রকাশ. মিসর।
১৬. মুফতী মোহাম্মদ সফী : তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।
১৭. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী :তাফসীরে তাফহীমুল কোরআন: অনুবাদ মাওলানা আব্দুর রহিম. আধুনিক প্রকাশনী.ঢাকা।

১৮. আব্দুল কাদের আওদাহ্: তাশরীউল জ্বিনাই আল ইসলামী, দারুল কুতুব, বৈরুত।
১৯. মন্টোগোমারী ওয়াট: মদীনায় মোহাম্মদ: অক্সফোর্ড ,১৯৫৬।
২০. ডঃ হামিদুল্লাহ : মাজমুয়াতুল ওছায়েক আল সিয়াসাহ্ ফি আহদে নববী ওয়া খোলাফায়ে রাশেদাহ্,কায়রো,১৯৪১।
২১. ডঃ হামিদুল্লাহ্ : বিশ্বনবীর রাজনৈতিক জীবন, কায়রো ,১৯৪৬।
২২. আল কাসানী , ইমাম আলা উদ্দিন আবু বকর বিন মাসুদ : বিদা'ঈ সানা'ঈ ফি তারতিবে শরাঈ:, ১ম প্রকাশ, করাচী,১৪০০ হিঃ।
২৩. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুঃ বিন ইসমাইল আল বুখারী : বুখারী শরীফ বে-হাশিয়াতে সনদী, , দারুল মারেফা, বৈরুত।
২৪. আশ-শায়বানী , আল্লামাহ্ মুহাম্মদ বিন হুসাইন: সিয়ার আল কাবির: আল হারাকাতু আছ-ছাওরাহ্ আল ইসলামিয়া, আফগানিস্থান,১৪০৫ হিঃ।
২৫. সিরাতে ইবনে হিশাম: (সিরাতে রাসুল): ইউরোপীয় প্রকাশনা।
২৬. আল্লামাহ্ সারাখসী : শরহ সিয়ার আল কাবীর, দায়েরাতুল মারেফা, হায়দারাবাদ(ভারত) ১ম প্রকাশ,১৩৩৫ হিঃ।
২৭. ইমাম ইবনে হাজম আল-জাহেরী: আল-মাহাল্লা (আল-মাওসুয়াতে আল-ইসলামী), দারুল আফাক বৈরুত।
২৮. ইমাম শাফেয়ী (রঃ): আল-উম্মু, দারুল মারেফা, বৈরুত।
২৯. আবু জোহরা : আল-আকাতু আদ-দাওলিয়া ফিল ইসলাম, দারুল ফিকর, কায়রো।
৩০. ডঃ আব্দুল হাকিম হুসাইন ইলাই : আল-হুররিয়াহ আল-আম্মাহ ফি ফিকরে ওয়া নিজামেস সিয়াসাহ ফিল ইসলাম, দারুল ফিকর আল-আরাবী, কায়রো, ১৯৭৩।
৩১. আব্দুল ওহাব খাল্লাফ: সিয়াসাতু আশ-শরইয়্যা ওয়া নিজামুদ দাওলাতুল ইসলামীয়া, প্রকাশক কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২।
৩২. ডঃ ওহাব আল যুহাইলি: আল-ফিকহ আল-ইসলামী ওয়া আদিল্লাহতুহু, দারুল ফিকর আল-আরাবী, দামেস্ক, ২য় প্রকাশ, ১৪০৯ হিঃ।
৩৩. মানবাধিকার কনভেনশন-১৯৪৮।
৩৪. Sarkar, Abul Bari : The concept of Nationalism in Islam : Islamic Foundation, Dhaka, 1st Edn. 1983.
৩৫. Starke, J.G: Introduction to International Law: Butter W... London, 9th Edi. 1984.

৩৬. Professor Oppenham: International Law: Newyork. 2nd Edi. 1941.
৩৭. A Hamid Ray: International relation(Theory & Practice), Aziz Publishers, ahore.
৩৮. Anwar Ahmed Qadri: Islamic Jurisprudence in the Modern world, Taj Company, New Delhi, 1986.
৩৯. Morgenthue , Hans J. : Politics among Nations :, Kalyani Publishers, 6th Edi. New Delhi.
৪০. Lawrence : Principle of International Law:
৪১. Dr. Hamidullah: Muslim Conduct of State: Sh. Muhammad Ashraf, Lahore.
৪২. নুরুল ইসলাম: আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি।
৪৩. ডাঃ শাহ্ আলম: আন্তর্জাতিক সংগঠন।
৪৪. গাজী সামসুর রহমান: আন্তর্জাতিক আইনের ভাষ্য।